লীনা-কে

ভূমিকা

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী লেখার কোনও চিন্তা আমার মনে আসেনি। এর একটি কারণ হল, আমার ধারণা ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এত বেশি লেখা ও গবেষণা হয়েছে যে নতুন করে তাঁর জীবনী লেখার তেমন কিছু জরুরি প্রয়োজন নেই। বিশেষ কবে বাঙালি জনমানসে তাঁর এমনই এক পরিচিতি ও স্থান রয়েছে যেখানে আমার বিশেষ কিছু বলার থাকতে পারে না। পরে অবশ্য মনে হয়েছে ধারণাটি ঠিক নয়। হঠাৎ যখন দৈনিক 'বর্তমান' পত্রিকার পক্ষ থেকে নেতাজি জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লেখার জন্যে অনুরোধ এল তখন বিব্রত বোধ করেছিলাম। প্রাথমিকভাবে স্থিরই করেছিলাম যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। প্রস্তাবটি নিয়ে এসেছিল 'বর্তমান'-এর কাকলি চক্রবর্তী ও সাহানা নাগচৌধুরী। আমার মনে হয়েছিল যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে 'চাঞ্চল্যকর' কিছু লেখা, বিশেষ করে ১৯৪৫ সালের তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আমি নতুন কিছু আলোকপাত বা বিতর্কের শুরু করি এটা ওরা আশা করছে। লেখাটি কত বড হবে সে নিয়ে কোনও কথা না হলেও মনে হয়েছিল মোটামুটি পনেরো কুড়িটি সংখ্যার মধ্যে লেখাটি শেষ হবে। আর, জানুয়ারি মাসের (১৯৪৫) ২৩ তারিখের মধ্যে প্রথম লেখাটি বেরনো একান্তই জরুরি। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 'বর্তমান'-এর মতো একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকে ধারাবাহিকভাবে লেখার প্রলোভন থাকলেও এই রকম শর্তসাপেক্ষ লেখার দায়িত্ব নেওয়া সহজ ছিল না।

শেষপর্যন্ত কিন্তু সম্মত হয়েছিলাম। কাকলি ও সাহানা-কে প্রথমে যতটা অনমনীয় মনে হয়েছিল পরে দেখলাম তা নয়। কোনও পূর্বশর্তেই ওরা জোর দিল না। লেখাটি দিতেই হবে শুধু এই বিষয়ে ওরা অনমনীয় ছিল। তারপরেও আমি দ্বিধা করছিলাম। সেটুকু জোর করে দূর করে দিলেন বন্ধুবর বাদল বসু। এই কাজটি তিনি ইতিপূর্বেও করেছেন। তার ফল ভাল হয়েছে না খারাপ হয়েছে তা আমি আজও সঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কাকলি ও সাহানা-র সঙ্গে সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত লেখাটি সম্বন্ধে বহু খোলামেলা আলোচনা করে আমি উপকৃত হয়েছি। যে লেখা তিন-চার মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তা পুরো একটি বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্যে আমি 'বর্তমান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের গভীর আগ্রহ, চিঠিপত্র, নানান সময়ে সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা আমাকে উৎসাহিত করেছে। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়েছে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিক্রিয়ায় জেনেছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও উৎসাহ কত গভীর ও ব্যাপক।.

প্রথম যখন লেখাটি ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় তখন নামকরণ হয়েছিল 'এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তি : মহানায়ক সুভাষচন্দ্র'। পরে ভেবে দেখলাম সুভাষচন্দ্র এক মহানায়ক নিশ্চয়ই— শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাঁকে জাতির পক্ষ থেকে 'দেশনায়ক' রূপে বরণ করেছিলেন তাঁর এই হল শ্রেষ্ঠভূষণ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য ও মূল্যায়ন বইটিতেই রয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি এই ভূমিকায় নিষ্প্রয়োজন। তবুও কয়েকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। 'বিমান দুর্ঘটনা' ও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আমি কোনও আলোচনা করিনি। এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে। দুটি সরকারি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আছে। এই দুর্ঘটনা ও নেতাজি সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের গোপনীয় সব কাগজপত্র এখনও প্রকাশিত হয়নি। রাশিয়ার মহাফেজখানায় রক্ষিত ওই সংক্রান্ত গোপন কাগজপত্রে কী আছে না আছে এই নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীমতী পূরবী রায় প্রমুখ গবেষকরা বিষয়টির ওপর নতুন তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন। দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গবেষণা ছাড়া এই বিষয়ে মন্তব্য করা কোনও ঐতিহাসিকের পক্ষে সমীচীন নয়। ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল তা হল মূলত ইতিহাস বা History। তারপরে যা ঘটেছে তা হল রহস্য বা Mystery। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য বা Mystery-র সমাধান হোক তা সকলেরই ঐকান্তিক কামনা। সত্য উদঘাটিত হোক। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সে প্রয়াসের কোনও অবকাশ নেই।

একটি কথা অনস্বীকার্য। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে ব্যাপক স্বাভাবিক কৌতূহল পরোক্ষভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন, আদর্শ, সাধনা এবং সংগ্রামের ইতিহাসকে যেন কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বিংশ শতকের লক্ষ লক্ষ মানুষের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা এবং অবদানের প্রতি ঐতিহাসিকেরা এবং তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যে অন্যায় এবং উপেক্ষা করেছেন তা অমার্জনীয়। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য জানার ও তার সমাধানের আগ্রহ সেই প্রবণতাকে অজান্তে বৃদ্ধি করেছে।

সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের শেষ কোনও দিন হবে না। ইতিহাসে যাঁরা চিরস্থায়ী তাঁদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে, যদি ১৯৪১ সালে মহানিষ্ক্রমণের পূর্বেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি হত বা তাঁর দেহান্ত হত, যদি তিনি 'নেতাজি' নাও হতেন তবুও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অন্য কোনও নেতার থেকে কম হত না। সুভাষচন্দ্র বসু অপেক্ষা 'নেতাজি'র মূর্তিটিই জনমানসে বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু 'দেশনায়ক' বা 'রাষ্ট্রনায়ক' সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনীও কম চমকপ্রদ ও বর্ণময় নয়। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র একই মহাজীবনের দুই অধ্যায়। এই দুই অধ্যায়ের মিলিত অবদান সুভাষচন্দ্র বসুকে মহিমময় করে তুলেছে।

একটি ঘটনার উল্লেখ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তির

(Allies) জয়লাভের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বি বি সি (B.B.C) একাধিক ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র প্রস্তুত করে দূরদর্শনে দেখাচ্ছে। এর একটি হল : Subhas Chandra Bose : Enemy of Empire। তথ্যচিত্রটির নামকরণ লক্ষণীয়। ইংরাজদের তৈরি এই তথ্যচিত্রে নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট বা আগ্রাসী জাপানী সামরিক শাসকদের 'সহযোগী', 'পুতুল' বা 'ক্রীড়নক' এবং 'গণতন্ত্রের শত্রু' (Enemy of Democracy) রূপে নয়—নেতাজি সুভাষচন্দ্র সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরূপে। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধি ও দ্বিধাহীন স্বীকৃতির ঔদার্য কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক নেতা ও তথাকথিত বিদগ্ধজনের আজও নেই। যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষ আজীবন আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন তাদের কথা বাদই দিলাম, যদিও একাধিক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে।

বি বি সি-র অসাধারণ তথ্যচিত্রটি দেখলে মন ভারাক্রান্ত ও চোখে জল আসে। অনুভব করি কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন নেতাজি এবং কীভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুক্তি সংগ্রামের মৃত্যুভয়শূন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্তস্পর্শী নেতা। তাঁর সহকর্মীরা সকলে একটি কথা বলেছেন। নেতাজি তাঁদের মধ্যে 'আমি ভারতবাসী' এই গর্ববোধ সৃষ্টি করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী পড়তে পড়তে সেই বোধটি বারবার জাগে। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক নম্বর শত্রু ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। অন্য কোনও ভারতীয় নেতা ওই স্বীকৃতি পাননি। অন্য কেউ তাঁর মতো ব্রিটিশ শাসকদের দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার কারণ হননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অর্ধশতাব্দী পরে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে তাঁর ওই পরিচিতির স্বীকৃতিই হল নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

বইটি লেখার কাজে বহু পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছি। কয়েকজনের ঋণ স্বীকার না করলেই নয়। আমার শুভার্থী বন্ধু শ্রীবিজয় কুমার দত্ত বহু দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র নেতাজি জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব কমিটির আহ্বায়ক শ্রীসলিল কুমার ঘোষ আমাকে শুধু উৎসাহিত করেননি কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্যও করেছেন। অন্যান্য যাঁরা আমার লেখা পড়ে, সমালোচনা করে ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ (পিনু), শ্রীঅমল কুমার সিংহ, শ্রীমতী আভা বসু (সন্তোষ কুমার বসুর পুত্রবধূ), ডঃ জলি সেনগুপ্ত, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামচন্দ্র ম্যাকিন, 'রাখাল বেণু'-র সম্পাদক শ্রীসত্যেন চৌধুরী, শ্রীস্বপন কুমার ঘোষ ও ম্যাঞ্চেস্টার নিবাসী মহম্মদ ইব্রাহিমের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার বন্ধু শ্রীশোভন বসু একাধারে যে কোনও লেখকের ভীতি ও ভরসার স্থল। কোনও পাণ্ডুলিপি ওর মনোমত হওয়া অসম্ভব। ভুল ও অসঙ্গতি খুঁজে বার করার অসাধারণ ক্ষমতা শোভনের। কিন্তু সম্পাদনার দায়িত্ব ওর হাতে থাকলে লেখক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বারবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এই লেখার একটি বড় অংশ শেষ করেছি বিদেশে। মৌসুমী ও সুপ্রতীকের আমার অন্তহীন দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার ক্ষমতা এবং শ্রীতমা (ইলোরা)-র আমার লেখাটিকে 'সচিত্র করে' তোলার অদম্য উৎসাহ আমাকে যে প্রেরণা দিয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে।

আমার স্ত্রী লীনা-র নীরব অনুপ্রেরণা ও সরব সমালোচনা আমার সব কাজ ও লেখার পিছনে থাকে। এবারও তাই। সেই ঋণ স্বীকার করে বইটি তাকে উৎসর্গ করেছি।

১৯৪৫ সালের ঘটনা। এক আমেরিকান ঐতিহাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সুভাষচন্দ্রেব ওপর একটি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিষযে তাঁব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'Myths of a Hero'। তিনি ১৯৪৫-এর পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষ সম্পর্কে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী কেমনভাবে কাজে লাগানো হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতায় কোনওবকম উৎসাহ-আগ্রহ বোধ করছেন না। সভা শেষ হলে ইতিহাস বিভাগের এক প্রবীণ অধ্যাপক, যিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে বলেন, "পরের বাব বলতে এলে শুধুমাত্র উত্তেজনাবর্জিত নিরুত্তাপ তথ্য (cold, hard facts) পবিবেশন করবেন।" ওই বক্তা ছিলেন লিওনার্ড এ. গর্ডন (Leonard A. Gordon)। এঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ, 'Brothers Against the Raj' শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের জীবন ও ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দু'ভায়ের সংগ্রাম সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য ও আলোচনায় সমৃদ্ধ। গর্ডন হতাশ হয়েছিলেন শ্রোতাদের মনোভাবে। অতীত দিনের সাধু, সন্ত, কিংবদন্তি ভারতের মহান ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কীর্তি তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, এই সত্যটুকু শ্রোতারা বুঝতে পারছেন না দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গর্ডনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষোভের সঙ্গে ঐতিহাসিকেরা অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু তাঁর কথাটা ভাববার মতো নিশ্চয়।

সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী সত্যিই আজ ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য হল—এ এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তি। উত্তেজনা ও উত্তাপ বাদ দিলেও, মূলত কিংবদন্তির মহানায়কের জীবন, কর্ম ও সাধনার চমকপ্রদ ইতিহাস তথ্যনির্ভর। তবে, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ইতিহাসে ও জনমানসে যতটা উজ্জ্বল ও প্রতিষ্ঠিত, দেশের মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে আজও অজানা। অথচ ওই সুভাষচন্দ্র বসুকে না জানলে ও বুঝলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে সঠিকভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব নয়। ১৯৪১-এর আগের সুভাষচন্দ্র, পরবর্তী কয়েক বছরের 'নেতাজি'র চেয়ে কম আকর্ষণীয় চরিত্র নন। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র এক মহাজীবনের ও রুদ্ধশ্বাস নাটকের দুটি অধ্যায় ও অঙ্কমাত্র।

সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' (An Indian Pilgrim) লিখেছিলেন ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইন স্বাস্থ্যনিবাসে। মাত্র

দশদিনের অবসরে ন'টি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। ইচ্ছা থাকলেও আত্মজীবনী লেখাটি আর শেষ করতে পারেননি। কিন্তু যেটুকু লিখেছিলেন তার মূল্য অসীম। এটি খুঁটিয়ে মন দিয়ে না পড়লে সুভাষচন্দ্র কেন ও কীভাবে পরবর্তীকালে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র' হয়েছিলেন তা বোঝা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ছোটবেলায় মনের ওপর যে ছাপ পড়ে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সে ছাপ ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন বাড়ন্ত শিশুর ওপর তার প্রভাব খুব গভীর। তাঁর নিজের জীবনে এটি যোল আনা সত্যি ছিল। তাই তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, আপাত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন কেমনভাবে তা তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। 'Morning shows the day' কথাটা সব সময়ে সত্যি হয় না। সকাল বেলার মেঘলা আকাশের পর বেলা হলে ঝলমলে রোদ্দুর ওঠে। আবার ভোরের মেঘমুক্ত সূর্যোদয়ের পর সারাদিন জলবৃষ্টি হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। শৈশব ও কৈশোরের সুভাষের মধ্যে পরবর্তীকালের দেশনেতা সুভাষকে খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হয় না।

১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। বাবা জানকীনাথ বসু জন্মেছিলেন কলকাতার অনতিদূর কোদালিয়া গ্রামে। মা প্রভাবতী ছিলেন কলকাতার হাটখোলা দত্ত বাড়ির মেয়ে। ১৮৭৯ সালে উনিশ বছর বয়সে জানকীনাথ ভাগ্যান্বেষণে কটকে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই আইনজীবী রূপে পিতাব সাফল্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে, জানকীনাথের সাফল্য প্রমাণ করে সাহসী ব্যক্তিদের প্রতিই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কথাটি তাঁর নিজের জীবনেও বহুলাংশে সত্যি।

জানকীনাথের পিতা হরনাথ বসু বংশমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারভুক্ত হলেও বিত্তশালী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চারপুত্রই সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি করেছিলেন ও ইংরাজি শিখেছিলেন। ১৯০১ সালে জানকীনাথ কটক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কয়েক বছর পর সরকারি উকিল ও 'পাবলিক প্রসিকিউটর'-এর পদ পান। ১৯১২ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন ও 'রায়বাহাদুর' খেতাব পান। বলা বাহুল্য যে পদোন্নতি ও খেতাবের পিছনে ছিল রাজ আনুকূল্য। ১৯১৭ সালে তিনি উভয় সরকারিপদেই ইস্তফা দেন। কারণ, জেলা শাসকের সঙ্গে মতবিরোধ। ১৯৩০ সালে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে তিনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব বর্জন করেন। তার মধ্যে অবশ্য বহু ঘটনা ঘটেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক ব্যাপক ও তীব্র হয়েছে। দুই পুত্র শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র ওই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে পড়েছেন। জানকীনাথ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক কেননা পুত্র সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠন ও চারিত্রিক বিবর্তনের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। জানকীনাথের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক মিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি ইংরাজি সাহিত্য, ব্রিটিশ 'উদারনীতি', সাহেবি সাজপোশাক পছন্দ করতেন। অন্যদিকে তিনি ভারতীয়, হিন্দু ও বাঙালি বলে গর্ববোধ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জানকীনাথ 'সাহেব' বলে পরিচিত হলেও সকল শ্রেণীর মানুষের

সঙ্গে তিনি সহজভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। ইংরাজ শাসনের কিছু কিছু সুফল সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মধ্যে একটা আনুগত্যবোধ ছিল। জানকীনাথের হৃদয় ছিল কোমল। দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্যে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর কেতাবী শিক্ষা তেমন না থাকলেও তিনি নিজে পড়াশোনা করেছিলেন। বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতেন। পরে তিনি অল্পস্বল্প ইংরাজিও শিখেছিলেন। তাঁর মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবল। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ছিল সুস্পষ্ট। যে কোনও কাজ নিখুঁতভাবে করা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর বাস্তবতাবোধ ও বিচারবুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। ১৯১২ সালে সুভাষচন্দ্রের পিতা-মাতা দু'জনেই বাগবাজারের পণ্ডিত শ্যামনাথ ভট্টাচার্যের কাছে দীক্ষা নেন। শ্যামনাথের মৃত্যুর কয়েক বছর পর জানকীনাথ ও প্রভাবতী পূর্ব বাংলার হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের (অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী) কাছে পুনরায় দীক্ষা নেন। ক্রমে ক্রমে জানকীনাথের ধর্মভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯২২ সালে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জানকীনাথের বিশেষ অনুরোধ পুরীতে তাঁর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন।

বাড়ির ও পারিবারিক পরিবেশ, বাবা ও মা'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক সুভাষচন্দ্রের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পারিবারিক পরিবেশের জন্যে তাঁর মধ্যে স্বার্থপরতা বা লোভের প্রবৃত্তি জন্মায়নি। অতিরিক্ত প্রশ্রয় না পাওয়া ও বিলাসিতার মধ্যে মানুষ না হওয়ার জন্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঔদ্ধত্য, উন্নাসিকতা দেখা দেয়নি। শরৎচন্দ্র বন্ধুদের বলতেন যে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মা'র কাছে নিয়মানুবর্তিতা পেয়েছিলেন। নিজের পরিবার, বিশেষ করে বাবা-মা'র সাহচর্য ও শিক্ষার ফলেই সুভাষচন্দ্রের মনে কোনও সঙ্কীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা জন্মায়নি। তিনি এই কথার উল্লেখ করে লিখেছেন যে পিতা-মাতার প্রভাব সন্তানের জীবনে গোপনে কাজ করে। পরবর্তী জীবনে বিশ্লেষণ করলে ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও চরিত্র গঠনে তারা কতটা বাবা-মা'র সাহায্য পেয়েছে।

বাবা এবং মা'র সঙ্গে কৈশোর ও যৌবনে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ও তাঁদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল কিছুটা জটিল ও স্ববিরোধী। ছোটবেলায় সুভাষচন্দ্র খেলাধুলা করতে ভালবাসতেন না। শুধু ড্রিল করাই তাঁর পছন্দ ছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল তাঁর বাবা ও মা স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বাইরে খেলতে যাবে তা চাইতেন না। এতে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। অন্যান্য কেউ কেউ তাঁদের না জানিয়ে খেলতে যেত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কখনও তা করেননি। তার কারণ তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত ও নিরীহ। তাছাড়া, পিতা-মাতাকে মান্য ও সন্তুষ্ট করা উচিত, 'পিতা স্বর্গ. পিতা ধর্ম', 'মাতা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী' ইত্যাদি আপ্তবাক্য, উপদেশ তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। বাবা ও মা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কাজ করা তিনি অনুচিত মনে করতেন। কিন্তু একই সঙ্গে কিশোর সুভাষের এক বিদ্রোহী মন ছিল। নিজের আদর্শ, সব কিছু বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে মানবসেবার ব্রত কার্যকর করতে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। এর জন্যে বাবা-মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না।

একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতা-মাতাকে মান্য করার উপদেশগুলির বদলে যেসব সংস্কৃত শ্লোকে 'বিদ্রোহের' কথা ছিল সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলেও তিনি নিজের আদর্শের জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। বাবা-মা তাঁকে সংযত করতে চেষ্টা করতেন। বাবা বোঝাতেন। মা কান্নাকাটি করতেন। তবু সুভাষচন্দ্র নিজের সঙ্কল্পে অচল থাকতেন। তাঁরা যত বাধা দিতেন তিনি ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। সুভাষের হৃদয়ে স্কুল জীবনেই নিজের মুক্তিসাধন, পার্থিব আকাঙ্ক্ষামুক্তি ও মানবসেবার বাসনার আগুন জ্বলতে শুরু করে। পিতা-মাতার বাধ্য হওয়াই একটা ধর্ম, এই বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার মধ্যে বরং এই রকম একটা ভাব এসেছিল যে, যে কোন দিক থেকেই আসুক না কেন, আমার লক্ষ্যপথের প্রতিটি বাধাকে অগ্রাহ্য করতে হবে।" ভবিষ্যতের নির্ভীক রাষ্ট্রনেতা সুভাষচন্দ্রের ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বীজ কিশোর সুভাষের হৃদয়ে তখনই অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। কয়েক বছর পরে সুভাষচন্দ্র যখন আই সি এস থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তখন তাঁর মানসিক অস্থিরতা ও যন্ত্রণা তীব্রতর হয়েছিল। তাঁর বাবা, মা ও পরিবারের অন্যান্যরা কতখানি ক্ষুব্ধ, হতাশ এবং মর্মাহত হয়েছেন তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২১ সালের ৬ এপ্রিল অক্সফোর্ড থেকে মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, "একটি চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে তা হল কিভাবে বাবা-মা'র প্রতি এবং আমার নিজের প্রতি কর্তব্যপালনে একটা সমন্বয় সাধন করা যায়...অতীতে আমি শুধু বাবা-মা'র নয়, অন্য অনেকের এমনকি আপনারও গভীর দুঃখের কারণ হয়েছি। সেজন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করিনি, ভবিষ্যতেও করব না।...জ্ঞানগতভাবে ও নৈতিকভাবে বিদ্রোহ করা ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না।" দু' সপ্তাহ পরে লেখা (২০ এপ্রিল) আর একটি চিঠিতে তিনি তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মেজদাদাকে লেখেন, "কত অন্তরে আমি ব্যথা দিয়েছি, কত গুরুজনের অবাধ্যতা করেছি, আমি জানি। কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমার একমাত্র প্রার্থনা—তা যেন আমার প্রিয় দেশের মঙ্গলের জন্যই হয়।"

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, সেই কটকের মিশনারি স্কুল থেকে শুরু করে কেমব্রিজে 'মানসিক ও নীতি বিজ্ঞান'-এ (Mental and Moral Sciences) ট্রাইপোজের (Tripos) জন্যে পড়াশোনা করা পর্যন্ত ছিল ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ। ছাত্রজীবনের বিভিন্ন ঘটনার ও অভিজ্ঞতার স্থায়ী প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে। পাঁচ বছর বয়সে (১৯০২) সুভাষচন্দ্র কটকের প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয় স্কুলে (পি.ই. স্কুল) ভর্তি হন। তাঁর অন্য সব ভাই বোনেরাও এই স্কুলে পড়েছিলেন। ভাল করে ইংরাজি শিখবে বলেই বাবা-মা ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে পাঠাতেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই ছিল ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। শতকরা মাত্র পনেরো জন ছিল ভারতীয়। ইংরাজি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা আচার আচরণ, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখত স্কুলে। পাঠ্যসূচী সুভাষচন্দ্রের তেমন পছন্দ না হলেও তিনি স্কুলে অসুখী ছিলেন না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তাঁর ভাল লাগত। তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রছাত্রী ও ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু বৈষম্য ছিল যা সুভাষচন্দ্রের পছন্দ

হয়নি। ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জাতিগত ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব করতেন। এটা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

একটু বড় হবার পর কিশোর সুভাষ একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণাবোধ করতে থাকেন। স্কুলের পরিবেশ মেনে নিতে মন চায়নি। কোনও ভারতীয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। শেষপর্যন্ত ১৯০৯ সালে সুভাষ পি. ই. স্কুল ছেড়ে কটকের র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। পি. ই. স্কুলেই খুব অল্প বয়সে সুভাষচন্দ্র বর্ণবৈষম্য ও জাতিগত পক্ষপাতিত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এই ধরনের ইংরাজ-ঘেঁষা মনোভাবাপন্ন পাঠ্যক্রম ও পরিবেশে পড়াশোনা করা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়। শৈশবেই জোর করে ছেলেমেয়েদের ওপর 'ইংরাজি শিক্ষা' চাপিয়ে দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। নিজেদের বিচার বুদ্ধি ও পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পরই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত সুস্থ সাংস্কৃতিক মিলন আত্মস্থ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। আজ প্রায় একশ বছর পরেও সুভাষচন্দ্রের এই অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কমেনি বরং বেড়েছে।

২

র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে সুভাষচন্দ্র ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত পড়েছিলেন। ওই বছর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাস করেন। এই ক'বছর তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কৈশোরের প্রথম অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও ঘটনাগুলি তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্রকে গড়ে তুলেছিল। এই সময়ের তাঁর স্মৃতিচারণ, মা প্রভাবতী, মেজদাদা শরৎচন্দ্র ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠিগুলি পড়লে মনে হবে যে কিছুটা অস্বাভাবিক দ্রুতভাবে বয়ঃসন্ধিক্ষণ পেরিয়ে তিনি যৌবনে প্রবেশ করছিলেন। এমনকি মনে হতে পারে যে অপ্রাপ্তবয়সের এক কিশোর প্রবীণের মতো চিন্তাভাবনা ও আচরণ করছিল। সাধারণভাবে এরকম মনে হলেও সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে কিন্তু তা প্রযোজ্য ছিল না। কেননা, যেসব চিন্তা, প্রশ্ন ও বিশ্বাস মনে আসতে শুরু করেছিল তা তাঁর পরবর্তী জীবনেও দূর হয়নি। ওই প্রসঙ্গে আসার পূর্বে র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্র জীবনের গোড়ার দু'-একটি ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা জানা প্রাসঙ্গিক হবে।

পি.ই. স্কুলে সুভাষচন্দ্রের বংশমর্যাদার কোনও মূল্য ছিল না। পড়াশোনায় ভাল করার চেয়েও খেলাধুলায় ভাল হাওয়ার কদর ছিল বেশি। কিন্তু নতুন স্কুলে তাঁর বংশপরিচয়, ইংরাজি স্কুলে পড়াশোনার জন্যে তাঁর ইংরাজির জ্ঞান, খুব ভাল ছাত্র বলে সুনাম সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। এর ফলে তাঁর আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছিল। এরই সঙ্গে তিনি এক বড় সমস্যা ও অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। ইংরাজি স্কুলে পড়ায় বাংলাভাষা, ব্যাকরণ বা বানানে তিনি ছিলেন খুবই কাঁচা। এই নিয়ে ক্লাসের ছেলেরা হাসাহাসি ও বিদ্রূপ করত। কিন্তু এইসব বিদ্রূপ ও অপমানের জবাব দিতে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলা শেখায় মন দেন। তারপর বার্ষিক পরীক্ষায় সবাইকে অবাক করে তিনি বাংলা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পান। এই জিদ ও

আত্মবিশ্বাস ছিল সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য।

র‍্যাভেন শ' স্কুলেব প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। প্রথম দেখার দিন থেকেই বেণীমাধববাবু সুভাষচন্দ্রকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ-নিষ্ঠ চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ কিশোর সুভাষচন্দ্রের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন তাঁর বযস মাত্র বারো। হেডমাস্টার মশাই নিচু ক্লাসে পড়াতেন না বলে তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র হবার সুযোগ সুভাষচন্দ্র বেশিদিন পাননি। বেণীমাধববাবু বদলি হয়ে যান। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে সুভাষচন্দ্র কোনওদিন ভুলতে পাবেননি। সুভাষচন্দ্রের মনে তিনি এক স্থাযী দাগ রেখে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ ছিল। বেণীমাধববাবুর কাছে তিনি আরও এক শিক্ষা পেযেছিলেন। সেটি হল, প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্য বিচার। বামায়ণ, মহাভারত, মহাকবি কালিদাসের সাহিত্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ে ও তার মর্ম উপলব্ধি করে তিনি গভীব আনন্দ পেতেন। আর, আশ্চর্যের কথা হল যে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য কিশোর সুভাষ পডতেন মূল সংস্কৃতে। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সেব মধ্যে তিনি কত গভীরভাবে পডেছিলেন ও তাব ফলে তাঁর মনে কী বকম চিন্তা-ভাবনার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয পাই তাঁব মাকে লেখা ওই সময়ের কযেকটি চিঠিতে।

সুভাষচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাস ও অন্যান্য লেখা নিশ্চয পড়েছিলেন খুব ভাল করে। কিন্তু কখন তিনি প্রথম বঙ্কিম সাহিত্য পড়েন তা জানতে কৌতূহল হয়। কেননা, মাত্র পনেবো বছব বযসে দুর্গাপূজার সময মাকে চিঠিতে পুজোর জাঁকজমক সম্বন্ধে লিখছেন, "জাঁকজমকে প্রয়োজন কি ? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল ; আর অধিক কি প্রয়োজন ? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে। এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশি দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা, নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোর্তিময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না।" অবিশ্বাস্য যে মাত্র তিন বছর আগে এই কিশোরই বাংলা প্রায় লিখতেই জানত না। তার বাংলা রচনা পড়ে ক্লাসের সহপাঠীরা হাসিঠাট্টা বিদ্রূপ করত। অল্পদিনেব মধ্যেই বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা সে এমন রপ্ত করেছিল যে মূল সংস্কৃত মহাকাব্য দু'টি ও কালিদাসের রচনা পড়তে পারত। মাকে পরম বিজ্ঞের মতো পরামর্শ দিত, "বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল বারো আনা কিংবা ১ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। কণ্ডিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে।" একই চিঠিতে সুভাষচন্দ্র মাকে জানিয়েছেন তিনি নিরামিষাশী হতে চান কারণ, শাস্ত্রকাররা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' বলেছেন। স্বয়ং ঈশ্বরও এই কথাই বলেছেন। "আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব ? তাহাতে কি ঘোব পাপ হয় না ?" ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বর নির্ভরতা কিশোর সুভাষের জীবনে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। মাকে অন্য এক চিঠিতে লিখছেন, "জন্মমৃত্যু লইয়া এ

জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিস—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিবর্থক।" "দয়াময়" ঈশ্বরের করুণায় তাঁর অটুট বিশ্বাস। "ভীষণ পাপের তাণ্ডব নৃত্যেব ভিতবেও তাঁর দযাব পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।"

স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনে গভীর অধ্যাত্মচেতনা দেখা দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস কবতেন ভারতবর্ষ "ভগবানের বড় আদরের স্থান"। এই মহাদেশে লোকশিক্ষা দানের জন্যে যুগে যুগে ভগবানেব আবির্ভাব হয়েছে। এই বিশ্বাসের উৎসে ছিল গীতার দর্শন ও শিক্ষা। তাঁর তৎকালীন চিঠিপত্রে তা সুস্পষ্ট। গীতার প্রখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছিলেন, "কার্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্য আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাব নয়।" অন্য কেউ এত অল্প বয়সে এই ধরনের কথাবার্তা বললে বা চিন্তা কবলে স্বভাবতই সন্দেহ হত যে অপরিণত মন ও বুদ্ধির ফলে গুরুপাক শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁর হজম হযনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তার স্ফুরণ হয়েছিল বাল্যবযস থেকেই। কালক্রমে ওই প্রতিভা ও ধীশক্তি পূর্ণতা লাভ কবেছিল। তাঁব সমগ্র জীবন, মনন ও কর্মকে আবৃত ও নিযন্ত্রণ করেছিল।

সুভাষচন্দ্রেব জীবন ও চিন্তায স্বদেশ ও অধ্যাত্মচেতনা, দেশপ্রেম ও ঈশ্বর প্রেমের এক অপূর্ব বিচিত্র সমন্বয ঘটেছিল। ছাত্র জীবনেই ঈশ্বব বিশ্বাস ও অন্বেষণ, মাতৃভূমির প্রতি গভীব ভালবাসা, মাতৃভূমিকে জানা ও আবিষ্কারের ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কলকাতার বসু পরিবারে বাড়িতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপ তেমন কোনও আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি করেনি। বরং বাডিতে বাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেদের মনে বাইরের রাজনৈতিক উত্তাপ-উত্তেজনাব তাপ যে একেবারেই লাগেনি তা নয়। তারা কাগজে বিপ্লবীদের যেসব ছবি বেবত তা কেটে পড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখত। কিন্তু একবার এক আত্মীয পুলিশ অফিসার ওইসব ছবি দেখে জানকীনাথকে বলায় তিনি সব ছবি সবিয়ে দেন। এতে ছেলেরা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মদানের দিন ছাত্রদের গণ-অনশনের নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, এই ঘটনার কোনও উল্লেখ সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীতে কিন্তু নেই। সহপাঠীদের দেশের বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামকে শ্রদ্ধার চোখে দেখাতে শিখিয়েছিলেন তারও উল্লেখ নেই। 'রাযবাহাদুর' জানকীনাথ বসুর ছেলেদের মধ্যে একটা রাজভক্তির ভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেই ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক নিয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। পঞ্চম জর্জ কলকাতায় এলে বসু পরিবারের সবাই বেশ উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের এই মানসিকতা বেশি দিন থাকেনি। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয় তাঁর সমবয়সী এক ছাত্রের কাছে। সে নিজে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে কলকাতায় যুক্ত হয়েছিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি ও গঠনমূলক সমাজসেবা। এঁদের নেতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রটির নাম হেমন্তকুমার সরকার, যার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুভাষের মনে নতুন বন্ধুর কথাবার্তা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ধর্মীয় আবেগ ও স্বদেশপ্রেম দু'টিই তাঁর মধ্যে বাড়তে থাকে। দেশের ইতিহাস, পরিবেশ, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমস্যা ও

দুরবস্থার কথা তিনি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন। নানা প্রশ্ন, সংশয় ও চিন্তাভাবনার ভিড় হতে থাকে তাঁর মনে। আর এসবের প্রকাশ ঘটে তাঁর মা ও মেজদাকে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে।

রাঁচি থেকে সুভাষচন্দ্র মাকে লেখেন, "মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারতমাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা !" লক্ষণীয় হল যে এই চিঠিতে সুভাষের গর্ভধারিণী 'মা' ও জন্মভূমি 'মা' একই ভাবে সম্বোধিত হয়েছেন। সুভাষের আশঙ্কা ছিল যে তাঁর এই স্বদেশপ্রেমের আবেগময় প্রকাশ মাকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। তিনি তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করবেন। তাই মা'র কাছে সন্তান আবেদন করেছে যেন মা তাকে দেশের সেবায় ঝাঁপ দিতে নিবৃত্ত না করেন। তিনি লিখছেন, "মা যদি সন্তানকে বলেন—'তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক'—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই কলি যুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই।" মাকে তিনি স্মরণ করিয়েছেন অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দুর্গাবতীর কথা। বলেছেন যে, মাতৃ-উপদেশ ও মাতৃশিক্ষা সন্তানের যত উপকাব ও উন্নতি করতে পারে তা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। চিঠির শেষে লিখেছেন, "আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকতে পারি।" শুধুমাত্র ভাবাবেগ ও অপরিণত মনের উচ্ছ্বাসে সুভাষচন্দ্র ওই রকমের চিঠি লিখছিলেন না। এর পিছনে ছিল তাঁর গভীর আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শ কার্যকর করার দৃঢ় সংকল্প। তিনি তাঁর পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে যে বৃত্তি প্রাপ্য ছিল তার সবটাই পরার্থে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে মাকে লেখেন, "আমি টাকাকে বড় ভয় করি, কারণ টাকাই যত অনর্থের মূল।"

র‍্যাভেন শ' স্কুলে পড়ার সময়ই সুভাষচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হতে শুরু করেন। তাঁর সমগ্র জীবনে এঁদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। কলকাতায় কলেজ জীবন শুরু হলে এই প্রভাব ও অনুপ্রেরণা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় হেমন্তকুমার সরকারের মাধ্যমে তিনি কলকাতার যে আদর্শবাদী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯১৪ সালে। সুভাষ ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কবিকে দর্শন করতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের শুধু দেখাই হয়নি, রবীন্দ্রনাথ গ্রামের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁদের কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। ওই প্রসঙ্গে সুভাষ বলেছেন যে, তাঁর কথা তখন তিনি বুঝতে পারেননি। পরে যত দিন গেছে ততই বুঝেছিলেন ওই উপদেশের মূল্য কতটা। সুভাষচন্দ্র নিজে বললেও কথাটা বোধহয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সুভাষ এই প্রথম দর্শনের পূর্বেই কবিগুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'ঋষি কবি'র কবিতা ও অন্যান্য লেখা তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন। অত অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থ তাঁর সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলেও তিনি কটক থেকে শরৎচন্দ্র বসুকে লেখেন, "আমার বিশ্বাস একদিন রবি ঠাকুরের কবিতাগুলির মর্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিব।" বালক সুভাষ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের সংবাদে আনন্দে ও গর্বে আত্মহারা হয়েছিলেন। কবির স্বদেশে উপযুক্ত সম্মান স্বীকৃতির কার্পণ্য ও বিদেশে অত বড় সম্মান প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তাঁর

অন্তর্বেদনার কথা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর মেজদাদাকে লেখেন, "আমি আত্ম-অনুশোচনায় পীড়িত বোধ করি যখন ভাবি, বাংলা দেশ তাঁহার প্রতিভার প্রতি কত উদাসীন ছিল। যখন ভাবি তাঁর অমানুষিক প্রতিভাকে অস্বীকারের অন্ধকারে কতদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; অথচ বিদেশীরা, যাহারা বিজাতীয় ভাষাভাষী, যাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারাই তাঁহার প্রতিভাকে রাহুমুক্ত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শও সুভাষচন্দ্রের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পাবস্পরিক গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক উত্তরোত্তর গভীর হয়েছিল। একেবারে কৈশোর কাল থেকেই সুভাষের জীবন ও মননে রবীন্দ্র প্রভাব ও প্রেরণা কতখানি প্রবল হযে উঠছিল তা শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে স্কুলছাত্র সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে বোঝা যায। এই চিঠিতেই তিনি তাঁর মাকে তাঁর বৃত্তির টাকা পরার্থে ব্যয় করার সঙ্কল্পেব কথা জানিযেছিলেন। তাব আগে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন।

'ভাল ছেলে' কাকে তিনি মনে করেন এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মরা মন নিয়ে পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে' যারা ওঠে তাদের তিনি ভাল ছেলে বলে স্বীকৃতি দেন না। কাবণ, এই ছেলেরা 'পদবি অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না।' রবীন্দ্রনাথ চাইতেন শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা 'পরিপূর্ণভাবে' বাঁচার শিক্ষা পাবে। জগৎ সম্পর্কে তারা উৎসুক হয়ে থাকবে—'সন্ধান করবে, পরীক্ষা কববে, সংগ্রহ করবে।' তাদের শিক্ষাদান করবে এমন সব শিক্ষক, "যাঁদের দৃষ্টি বইযের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষজ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয় বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগী মণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।" সুভাষচন্দ্র একটি চিঠিতে প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পর্কে লেখেন, "প্রথম হই আর লাস্ট হই, আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলে ছাত্রেরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয় ? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য...কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র-জ্ঞান-কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব ভগভক্তি, স্বদেশপ্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা তো অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিস—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহঙ্কার কবিয়া থাকে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল সুর কিশোর সুভাষের শিক্ষা সম্বন্ধে মনোভাবে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সংবেদনশীল মনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও দু'জনের প্রভাব পড়েছিল। এই দু'জন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। 'চাপ্রাস' কথাটির ব্যবহার ও ভগবানের প্রতি 'তীব্র ব্যাকুলতা' যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর ইঙ্গিত দেয়, তেমনি স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দান স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সুনিশ্চিত অনুরণন। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের

ভাবধাবা ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্রের মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল। তিনি তাঁর "জীবন জিজ্ঞাসাব" উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে।

৩

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগীদের অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার। তিনি তাঁব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানী মন ও দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুভাষবাদ'কে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত হল, সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে জীবনেব মর্মবাণী হল প্রেম। মানব সভ্যতাব কোনও পর্যায়কেই চূড়ান্ত বা শেষ সোপান বলা যায় না। মানুষের ক্রমেই উত্তরণ হচ্ছে। স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। নিজেব বিশ্বাসের জন্যে মৃত্যুবরণ করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। সমাজ পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তির স্বাধীনতা। মানুষেব জীবনের সবচেযে বড় অভিশাপ হল দাসত্ব, বন্ধনদশা ও অন্যায অবিচারের সঙ্গে আপস করা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামই হল শ্রেষ্ঠ পুণ্য। আত্মত্যাগ জীবনের পরমধর্ম। সামাজিক জীবনে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠাই হল শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সমাজে বর্ণভেদ বা অনুন্নত শ্রেণী বলে কিছু থাকা কাম্য নয়। স্বত্বাধিকার ও পদমর্যাদার বৈষম্য অনুচিত। নারী সর্বতোভাবে পুরুষের সমমর্যাদার অধিকারিণী। মানুষের মর্যাদা ও পূর্ণ স্বাধীনতার আছে চারটি স্তম্ভ : বিবেকের মুক্তি (Freedom of Conscience); রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র (Political Democracy); অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বা সমাজবাদ (Economic Democracy or Socialism), মানুষের মর্যাদা (Dignity of Man)। এই চারটি হল সর্বকালের, সর্বমানবের জীবনের লক্ষ্য ও অধিকার। সুভাষবাদে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতার কোনও স্থান নেই। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রিস্টান বা কে অন্য কোনও ধর্মবালম্বী তাতে কিছু যায় আসে না। তা বিচার্য নয়। মূল প্রশ্ন হল সমঅধিকার, সমমর্যাদা। সর্বমানবের কল্যাণকামী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হল সুভাষবাদের লক্ষ্য। সুভাষবাদের এই ব্যাখ্যা সামগ্রিকভাবে অবশ্যই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

কীভাবে 'সুভাষবাদ' গড়ে উঠেছিল? রাজনৈতিক মানুষ ও রাষ্ট্রনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর চমকপ্রদ জীবনে কী কী এবং কার কার প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল? সুভাষচন্দ্রের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন ও বিশ্বাস এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। জীবনেব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে। সূত্রপাত হয়েছিল শৈশবেই। তার কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবন একটি মাত্র প্রভাবে গড়ে ওঠে না। সুভাষচন্দ্র তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান প্রভাবগুলির মধ্যে ছিল : পিতা-মাতা ; পারিবারিক পরিবেশ ; শিক্ষা ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ; মহাত্মা গান্ধী ; জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ এবং তারই সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্য ; তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত সমস্যা-সম্ভাবনা। বহু মনীষীর জীবন ও বাণী তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের নিজের উক্তি, চিঠিপত্র ও রচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ এবং প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে অসংখ্য। তাঁর বন্ধু, সহকর্মী, সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও স্মৃতিচারণেও বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে। বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষচন্দ্রের চিন্তার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর কর্মজগতকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। মোহিতলাল মজুমদার সুভাষচন্দ্রকে স্বামীজির আদর্শের 'জীবন্ত ভাষ্যরূপে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিফলিত বিবেকানন্দে, আর বিবেকানন্দ প্রতিফলিত সুভাষচন্দ্রে।' ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখের রচনা ও স্মৃতিচারণেও সুভাষচন্দ্রের জীবনে ও চিন্তায় স্বামীজির প্রভাবের কথা আছে।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পূর্বেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে 'স্বামীজি'র প্রবেশ ঘটেছিল। ওই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে, একদিন দৈবক্রমে তিনি এমন একটি জিনিস পেয়ে গেলেন যা সঙ্কটকালে তাঁর প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। এই 'সঙ্কট' ছিল কিশোর সুভাষের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনের লক্ষ্য সন্ধান। তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন একটি মূল নীতি যাকে অবলম্বন করে তাঁর সমগ্র জীবন গড়ে উঠতে পারে। অন্য কোনও কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সবকিছু প্রলোভন জয় করতে ও প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হতে চাইছিলেন। তাঁব ধারণা ছিল, তিনি যদিও 'দুর্বল' তবু তাঁব লড়াই করার সঙ্কল্প প্রবল। তিনি ওই সঙ্কটের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "আমি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিনি—আমার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে তা করতে দিত না।" এই মনোবল, আদর্শনিষ্ঠা ও আপসহীন সংগ্রামী মানসিকতাই কিশোর সুভাষচন্দ্রকে কালক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজি সুভাষে পরিণত করেছিল।

'দৈবক্রমে' যে জিনিসটি তিনি পেয়েছিলেন তা হল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। পাশের বাড়ির এক আত্মীয়ের বই দেখতে দেখতে স্বামীজির বইগুলি তাঁর চোখে পড়ে। বইগুলি চেয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে প্রথম পাঠেই তাঁর মধ্যে 'শিহরণ খেলে' যায়। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে স্বামীজির রচনাবলী পড়তে থাকেন। জীবনের যে লক্ষ্যের তিনি সন্ধান করছিলেন তা পেয়ে গেলেন—নিজের মুক্তি ও মানবসেবা, আর, এই মানবসেবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্বদেশসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক বিপ্লব ঘটিয়ে সব কিছু ওলটপালট করে দিলেন। পনেরো বছরের এই বালকের 'হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন'। নিজের মুক্তি, পার্থিব সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে, সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে মানবসেবাকে সফল করে তোলাই হল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ভবিষ্যতের চির বিদ্রোহী 'নেতাজি'র জন্ম হল।

সুভাষচন্দ্রের মানসিক বিপ্লবের পিছনে আর একজন ছিলেন—বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। মা'র কাছে তিনি শুনতেন 'কথামৃত'। বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়তে পড়তে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান ছিল চরিত্র-গঠন এবং

আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব নির্দেশ। পার্থিব সব আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে তবেই 'অবিনশ্বর জীবন' লাভ করা যায়, এই শিক্ষা সুভাষচন্দ্র পান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কাম ও কাঞ্চন ত্যাগের' উপদেশ সুভাষচন্দ্রকে বয়ঃসন্ধি ও যৌবনের এক কঠিন বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। সুভাষচন্দ্রের জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই প্রায় হয় না। অথচ সুভাষচন্দ্র নিজে তাঁর জীবনের এই চিন্তার কথা খুব খোলাখুলিভাবে লিখেছেন। বিষয়টি হল যৌনচেতনা ও প্রবৃত্তি।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন রক্ত-মাংসে গড়া। শারীরিক জৈব সব সমস্যা, কামনা-বাসনা প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যেও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ তাঁকে শিখিয়েছিল কী করে যৌনপ্রবৃত্তিকে মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রত্যেক নারীকেই মাতৃবৎ দেখা যায়। কটকে স্কুলে ছাত্র জীবনেই তাঁর যৌন-চেতনা শুরু হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এর ফলে বিচলিত বোধ করেন। তাঁর ধারণা জন্মে যে এই যৌন-চেতনা অস্বাভাবিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার লক্ষণ। তিনি এই 'দুর্বলতা' দমন বা অতিক্রম করার জন্যে লড়াই করছিলেন। এই লড়াই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে কঠিন ও তীব্র। ফলে তিনি প্রতিনিয়তই মানসিক উত্তেজনায় ও অশান্তিতে ভুগতেন। নৈরাশ্যবোধ করতেন। তাঁর যৌন প্রবৃত্তিকে তিনি যতই দমন বা মহত্তর প্রেরণায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন ততই তা আবও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতাব দৃষ্টান্ত তাঁকে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে শক্তি জুগিয়েছিল। কাম ও কাঞ্চন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বপ্রধান বাধা—শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি সুভাষচন্দ্র 'বেদবাক্য' বলে মেনে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শন ও ভাবধারার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সব প্রয়োজন মেটাবার উপাদান। তিনি স্থির করেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য হবে নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মানব সমাজেব উন্নতি।

বাস্তব জীবনে তিনি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করবেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে। এই সঙ্কল্পচ্যুত তিনি কখনও হননি। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে যে লড়াই চলছিল তা কিন্তু তাঁর জীবনে কোনদিন শেষ হয়নি। এই কথাটি সুভাষচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধতার ও যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে মহত্তর প্রেরণায় রূপান্তর করার জন্যে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অর্জন করা অসম্ভব বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাই তিনি মাঝে মাঝে অবসাদ ও মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টার কোনও বিরাম ছিল না। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যে তিনি অকৃতদার থাকবেন। বিবাহ না করার সিদ্ধান্তের কথা একাধিকবার তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টা যে সহজ নয়, এই লড়াই যে নিরন্তর সে কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনী লেখেন ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। ওই সংগ্রাম তাঁর মনের মধ্যে তখনও চলেছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। সুভাষচন্দ্র আজীবন অকৃতদার থাকেননি। কিন্তু বিবাহ করায় সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনের আদর্শ, লক্ষ্য ও সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাঁর সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক দধীচির ভাবমূর্তি ম্লান হয়েছিল এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সুভাষচন্দ্রের

নিজেব একটি কথা যদি আমবা স্মরণ রাখি তাহলে তাঁর জীবনের এই দিকটি বুঝতে বোধহয় সুবিধা হবে। নিজের অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "নতুন করে আবার যদি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তাহলে খুব সম্ভবত আমি যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি। এর অর্থ এই নয় যে যা করেছি তার জন্য অনুতাপ করছি। যৌন-সংযমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিযে যদি কোনও ভুল করে থাকি, সে ভুলে সম্ভবত আমার ভালই হয়েছে, কেননা এব ফলে ঘটনাচক্রে হলেও আমি উপকৃত হয়েছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পাবি, এব ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য তৈরি করে তুলেছিলাম যা চিবাচরিত পথ ধবে চলবে না এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষয়িক উন্নতির কোনও স্থান নেই।"

সুভাষচন্দ্রেব অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে আর একটি আত্মজীবনীর কথা মনে আসে। বইটির নাম My Experiment with Truth। লেখক মহাত্মা গান্ধী। এক অসাধারণ ব্যক্তির এক অসাধারণ গ্রন্থ হওয়া ছাড়াও বইটির এক বৈশিষ্ট্য হল নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অত্যন্ত গোপন দুর্বলতার কথাও গান্ধীজি অকপটভাবে লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সত্যের সঙ্গে নিজের জীবনে গান্ধীজি কীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সেই কাহিনীই তাঁর আত্মজীবনীর মুখ্য আকর্ষণ। সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীও সত্যের মুখোমুখি সুভাষচন্দ্রের পরীক্ষা ও আত্মনিরীক্ষার এক অতুলনীয় স্বীকারোক্তি। সুভাষচন্দ্রের মতো নির্ভীক অনাবিল চরিত্রের একজন মানুষের পক্ষেই এই আত্মজীবনী লেখা সম্ভব ছিল। আর, এটি সম্ভব হয়েছিল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'অভী' মন্ত্রে প্রকৃত অর্থে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই। ভারতবাসীর ওপর স্বামীজির আশ্চর্য প্রভাব প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালির মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বে-হিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজির জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজি মানুষের ক্রটি বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো.. পৌরুষপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মানুষ...মনে প্রাণে সংগ্রামী।" নেতাজি সুভাষচন্দ্রও প্রকৃত অর্থে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য ছিলেন।

৪

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হবার পর সুভাষচন্দ্রকে কলকাতায় কলেজে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁর বাবা-মা। কলকাতায় তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। কিন্তু কটক ছেড়ে কলকাতায় এলেও স্কুল জীবনের ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতা তাঁর কলেজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়। সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। স্কুল জীবনের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র আকৃষ্ট হন মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে। তিনি পড়াশোনার বদলে ব্রহ্মচর্য, যৌনসংযম, হঠযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানান বই পড়তে শুরু করেন। যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন। কিন্তু তাতেও মন শান্ত না হওয়ায় গুরুর সন্ধান করতে থাকেন। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই

করেন। ওই সংগঠনের কাজেই তিনি অস্পৃশ্যতার সমস্যার মুখোমুখি হন। তাঁর মা তাঁদের এই কাজ সমর্থন ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে পুত্রকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ও সমালোচনার কারণ সঠিকভাবে বুঝতে হলে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তাধারার কিছু পরিচয় দরকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন ছাত্রদল প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র একটি বিপ্লবী গুপ্ত দলের উল্লেখ করেছেন। এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশির ভাগ ছাত্র কিছু না জানলেও সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজখবর রাখত। কলেজের ইডেন হিন্দু হোস্টেলে মাঝে মাঝেই পুলিশের তল্লাশি হত। সুভাষচন্দ্র নিজে যে এদের খবর রাখতেন তাতে সন্দেহ নেই। নিজেদের গোষ্ঠীকে তিনি 'নব্য বিবেকানন্দ গোষ্ঠী' বলে মনে কবতেন। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছেলেরাও কিন্তু বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলন, চরমপন্থী মতবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী তরুণ বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ রচনা ও বাণীতে কতখানি উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন তা বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবীদের ও বিপ্লব আন্দোলনের একটি প্রচ্ছন্ন কেন্দ্র বলে পুলিশের সন্দেহ ছিল। স্বামীজি কিন্তু চাননি যে রামকৃষ্ণ মিশন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ুক। এতে মিশনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁরই ইচ্ছামত রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও প্রকার সম্পর্ক থাকবে না। মিশনের সঙ্গে যুক্ত সকলের জন্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মিশনের এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই পছন্দ হয়নি। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামকে বিবেকানন্দের জাতিগঠনের আহ্বান থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত ও সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন না। তাই মিশনের ওই নিষেধাজ্ঞা এবং শুধুমাত্র সেবা এবং ত্রাণের কর্মসূচী তাঁদের ক্ষুব্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্রের রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে সমালোচনা এই মনোভাবেরই প্রকাশ। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ যায়নি। ১৯২১ সালে আই সি এস থেকে পদত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পর চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে (২২ এপ্রিল, ১৯২১) এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "কি করব এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব। একবার ইচ্ছা হচ্ছে—বোলপুরে যাব (শান্তিনিকেতনে)। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।"

রামকৃষ্ণ মিশন ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে মিশনের ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল ধারণা হবে। মিশন কর্তৃপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করলেও পুলিশ-গোয়েন্দাদের সন্দেহ যায়নি। তৎকালীন এক গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হয়েছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশন কঠোরভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখলেও বিবেকানন্দের শিক্ষা এমন একটি 'রামকৃষ্ণ পরিবেশ' (Ramakrishna atmosphere) সৃষ্টি করেছে যা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক। মিশনের সেবাব্রত, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের আদর্শ যুবকদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করছে। দেখা যাচ্ছে যে, যেসব

যুবকরা বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তাদের এক বড় অংশ এই 'রামকৃষ্ণ পরিবেশে' মানুষ হয়েছে। সুভাষচন্দ্র একই পরিবেশে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন।

৫

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র যখন ভর্তি হলেন তখন তাঁর বয়স ষোল। কটকের শৈশব ও কৈশোরের পরিবেশ ও দিনগুলির সঙ্গে কলকাতার তফাৎ প্রায় আকাশ-জমিন। তার ওপর সুভাষের মনের মধ্যে তখন এক ঝড় চলেছে। তিনি স্থির করে ফেলেছেন যে, "গতানুগতিক পথে" চলবেন না। আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মানব-কল্যাণ তাঁর আদর্শ। দর্শন নিয়ে পড়াশোনা আর বাস্তব জীবনে 'যতটা সম্ভব' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অনুসরণ করা তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু জীবনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রায় কিছুই হয়নি। কটকের স্কুলের সহপাঠীদের তুলনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পার্থক্য। কলেজে উচ্চবিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন পরিবারের কিছু ছেলেদের একটি দল ছিল। শুধুমাত্র 'বই-এর পোকা' আর লেখাপড়ায় 'ভাল ছেলে' হতে চায় এমন আর একটি গোষ্ঠী ছিল। সুভাষচন্দ্রের মতো নিষ্ঠাবান উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী আর একদল ছাত্র ছিল। এরা নিজেদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী' বলে ভাবত। এ ছাড়া ছিল অল্প কিছু ছেলে যারা বিপ্লবী মতবাদ ও দলের সঙ্গে যুক্ত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র যখন পড়তে এলেন তখন তাঁর মানসিক গঠন কেমন ছিল, কলকাতার উচ্চ-মধ্যবিত্ত 'বাবু' সমাজ সম্পর্কে তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন তা জানা দরকার। কেননা, শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজ বলেই নয়, কলকাতার ছাত্র সমাজের বেশির ভাগই ছাত্রই ছিল ওইরকম পরিবারের। কটক থেকে তাঁর মাকে একটি চিঠিতে শ্লেষ ও বিদ্রূপের সঙ্গে সুভাষ লিখেছিলেন, "ভগবান কলি যুগে একটি নতুন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নতুন—"বাবু" সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে। কিন্তু আমরা ২০/২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই—আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—আমাদের হাত-পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সর্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু। পশু অপেক্ষা আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশুদিগের তাহাও নাই।" ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে কিশোর বালক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মাকে ওই চিঠিতে লিখেছেন, "আমি ভাবি—বাঙালি কবে মানুষ হইবে।

কে বঙ্গমাতাকে উদ্ধার করিবে? কবে বাঙালি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শিখিবে?" চিঠির শেষে মাতা প্রভাবতীকে কিশোর সুভাষ লিখেছে, "এবাব পাগলের মতো অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় তো ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন।"

পুত্রের ওই 'পাগলামি' ভরা চিঠি মা ছিঁড়ে ফেলে দেননি। সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। আর, রেখেছিলেন বলেই ভবিষ্যতের 'নেতাজি'-র বিবর্তনের এক বিরল চিত্র ধরা রয়েছে। অনুমান করতে পারি যে, ওই চিঠি পড়ে একদিকে মা যেমন পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন আশঙ্কিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি এমন এক অনন্য পুত্রের জননী বলে গর্ববোধও করেছিলেন। লক্ষণীয় হল যে সুভাষ তাঁর মনের সব কথা খোলামেলাভাবে লিখতেন তাঁর মাকে। মাকে তিনি নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মতো মনে কবতেন। মা প্রভাবতীও পুত্রের ধ্যানধারণা, আচরণ ও মতিগতিতে স্বভাবতই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হলেও কখনও জোব করে বাধা দেননি। ক্ষোভ ও অভিমানে চোখে জল এসেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসীম মাতৃস্নেহে পুত্রকে সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

১৯১৬ সালের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেনকে লাঞ্ছনা করার অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর (এই ঘটনাব কথা পরে আসবে) সুভাষচন্দ্র কটকে ফিরে গিয়ে সমাজসেবার কাজে নেমে পড়েন। এই কাজে সুভাষ ও তাঁর সহকর্মীরা এক বড সমস্যার মুখোমুখি হন। সমস্যাটি ছিল—অস্পৃশ্যতা। ছাত্রদের একটি হোস্টেল ছিল। এই হোস্টেলে একটি সাঁওতাল বাসিন্দা ছিল। তার নাম মাঝি। সেই সময় সাঁওতালদের নিম্নজাতি বলে মনে কবা হত। তার থাকা নিয়ে কিছু আপত্তি-অশান্তি হলেও হোস্টেলের অন্য ছাত্ররা তা পাত্তা দেয়নি। কিছুদিন পর ওই সাঁওতাল ছেলেটি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার সেবা শুশ্রূষা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সুভাষ ও তাঁর বন্ধুরা ছেলেটির দেখাশোনা করতে থাকে। খবর পেয়ে, প্রভাবতী দেবী নিজে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। সেবা-যত্ন করে মাঝিকে সুস্থ করে তোলেন। তাঁর মা এইভাবে একটি নিচু জাতের 'অস্পৃশ্য' ছেলেকে সেবা করতে এসেছেন দেখে সুভাষচন্দ্র পরম বিস্মিত হন ও গভীর আনন্দ পান। তখনকাব দিনে অভিজাত উচ্চ বংশের কোনও মহিলার পক্ষে ছাত্রদের হোস্টেলে গিয়ে এক 'অস্পৃশ্য' রোগীর সেবা করা সহজ ছিল না।

প্রেসিডেন্সি কলেজেব কথায় ফিরে আসি। সুভাষচন্দ্র কলেজে পড়তে আসার আগেই তাঁর নাম ছাত্র মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর প্রধান কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও নিকট বন্ধু দিলীপকুমার রায় তাঁর 'আমার বন্ধু সুভাষ' বইটিতে খুব সরলভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন। দিলীপকুমার নিজে কলকাতার মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়তেন। ওঁদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র ছিলেন ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়। ক্লাসের অন্য সব ছেলেরা ক্ষিতীশকে খুব শ্রদ্ধা ও সমীহ করত। তার থেকেও ভাল কোনও ছাত্র থাকতে পারে এটা তারা বিশ্বাসই করত না। একদিন নিবারণ নামে একটি ছেলে হঠাৎ বলল, "রেখে দে তোদের ক্ষিতীশকে। আমাদের কটকে র‍্যাভেন শ' স্কুলে সুভাষ বলে একটি ছেলে পড়ে। তার কড়ে আঙুলের নখের কাছেও ক্ষিতীশকে ঘেঁষতে হয় না। জানকীনাথ বোসের ছেলে সুভাষ, হীরের টুকরো ছেলে। এই বলে দিলাম। ক্ষিতীশ তার কাছে

স্রেফ নট্ কিচ্ছু নাথিং।" নিবারণ মেট্রোপলিটান স্কুলেরই ছাত্র। বাড়ি কটকে। তার কথা শুনে সবাই অবাক, অখুশি। দিলীপকুমার তার কথা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরতে সবাই অবাক। প্রথম হয়েছে মিত্র স্কুলের প্রমথ সরকার। দ্বিতীয় সুভাষচন্দ্র বসু। আর ক্ষিতীশ পেয়েছে সপ্তম স্থান। নিবারণ এবার বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, "কী, এবার ?" দিলীপকুমার আর অন্যদের মুখে কথা নেই। কী তাজ্জব ব্যাপার! কটকের ছেলে কলকাতার বাঘা বাঘা ছেলেদের টপকে দ্বিতীয়! কিন্তু সেই থেকে দিলীপকুমারের কাছে সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলেন সত্যিই 'হীরের টুকরো'। দু'জনেই ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রথম দেখা হল দু'জনের। অল্প দিনের মধ্যেই সুভাষ আর দিলীপ হয়ে উঠলেন প্রিয় সহপাঠী, সহমর্মী।

কটকে স্কুল জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন যে, সকলে তাঁকে একগুঁয়ে খামখেয়ালি ও অবাধ্য বলেই ধরে নিয়েছিল। কথাটা একেবারে ভুল নয়। সত্যিই তিনি প্রচলিত ধারণায় বাধ্য সুবোধ ভাল ছেলে ছিলেন না। সুভাষ যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ভাল ছেলের মতো মাথা গুঁজে একমনে পড়াশোনা না করে তিনি সাধুদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন, নিজের বিচারবুদ্ধি মতো যা ভাল মনে করছেন তাই করছেন, কারও কথায় বা ভয়ে যা করবেন স্থির করছেন তার থেকেও একটুও নড়ছেন না, এসব শিক্ষক, অভিভাবকস্থানীয় বা পিতা-মাতার মনঃপূত হবার কথা নয়। কিন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল করে তিনি সবাইকে যেমন অবাক ও খুশি করলেন, তেমনই দেখালেন তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। কোনও বাঁধা ছকে তাঁকে ফেলা বা মাপা সম্ভব নয়।

১৯১৩ সালে যখন সুভাষচন্দ্র কটক থেকে কলকাতায় এলেন তার অল্প কিছুকাল আগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার শেষ হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন রূপে শুরু হয়ে স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় চেতনা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিপ্লবী চিন্তাধারা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে কংগ্রেসের মূলত নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। দেশের, বিশেষ করে বাংলার, এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছাত্রদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ যে এর ব্যতিক্রম ছিল না তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের 'দুর্নাম' ছিল। কলেজের প্রধান হোস্টেলে (ইডেন হিন্দু হোস্টেল) প্রায় পুলিশি তল্লাশি চলত। গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ ছিল যে, ওই হোস্টেলে বিপ্লবীদের প্রায়ই গোপন মিটিং হয়।

সুভাষচন্দ্রে মনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংশয় চলেছে। ধর্মীয় আবেগ ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, স্বদেশ-কল্যাণ চিন্তা, সমাজ সেবার আদর্শ, দেশের বর্তমান দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের পথ—সবকিছু মিলিয়ে তাঁর মনে এক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সংশয় সৃষ্টি করেছিল। সবকটি চিন্তা ও লক্ষ্যের মধ্যে এক সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনের অনুভূতি তাঁর হলেও, তা তখনও তেমন গভীর ও সুদৃঢ় হয়নি। তাঁর 'জীবন

জিজ্ঞাসা'র সঠিক উত্তরের সন্ধান পান তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে।

কলেজ জীবনের সূচনায় সুভাষচন্দ্র যেসব মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ওই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ তখন এক কিংবদন্তি পুরুষ হয়ে উঠেছেন। কোনও নেতা সম্বন্ধে লোককে এমন গভীর উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে তিনি খুব কমই দেখেছেন। এ সময় গুজব রটেছিল যে শ্রীঅরবিন্দ বারো বছর ধরে ধ্যান সাধনার জন্যে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সময়কাল পূর্ণ হলে গৌতম বুদ্ধের মতো বোধিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আবার স্বদেশের মুক্তির জন্যে সক্রিয় জীবনে ফিরে আসবেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "অরবিন্দের নাম ঘিরে যে মরমিয়তার মণ্ডল তা আমার মনে রেখাপাত করেনি, আমায় আকৃষ্ট করেছিল তাঁর রচনা ও চিঠিপত্র।" অরবিন্দ তখন 'আর্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ওই পত্রিকায় তিনি তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করতেন। বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি চিঠিপত্রও লিখতেন। তাঁর ওই লেখা আর চিঠিপত্র সুভাষচন্দ্রের সহপাঠীদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চকণ্ঠে পড়তেন। অন্যরা তা শুনতেন, উদ্দীপ্ত হতেন। সুভাষচন্দ্রের মনে অরবিন্দের একটি উক্তি বিশেষ দাগ কেটেছিল—জাতীয় সেবাকে ফলপ্রসূ করতে হলে আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্তি অত্যাবশ্যক।

তরুণ ছাত্র সুভাষচন্দ্রের জীবনে অরবিন্দের স্থায়ী প্রভাব কতটা ছিল তা নিয়ে কিছুটা সংশয় বোধহয় সুভাষের নিজের মনেই ছিল। আর, এই সংশয়ের মূলে ছিল সুভাষের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব। মনে হয় একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, অন্যদিকে অরবিন্দের দর্শন ও দিব্যজীবন লাভের পথ নির্দেশ—এই দুই-এর মধ্যে কোনটি তাঁর নিজের জীবনে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী সে নিয়ে তিনি আত্মসমীক্ষা করেছিলেন বেশ কিছুকাল ধরে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে অরবিন্দের গভীর দর্শন চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। "আমার গায়ে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল শঙ্করের মায়াবাদ। তার অনুযায়ী আমি চলতেও পারছিলাম না, তার থেকে অব্যাহতিও মিলছিল না সহজে। আরেকটি কোনও দর্শনের বিকল্প আমার প্রয়োজন হয়েছিল।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'ঈশ্বর ও সৃষ্টির সাযুজ্যের কথা" তাঁর মনে দাগ কাটলেও তিনি তখনও 'মায়ার লতাজাল' থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই বন্ধন মুক্তিতে সুভাষকে সাহায্য করেছিলেন অরবিন্দ। সার্বিক চারিত্রিক বিকাশের জন্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের প্রয়োজনের কথা বিবেকানন্দও বলেছিলেন। কিন্তু অরবিন্দের যোগসমন্বয় ও জ্ঞানমার্গে সত্যে পৌঁছবার প্রণালীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র মৌলিক ও অদ্বিতীয় কিছু পেয়েছিলেন। এই বিষয়ে অরবিন্দের রচনা তাঁর কাছে 'সঞ্জীবক ও প্রেরণাময়' মনে হয়েছিল। অরবিন্দের স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের বাণী সুভাষচন্দ্রের প্রজন্মের কাছে এক স্বপ্নময় সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল। এই স্বপ্ন বিবেকানন্দও দেখেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রচিন্তায় তার প্রবেশ তখনও ঘটেনি।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে অরবিন্দের প্রভাব, অরবিন্দের প্রতি গভীরতর আকর্ষণের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, উভয়ের

পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা। সুভাষচন্দ্র এক সময়ে চেয়েছিলেন দিলীপকুমার সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু দিলীপকুমার প্রিয় বন্ধুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ না করে ১৯২৮ সালে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর আশ্রমে জীবনযাপনের জন্যে চলে যান। এতে সুভাষচন্দ্র গভীর দুঃখ পেলেও দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক অটুট ছিল। উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রে, কথাবার্তায় বারবার অরবিন্দ প্রসঙ্গ উঠেছে।

দিলীপকুমার স্বভাবতই চেয়েছিলেন অরবিন্দের প্রতি সুভাষচন্দ্রকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তুলতে। অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা বরাবরই অটুট থাকলেও সুভাষচন্দ্রের কিন্তু স্থির বিশ্বাস ছিল যে তাঁর জীবনে, দেশের মুক্তি সাধনে ও বাস্তবধর্মী অগ্রগতির জন্যে, স্বামী বিবেকানন্দের নির্দিষ্ট পথই অধিকতর প্রয়োজন ও কার্যকর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও মনের কথাটি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন দিলীপকুমার রায়কে মান্দালয় জেল থেকে লেখা একটি চিঠিতে (৯ অক্টোবর, ১৯২৫)। বন্ধুর চিঠির প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী, আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, 'নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা' সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমনকি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা জীবনের স্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতি মানুষের মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু-চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে ধর্ম বা লোকহিতই সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে। তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের "double dose" ..সাধক নিজে হয়তো নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন,—কিন্তু চেলারা ?"

সুভাষচন্দ্রের মনের কথাটি ছিল যে, মানব সমাজের আদর্শ গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে আবশ্যক ছিল সক্রিয় জীবনে অরবিন্দের প্রত্যাবর্তন। তাঁর ওই ইচ্ছা ও অভিমত নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু আশৈশব সুভাষচন্দ্র বাক্যে ও কর্মে নির্ভীক ছিলেন।

৬

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ও নায়ক লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলককে সুভাষচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিলককে তিনি আদর্শের প্রেমিক ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের অভিনব সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত বলে মনে করতেন। তিলক ছিলেন শিবাজির প্রতীক। কিন্তু শিবাজি শুধু মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। তিলক করেছিলেন ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তিলকের মহত্ত্বের বিশালতা সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে তেমন উপলব্ধি করতে পারেননি। পেরেছিলেন মান্দালয়ে বন্দী জীবনে। যে ভাবে তিলক দীর্ঘ ছ' বছর মান্দালয়ের

নির্জন কারাগারে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক পীড়ন সহ্য করেছিলেন তা চিন্তা করে সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন। সুভাষের মনে হয়েছিল গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলেই তিলক ওইসব যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনেও ওই দৃষ্টান্ত সব ক্লেশ, অবসাদ ও যন্ত্রণা সহ্য করতে শক্তি যুগিয়েছিল।

১৯১৩ বা ১৯১৪ সালের কোনও এক সময় সুভাষচন্দ্র প্রথম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেন। কলকাতার টাউন হলে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ অভিযানের ব্যাপারে ডাকা একটি সভায় সুভাষ তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি ওই বক্তৃতায় গভীরতর ভাবাবেগ পাননি। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মানবপ্রেম ও মহান ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রসায়ন বিভাগেব অধ্যাপক। সুতরাং সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু কলেজের সকল ছাত্রই তাঁকে গভীব শ্রদ্ধা করত। সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে নিজেরা এগিয়ে গিয়ে আলাপ করত। আর একজন বরেণ্য মানুষও ছাত্রদের কাছে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র বসুকে সুভাষচন্দ্র কী অসীম শ্রদ্ধা করতেন, কী চোখে দেখতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনায়।

১৯১৫ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জগদীশচন্দ্রের একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সুভাষচন্দ্র গভীর আগ্রহ নিয়ে ওই সভায় গিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁকে দেখতে, তাঁর মুখের কিছু কথা শুনতে। শৈশব থেকেই জগদীশচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। অনেক আশা ও উত্তেজনা নিয়ে সুভাষ জগদীশচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান দেখে খুব মর্মাহত হন। প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল ইংরাজি থিয়েটার। যেমন নাটকটির বিষয়, অভিনয়ও তেমনি। সভা শেষ হয় 'God Save the King' গান দিয়ে। সুভাষচন্দ্র একবার ভেবেছিলেন হল থেকে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার লোভে তা না করে অভিনয়ের সময় ঘুমবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুবক শ্রোতাদের উচ্চহাস্যের ফলে তাও হল না। সভা শেষ হল। কিন্তু যার লোভে তিনি ক্ষোভ ও বিরক্তি নিয়ে শেষপর্যন্ত বসে ছিলেন তাও হল না। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা হয়নি। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লেখেন যে, যতদিন না আমরা 'greatmen' (মহাপুরুষ)-দের উপযুক্তভাবে সম্মান দিতে শিখছি ততদিন আমাদের কিছু হবে না। ধিক্কার জানিয়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "থিয়েটার দিয়ে আবার অভিনন্দন! ছি! ছি! হায় ভারত! হায় বাঙ্গালী! তোমার কি এতদূর অধঃপতন হয়েছে?" সুভাষচন্দ্র জানতেন তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকেই অতিরিক্ত গোঁড়ামি বলে মনে করবে। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 'Puritanic principles'-এ বিশ্বাসী যুবকদেরই প্রয়োজন ওই অধঃপতন ঠেকাবার জন্যে। শেষে লিখেছিলেন, "জানি না জগদীশচন্দ্র এই অভ্যর্থনা কীভাবে নিয়েছিলেন। স্বদেশভক্ত জগদীশচন্দ্র দেশের দান দুই হাত পাতিয়া অবশ্যই লইবেন—ছাইভস্মই দিক আর ফুলচন্দনই দিক। কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তিনি যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই।" এই ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ায় সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠন,

মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ছিল। পরবর্তীকালেও তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এর ফলে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বহু সময়ে। জগদীশচন্দ্রের সম্ভাব্য মনোভাব সম্বন্ধে, তিনি যা বলেছিলেন, তা বোধহয় তাঁর নিজেরই পরবর্তী জীবনে ঘটেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কটকে ছাত্রজীবনেই শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী গিয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে প্রভাবিত করছিল। ১৯১৫ সালের শেষাশেষি লেখা (২৭ ডিসেম্বর) একটি চিঠিতে দেখা যায় তিনি কতটা বাংলা গান ও কবিতায় অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন। ভারতবাসী 'অন্তঃসারবিহীন' হয়ে পড়ায় মর্মাহত হলেও সুভাষচন্দ্র ছিলেন আশাবাদী। তিনি উৎসাহিত হতেন, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'কি ঘোর দুঃখরাশি, ভারত গগন ব্যাপিয়া'র মতো গানে-কবিতায় আর, বিবেকানন্দের উদাত্ত 'উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত' আহ্বানে।

প্রথম সাক্ষাতেই সুভাষচন্দ্র তাঁর সহপাঠী দিলীপ রায়কে বিস্মিত করে তাঁর পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েব কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন : 'চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ/জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ'। অবাক হয়ে দিলীপকুমার প্রশ্ন করেছিলেন, "তাঁর কবিতা আপনার মনে আছে?" উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে সুভাষ বলেন, "অন্তরে গাঁথা আছে।" শুধু বাংলা গান, কবিতাই নয়, ইংরাজি সাহিত্যেও সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনা ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। কলেজ ছাত্র সুভাষচন্দ্র অনায়াসে কথাবার্তায় নানান লেখকের রচনা উদ্ধৃত করতেন। দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন যে, ভারতীয়রা নিজেদের ওপর ভরসা রাখতে পারে না বলেই দেশের এই শোচনীয় অবস্থা। "শেক্সপীয়র পড়ুন, নিজের শক্তির চরম পরীক্ষার জন্য সব সময় তৈরি হয়ে থাকুন, দেখবেন কোথাও আপনি হঠবেন না।" এত স্বাভাবিকভাবে তিনি এসব কথা বলতেন যে এই বইপড়া কথাগুলি সুভাষের মুখে মোটেই বেমানান শোনাত না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা সুভাষচন্দ্রের ভাল লাগেনি। বেশির ভাগ অধ্যাপকের পড়ানো তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাজনীতির প্রতি তাঁর তখনও তেমন আগ্রহ জন্মায়নি যদিও স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশহিতৈষণা বোধ তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করছিল। শুধুমাত্র বই-এর পোকা হয়ে ভাল রেজাল্ট করার কোনও মোহও তাঁর ছিল না। সমাজসেবার এবং তীব্র ধর্মীয় আবেগ তাঁর মনকে অশান্ত করে তুলছিল। কটকে থাকাকালেই তাঁর 'সাধু সন্ধানে'র ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। কলকাতায় এসে ওই 'পাগলামি' যায়নি। কলকাতার অদূরে এক জেলা শহরে তিনি এক পাঞ্জাবী যুবক সাধুর খোঁজ পান। বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন। ওই সাধুর পার্থিব আকাঙ্ক্ষামুক্ত মন, শুদ্ধতা ও স্নেহময় প্রকৃতি সুভাষের মনে গভীর রেখাপাত করে। এর ফলে তাঁর গুরুলাভের ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯১৪ সালে গরমের ছুটির সময় তিনি ও তাঁর এক বন্ধু এক সহপাঠীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে গোপনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে কিছুই বলে

যাননি। পরে শুধু একটা পোস্টকার্ড লিখে জানিয়েছিলেন। উত্তর ভারতের বহু তীর্থস্থান দেখা ছাড়াও দিল্লি ও আগ্রার মতো কিছু ঐতিহাসিক স্থানও তাঁরা দেখেন। বহু আশ্রম, গুরুকুল ও ঋষিকুলের মতো প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি দেখেন। সাধু, সন্ত ও সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেন। প্রায় দু'মাস ব্যাপী ভারত ভ্রমণের সময় সুভাষচন্দ্র বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন ও মেলামেশা করেন। হিন্দু সমাজ তথা ভারতবর্ষের মৌলিক দোষত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষ করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, জাতপাতের মিথ্যা অহঙ্কার ও আচরণ সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। তেমনি কিছু কিছু প্রকৃত সাধু সজ্জনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। দীর্ঘদিন তাঁর কোনও খবরাখবর না পাওয়ায় সবাই খুবই উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। পুলিশে খবর দিয়ে সন্ধান করার কথা মনে হলেও বাড়ির লোকেরা তা করেননি। কেননা, তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, পুলিশ কাজের কাজ কিছু না করে হয়রানি করবে বেশি। শেষপর্যন্ত কাশীতে এসে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। ব্রহ্মানন্দ সুভাষচন্দ্রের পিতা-মাতা ও পরিবারের সকলকে খুব ভাল চিনতেন। তাঁর পরামর্শমত সুভাষচন্দ্র তীর্থভ্রমণ ও গুরুর সন্ধান ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

সুভাষের হঠাৎ প্রত্যাবর্তনে বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা প্রভাবতী আনন্দে ও অভিমানে বলেন, "আমার মত্যুর জন্যে তোমার জন্ম।" বাবা জানকীনাথ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেন। তারপর সব কিছু খোঁজখবর নেন। পরে দুপুরবেলা পিতা-পুত্রে একান্তে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বিস্ময়কর। সতের বছরের এক আপাত অপরিণত পুত্রের সঙ্গে প্রাজ্ঞ জীবন-অভিজ্ঞ পিতার যে ওই রকম কথোপকথন হতে পারে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। সংসারে থেকে ধর্ম হয় কি না, ত্যাগের জন্যে কেমন প্রস্তুতির প্রয়োজন, ত্যাগ সংস্কারনির্ভরশীল কি না, কর্তব্য ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এই অদ্বৈতজ্ঞান শুধুই তত্ত্ব, না জীবনে তা realise করা সম্ভব ইত্যাদি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে যে আলোচনা উভয়ের মধ্যে হয়েছিল তার মান ছিল অসাধারণ। জানকীনাথের সঙ্গে কথাবার্তার পর সুভাষের মনে হয়েছিল যে, তিনি পিতাকে তাঁর কথা বোঝাতে পেরেছেন, ভবিষ্যতে তিনি পুত্রকে জোর করে আর কিছু করাবার চেষ্টা করবেন না। এমনকি ভবিষ্যতে সুভাষ যদি আবার গৃহত্যাগ করে চলে যান তাহলেও তিনি বোধহয় আর তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করবেন না। মা কিন্তু কোনও কথাই বুঝতে চাননি। সুভাষের মনে হয়েছিল মা 'fanatic'। তাঁকে কিছুতেই বোঝান যায় না। নিজের সন্তানের প্রতি এত গভীর অন্ধ ভালবাসা সুভাষচন্দ্রের মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল নিজের সন্তানের প্রতি ভালবাসা যদি না পথের একটি ছেলের প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হয় তাহলে সে মাতৃস্নেহ 'স্বার্থহীন' হয় না। বাড়ি ফেরার ক'দিন পরে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ওই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে লেখেন, "আমি যে প্রেমসাগরে ভাসিয়াছি—তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোষ্পদ সমান।" কথাটি রূঢ়, হৃদয়হীন মনে হবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে ওই বয়সেই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা গর্ভধারিণী মা'র প্রতি ভালবাসাকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল। অথচ তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়।

লিওনার্ড গর্ডন বলেছেন, সুভাষচন্দ্রের ওই ভারত আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র ভারত-আত্মার উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তুলনাটি সুন্দর। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই ভারত দর্শনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে যেন স্বামী বিবেকানন্দেব পবিব্রজ্যার প্রতিফলন দেখা যায়। এরপর সুভাষচন্দ্রের জীবন এক নতুন মোড় নিয়েছিল। যেমন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে।

৭

তীর্থভ্রমণ, গুরুর সন্ধান ও ভারত পরিভ্রমণের শারীরিক ক্লেশ এবং অনিয়ম সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। এমনিতেই তাঁর লেখাপড়ায় মন ছিল না। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার কবার জন্যে যে একাগ্রতা ও মানসিকতা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। বরং ওই বিষয়ে তাঁর এক অনীহা, এমনকি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে পরেব বছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তাঁর ফল ভাল হয়নি। অবশ্যই তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো অসাধারণ মেধাবী ছাত্রের কাছে তা ছিল অতি সহজ। স্বভাবতই সকলেই সুভাষের পরীক্ষার ফলাফলে হতাশ হয়েছিলেন। তিনি নিজেও সাময়িকভাবে অনুশোচনা করেন। মনস্থির করেন যে 'দর্শন' (Philosophy)-এ অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়বেন ও ভাল ফল করবেন।

দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তের মূল কারণ সুভাষচন্দ্রের গভীর কৌতূহলী মন। স্কুলের জীবন থেকেই তিনি চাইতেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তব সন্ধান করতে। তাঁর বাল্যকালের এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্বেই প্রকাশ হয়েছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা তাঁকে ক্রমেই আকৃষ্ট করছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের শুরু সংশয় নিয়ে। সবকিছুকে বিচার করে তবেই গ্রহণ করতে হবে। পূর্বের কোনও বদ্ধমূল ধারণা, তা যতই পুরনো হোক না কেন, তাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। এই প্রবণতার ফলে সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনেও এতদিন যা কিছু গ্রহণ করেছেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন করতে শুরু করেন। এমনকি, যে বেদান্তকে অবলম্বন করে নিজেকে গড়ার সঙ্কল্প করেছিলেন তাও তিনি সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তিনি তাঁকে বলেন, "আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্কের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ এ দেশে বড় বড় বক্তা, বাক্-যোদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" এই নিয়ে কথাবার্তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ ওঠে।

সুভাষচন্দ্র 'তর্কযুদ্ধ' ও 'তর্কসভা'র ওপর এত জোর দেওয়ায় বিস্মিত হয়ে দিলীপকুমার বলেন, "কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেননি যে, তর্ক দিয়ে কখনো সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না?" বোঝাই যায়, সুভাষচন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী তা দিলীপকুমার জানতেন। এর উত্তরে সুভাষ কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, "তিনি কি বলেছিলেন, তাতে আমার দরকার কি?... আমরা চিরকাল সেই অতীতকে আঁকড়ে থাকব না, থাকতে পারি না। আমাদের হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে ক্ষতি করেছে tradition, সংস্কার। আমাদের গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎকে।" দিলীপকুমার নিজে

শ্রীরামকৃষ্ণকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সুভাষকেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ও ভাবানুসারী বলে জানতেন। তাই, সুভাষের ওই কথায় কিছুটা বিস্মিত ও আহত বোধ করেন। তা অনুমান করে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অশ্রদ্ধা করছেন না, তবে রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর বেশি ভাল লাগে। এদিকে দিলীপকুমার আবার তেমন বিবেকানন্দভক্ত ছিলেন না। তিনি খোলাখুলি বলেই ফেলেন, "কিন্তু আমার লাগে না। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর কাছাকাছি স্তরে পৌঁছেছেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া, এ কথা তো বিবেকানন্দ নিজেই কতবার স্বীকার করেছেন।" সুভাষ উত্তর দেন, "সেইখানেই তো তাঁর মহত্ত্ব...আজ বিশ্বময় শ্রীরামকৃষ্ণকে বিখ্যাত করেছেন তো বিবেকানন্দই।" উত্তেজিত হয়ে দিলীপকুমার বলে বসেন, "কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমী বাজারদরের পরোয়া করে না—তার দরকারও নেই।" সুভাষচন্দ্র ওই বিষয় নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাননি। তিনি বলেন, "ও আলোচনা এখন থাক।"

দিলীপকুমার রায় সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিচারণ করেছিলেন বহু বছর পরে। আর, এই আলোচনা দু'জনের মধ্যে হয়েছিল একেবারে প্রথম সাক্ষাৎকারে। তখন সবে দু'জনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছেন। সুতরাং স্মৃতিভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া, ঠিক কোন কথার উত্তরে ও পরিস্থিতিতে কী কথা কে বলেছিলেন তা সঠিক মনে রেখে বলাও দুরূহ। দিলীপকুমার নানান কারণে বিশেষ বিবেকানন্দ অনুরাগী ছিলেন না। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিও তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাও ঠিক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক অর্থে যুক্তিবাদী ছিলেন না এটা ঠিকই। কিন্তু যেভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সেটা সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক হয়নি। কিন্তু একটি কথা বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্র তখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও বিশ্বাসেরই শিকড় ঠিকমতো খুঁজে পাননি। সংশয় ও নিরন্তর প্রশ্নের পরই চূড়ান্ত বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর সঙ্কল্পে এবং লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের এটি ছিল এক বৈশিষ্ট্য।

আই সি এস থেকে পদত্যাগ, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান ও দেশবন্ধুর প্রতি আনুগত্য, গান্ধীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মৌলিক প্রশ্নে মতপার্থক্য, ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন, দেশত্যাগ করে বহির্ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম—সব কিছুর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসের গভীরতা এবং আত্ম-প্রত্যয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তেমনি যৌবনের প্রাথমিক দোদুল্যমান মনোভাবের পর স্থির নিশ্চয়তায় পৌঁছেছিল। তিরিশের দশকে যখন সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেকে এক অসীম সম্ভাবনাময়, অগ্নিগর্ভ, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ তরুণ জননেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলছেন সেই সময় বিভিন্ন জনসভায় ও চিঠিপত্রে তিনি বারবার স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন। কলকাতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে (১৯ আগস্ট, ১৯৩৯) তাঁর ভাষণে সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিকতা, এমনকি জাতীয়তার গণ্ডি অতিক্রম করে যে মহাজাতি ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিল, বিশ্বমানবের জন্যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তার উৎসমূল প্রসঙ্গে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর কথা স্মরণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা বা বোঝা যায় না

তা তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ৬ মার্চ 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদককে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি কত যে ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব ? তাঁহাদের পুণ্যভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ কবিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, এ কথা বলা বাহুল্য।"

সুভাষচন্দ্র বসু যখন 'নেতাজি'র ভূমিকায় ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে এক ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন তখনও যে তাঁর পিছনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি নেতাজি সুভাষ সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দের কাছে মা-কালীর পায়ের কাছে বসা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি চেয়েছিলেন। স্বামীজি চেয়েছিলেন কিছু যুবক যারা দেশের জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে, যারা কখনও মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হবে না যে তারা 'জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'। স্বামীজির ওই আহ্বানে কতজন যুবক মনপ্রাণ দিয়ে সাড়া দিয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব হবে না। তবে তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল চিরযুবা ত্যাগদৃপ্ত বলদৃপ্ত পুরুষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁকে, অর্থাৎ মাতৃভূমির জন্যে, রক্ত দিলে তিনি তাঁদের স্বাধীনতা দেবেন। কথা ও কাজে মিল ঘটেছিল তাঁর নিজের জীবনে। বিবেকানন্দ তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের বলেছিলেন যে, 'আমি চাই তোরা খাটতে খাটতে মরে যা।' স্বামীজি তাদের আরও বলেছিলেন, 'মৃত্যুকে ভালবাসতে।' স্বামীজির যখন মৃত্যু হয় সুভাষচন্দ্রের তখন পাঁচ বছর বয়স, স্বামীজিকে দেখার, তাঁর দীক্ষিত শিষ্য হবার কোনও সুযোগই তাঁর হয়নি। কিন্তু সর্বার্থে তিনি বিবেকানন্দের সার্থক ভাব-শিষ্য ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু ১৯১৬ সালের গোড়ায় তাঁর জীবনে এক আকস্মিক ঝড় এসে সবকিছু পরিবর্তন করে দিল। জীবন এক নতুন মোড় নিল। কলেজের ইংরাজ অধ্যাপক ই. এফ. ওটেনের বর্ণবিদ্বেষী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কলেজের সহপাঠীদের প্রতিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুভাষচন্দ্র হঠাৎই প্রচারের পাদপীঠে এসে দাঁড়ালেন। এই ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে বর্ণবৈষম্য ও ভারতে শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব এবং আন্দোলনের সূচনার পিছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কেও বহু আলোচনা হয়েছে। ফলে, এই কারণগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলের মোটামুটি ভালই ধারণা আছে। কিন্তু বর্ণ ও জাতি বৈষম্য, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের এদেশের মানুষের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ

দুর্ব্যবহার এবং আইন আদালতে তার কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকায় সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে কী রকম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কম। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হতাশা ও বিক্ষোভের মূলে এর অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১৮২৬ সালে বৈষম্যমূলক 'জুরি আইন' বিরোধী প্রতিবাদ থেকে শুরু করে ১৮৮৩ সালের ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত যে কটি রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল তার সবকটির মূলে ছিল বর্ণবৈষম্য এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা নীতির অভাব। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও অল্পকাল পরেই নীল বিদ্রোহের পিছনেও বর্ণবৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার এক বড় কারণ ছিল। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে দেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কেউই এর থেকে অব্যাহতি পাননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণকর রূপ ও সুফল সম্বন্ধে ক্রমেই মোহমুক্ত হতে থাকেন। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলেও বর্ণবৈষম্য ও ঔদ্ধত্যের অবসান হয়নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের আরও অসহিষ্ণু করে তোলে। সুভাষচন্দ্রের মনোভাবও একই রকম ছিল। প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি তাঁর তেমন কোনও আকর্ষণ না থাকলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, কলকাতায় ব্রিটিশদের ব্যবহার এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা (১৯১৪) তাঁকে রাজনীতির দিক থেকে গড়ে উঠতে ও নিজের জন্যে একটি স্বাধীন কার্যনীতি উদ্ভাবন করতে বাধ্য করেছিল। কটকের স্কুল জীবনে তিনি বর্ণবৈষম্যের কিছু আঁচ পেলেও প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি অন্য এক অবস্থা দেখলেন। প্রতিদিন কলেজে যাতায়াতের সময় ট্রামে প্রায়ই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত। ইংরাজ যাত্রীরা ইচ্ছা করেই ভারতীয়দের সঙ্গে রূঢ় ও অপমানসূচক ব্যবহার করত। মাঝে মাঝেই তারা সামনের আসনের ভারতীয় যাত্রীদের দিকে এমনভাবে পা তুলে দিত যাতে তাদের গায়ে জুতোর ছোঁয়া লাগে। সুভাষচন্দ্রের কাছে এ ধরনের অসভ্যতা অসহনীয় ছিল। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের ঝগড়া বেধে যেত। রেলেতেও এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। উচ্চপদমর্যাদার ভারতীয়রাও অপমান থেকে রেহাই পেতেন না। ওইসব ঘটনার গল্প লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে যুবকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করত। আদালতে অভিযোগ করে প্রায়ই সুরাহা হত না। ফলে ক্রমেই একটি বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে ইংরাজরা শক্তের ভক্ত। কথায় কোনও কাজ হবে না। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "এই ব্যাপারটাই মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—অন্তত বাঙ্গলাদেশে।" কথাটা খুবই খাঁটি। সুভাষচন্দ্র নিজে বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে দৈহিক শক্তি ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হতেই হবে। সামরিক শক্তি ছাড়া কোনও জাতির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ তা প্রমাণ করেছে। সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ ও

সিদ্ধান্তের মধ্যেই ভবিষ্যতের 'নেতাজি'র জন্মের বীজ রোপিত হয়।

ছাত্রজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সুভাষচন্দ্রের মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ ও ঘৃণা এত তীব্র হয়েছিল যে ১৯১৯ সালে কেমব্রিজে পড়ার সময় তিনি এক চিঠিতে তাঁর ওই দেশে থাকার অনুভূতি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই যখন দেখি শ্বেতকায় কোনও লোক আমার কাজ করছে, জুতো পরিষ্কার করে দিচ্ছে।" এত ঘৃণা কিন্তু সুভাষচন্দ্রের স্বভাব ও চরিত্র-বিরোধী ছিল। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনায় লেখায় এই মনোভাব সুভাষচন্দ্রের জীবনে ছিল না। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। আঘাত দিতে পারতেন না। কিন্তু কলেজ জীবনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব, বর্ণবৈষম্য ও জাতি শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণার পটভূমিতে 'ওটেন ঘটনা'র এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

৮

প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ই. এফ. ওটেন (E. F. Oaten)। ওটেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন। ১৯১৫ সালে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, গ্রীকরা যেমন এক সময় যেসব অসভ্যজাতি তাদের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সভ্য করে তুলেছিল, তেমনি ভারতবর্ষে ইংরাজদের লক্ষ্য হল ভারতীয়দের সভ্য করে তোলা। স্বভাবতই তাঁর এই বক্তব্য ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল যদিও তখনি কোনও গোলমাল তারা করেনি। এরপরের ঘটনা ঘটল ১০ জানুয়ারি ১৯১৬। ওইদিন ওটেন তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে গোলমাল করার অভিযোগে অপমান করেন এবং কিছু বাদানুবাদের পর তিনি তাদের কয়েকজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনাও করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস (H. R. James)-এর কাছে প্রতিবাদ করে কোনও ফল না হওয়ায় কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়। শেষপর্যন্ত দু'দিন ধর্মঘট চলার পর ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ও ওই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির তখনকার মতো অবসান হয়। এর জের কিন্তু মেটেনি। ওটেনের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা বাড়তেই থাকে। ছাত্র ধর্মঘটের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ঘটনার ফলে তিনি 'লেখাপড়ায় ভাল কিন্তু গণ্ডগোল পাকানো ছেলে' বলে কলেজে কর্তৃপক্ষের বিরূপ নজরে পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওইরকম ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ অকল্পনীয় ছিল। ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও যে কিছু ফল হল না তার মূলে ছিলেন সুভাষ।

এরপরে বিস্ফোরণ ঘটল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬। আবার সেই ওটেন কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে নিগ্রহ করে বসলেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর উত্তেজিত ছাত্ররা স্থির করল যে, আর কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ, আবেদন-নিবেদন করে কোনও লাভ হবে না। নিজেদেরই যা করার তাই করতে হবে। ওটেনকে শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্ররা ওটেনকে ধরে শারীরিক নিগ্রহ করল। এই সংবাদ সারা কলকাতায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করল। সরকারি আদেশে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল। একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হল প্রেসিডেন্সি কলেজে কেন এরকম ঘটনা

ঘটছে তার কারণ খুঁজে বার করতে। তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিবাদে অধ্যক্ষ পদত্যাগ করলেন। কিন্তু পদত্যাগ করার পূর্বেই তিনি দোষী ছাত্রদের ডেকে পাঠালেন। সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, "বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব নষ্টের গোড়া। আমি তোমাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম।" সুভাষচন্দ্র শুধু 'ধন্যবাদ' বলে বেরিয়ে এসে বাড়ি চলে গেলেন।

তদন্ত কমিটিতে তিনজন ইংরাজ ছাড়া দু'জন ভারতীয় সদস্য ছিলেন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। কমিটির সামনে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েকজন ছাত্র। ওটেন নিজে কোনও অভিযুক্ত ছাত্রকে চিনতে পারেননি। কলেজের একজন বেয়ারা শুধু সুভাষ ও অনঙ্গ দাম বলে দু'জন ছাত্রকে ঘটনার পরেই দৌড়ে পালাতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয়। সুভাষের কলেজ থেকে বহিষ্কারের যে আদেশ ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ দিয়েছিলেন সরকার তা অনুমোদন করে। তিনি অন্য কোনও কলেজে পড়ার জন্যে আবেদন করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা নাকচ করে। কার্যত সুভাষচন্দ্র 'রাস্টিকেটেড' হলেন অর্থাৎ কোথাও পড়াশোনা কবার সুযোগ আর তাঁর রইল না।

তদন্ত কমিটি সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, তিনি ওটেনকে আক্রমণ করা সমর্থন করেন কি না। তিনি বলেন, এ আক্রমণ সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ছাত্রদেরও উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি কলেজে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের 'কুকীর্তির' বহু ঘটনার উল্লেখ করেন। অনেকেরই মনে হয়েছিল ওইসব প্রসঙ্গে না গিয়ে সুভাষ যদি ওটেনকে মারার নিন্দা করতেন তাহলে তাঁর শাস্তি হত না। তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হত না। কমিটির রিপোর্টে ছাত্রদের পক্ষে কোনও কথাই লেখা হল না। অপরাধী ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র সুভাষের নামেরই উল্লেখ করা হল।

ওটেনকে নিগ্রহ করার ঘটনায় সুভাষচন্দ্র যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ ও পড়াশোনার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তাঁর মনে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে। লিওনার্ড গর্ডন এই সম্পর্কে লিখেছেন যে, সুভাষচন্দ্র তাঁকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার থেকে যাতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, পড়াশোনায় ছেদ না পড়ে তার জন্যে খুব চিন্তিত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক প্রভাব এর জন্যে খাটবার চেষ্টাও করা হয়েছিল। তাতে কাজ হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র এ ঘটনাটি সম্বন্ধে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি "বীরত্বব্যঞ্জক" ভাবে উল্লেখ করেছেন ("Put them in a more heroic light")। সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীর এক বড় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর আন্তরিকতা, সততা ও আত্মসমীক্ষা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী গান্ধীজির "My Experiment with Truth"-এর তুল্যমূল্য। সুতরাং ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর নিজের চিঠিপত্র ও অন্যান্য তথ্য একটু খুঁটিয়ে পড়া ও বোঝা প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্র যে আশা করছিলেন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহারের সুপারিশ থাকবে এ কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে খোলাখুলি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "অনুকূল কিছু ঘটতে পারে, নৈরাশ্যের মধ্যেও এরূপ একটা আশা নিয়ে আরও কিছুদিন কলকাতায় থেকে গেলাম।" সুতরাং তিনি যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার

মধ্যে ছিলেন এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। এর মধ্যে 'বীবত্বব্যঞ্জক' কিছুই নেই। ঘটনার পাঁচ বছর পরে শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা এক চিঠিতেও (২৩ এপ্রিল, ১৯২১) তিনি লেখেন, "ওটেনকে মারার ব্যাপারে যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল, আমি সেই ব্যাপার সম্পর্কে আমার যোগাযোগের কথা অস্বীকার কবছিলাম। আমি তখন ঐ মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম।" ওই "মোহ" বলতে সুভাষ ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্যে অনৈতিক আপসের কথা বলেছিলেন। ওই চিঠি লেখাব সময়ে তিনি আই সি এস থেকে সবে পদত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন অন্তত একবার আই সি এস-এ যোগ দিয়ে পরে ছেড়ে দিলেও হবে। এতে অনেক সুবিধা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে আপোষ ব্যাপারটি মন্দ, এর ফলে মানুষের অধঃপতন হয় এবং তার উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপোষহীন আদর্শের দ্বারাই কেবল একটি জাতি গঠন সম্ভব।"

হঠাৎ নিজের লেখাপড়াব পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যে কোনও মেধাবী ও অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিবান যুবককে বিচলিত করবে এটাই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র তখনও পর্যন্ত রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হননি, যদিও স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীন ভাবতের স্বপ্ন তাঁর মনকে উদ্দীপ্ত ও অধীর করে তুলেছে। কিন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল কববেন, জনকল্যাণ, সমাজসেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ কববেন, এই তাঁর তখনকার লক্ষ্য। ঘটনার কয়েকদিন পরে সহপাঠী হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠিতে (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬) তিনি আশা প্রকাশ কবেছেন যে 'ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি', উচ্চমহলে তাঁর পরিচিতি, 'আশুবাবু' তাঁর কথা জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে চাপরাশীর সাক্ষ্য "বড় weak" ইত্যাদি কারণে তাঁর নির্দোষী বলে খালাস হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। অন্তত transfer পাবেন বলে তাঁর খুব বিশ্বাস। এই মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তাঁর সব আশাভঙ্গ হল। তাঁর ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল। বাড়িতে বাবা-মা, বড় ভায়েরা কিন্তু এই ঘটনার পর সুভাষচন্দ্রকে কোনও তিরস্কার কবেননি। তবে কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই 'খারাপ' হয়ে পড়তে থাকায় তাঁবা সুভাষচন্দ্রকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল হবে বলে মনে করেন। ঠিক হয় যে, তাঁকে কটকের মতো অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরাপদস্থানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। ট্রেনে রাত্রে বাঙ্কের ওপর শুয়ে গত ক'মাসের ঘটনার কথা ভেবে সুভাষচন্দ্রের যা মনে হয়েছিল তা তিনি লিখেছিলেন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে। তিনি লেখেন, "আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু আমি দুঃখিত হইনি—যা করেছি তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ ছিল না, বরং আমি যে ঠিক কাজ করেছি, আমাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার জন্য লড়েছি এবং মহৎ এক উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি, এ জন্য আমার মধ্যে এক পরম তৃপ্তি ও আনন্দবোধ ছিল। নিজেকে বোঝালাম ত্যাগ বিনা জীবনের মূল্য কি, এবং ঘুমিয়ে পড়লাম।" 'নিজেকে বোঝালাম' কথাটির মধ্যেই সুভাষের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে।

এ ঘটনা তাঁর জীবনে যে কী বিরাট সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আকস্মিকভাবে এনেছিল তা সুভাষচন্দ্র তখন উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিলেন। দু'দশক পরে সুদূর অস্ট্রিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে থাকাকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐ ঘটনার মানসিক আঘাত ও তার

প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "১৯১৬ সালের ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তখন আমি সামান্যই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার অধ্যক্ষ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমি আমার নিজের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলাম, ভবিষ্যতে যা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে আব সহজ হবে না। এক সঙ্কটের মধ্যে সাহস ঐ স্থৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং আমাব কর্তব্য পালন কবেছি। আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সেই সঙ্গে উদ্যমশীলতা গডে উঠেছিল, যা ভবিষ্যতে আমার খুব কাজে লাগবে। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলেও নেতৃত্বের ও তার আনুষঙ্গিক আত্মত্যাগের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। এক কথায়, আমাব চরিত্র তৈবি হয়ে গিয়েছিল এবং প্রশান্ত চিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়েছিলাম।" সুভাষচন্দ্র যে ভেবেচিন্তে কাজটি করেছিলেন, ঠাণ্ডা মাথায় অধ্যক্ষেব মুখে কলেজ থেকে তাঁব বহিষ্কাবের আদেশ শুনে শুধু 'ধন্যবাদ' বলে ঘব ছেড়ে চলে এসেছিলেন তা নয। তিনি যে নিজেকে একজন বড় সাহসী নেতা বলে জাহির কবতে ওই কাজ করেছিলেন তাও নয়। সব কিছুই ঘটে গিয়েছিল আকস্মিকভাবে সাময়িক উত্তেজনার ফলে। কিন্তু এর মূলে ছিল তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতা, ইংবাজ তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান তীব্র ক্ষোভ। শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণেব অভিজ্ঞতা তাঁকে ক্রমেই আরও উত্তেজিত কবে তুলছিল। ওটেনের আচবণ ও পরবর্তী নাটকীয় ঘটনা ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল। সুভাষ 'বীর নায়ক' হওয়ার কথা চিন্তাও করেননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাই হল। রাতারাতি তিনি 'হিরো' হয়ে উঠলেন। শুধু ছাত্রদের চোখেই নয, সকলের কাছে। যাঁরা দেশের পরাধীনতার মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁদের মানসপটে এক নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটল। সুভাষচন্দ্র বসুর কিংবদন্তি হয়ে ওঠা শুরু হল তখন থেকেই। ওই ওটেনই স্বদেশে ফেরার পর শেষ জীবনে বহু বছর আগের ঘটনাটি স্মরণ করে সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ ও ওই সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯১৬) বিদেশী শিক্ষক ও ভারতীয় ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়াব কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ছাত্রদের প্রয়োজন সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা। সামান্যতম অবমাননা তাদের অত্যন্ত আঘাত করে। বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মিলনভূমি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশদের বর্তমান মনোভাবে তা সম্ভব হবে না। তারা বাঙালিদের সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছে তার মূলে আছে ভয় ও ঘৃণা। তাঁর নিজের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অবাধ-মুক্ত মনের মেলামেশার মধ্য দিয়েই মানুষে-মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। অবশ্যই তিনি শিক্ষক-নিগ্রহ সমর্থন করেননি। সুভাষের প্রতি কবির এই সস্নেহ সহানুভূতির মনোভাব আজীবন ছিল।

কটকে সুভাষচন্দ্র প্রায় এক বছর ছিলেন। ওই সময়টি তিনি কাটিয়ে ছিলেন সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি কলেরা

রোগীব সেবা করেছিলেন, মৃতদেহ সৎকারের জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের দল গড়েছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়স্থানে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। এইসব অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও পরিণত করে তুলেছিল। তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের মনোভাব গড়ে ওঠে। নিজের মনেব গোপনে যেসব কুপ্রবৃত্তি আছে তা কী করে জয় করতে হয় তা তিনি জেনেছিলেন। এইভাবে এক বছর কটকে কাটাবার পর তিনি কলকাতায় ফিবে আসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন কবে পড়াশোনা আবার শুরু করা যায় কি না তার চেষ্টা করতে।

৯

এই সময কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশে শিক্ষাজগতের সবচেয়ে খ্যাতনামা ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনা সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন বলে অনেকেই আশা করেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের ওপর বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হবে, সুভাষ অব্যাহতি পাবেন। তা কিন্তু হয়নি। ওই সময়ে ওটেনকে নিগ্রহ করার ঘটনা এমনই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল যে, তা সহজে মেটানো সম্ভব ছিল না। সরকারের উচ্চতম মহলেও ঘটনাটি আলোড়ন ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। সুভাষচন্দ্র ইতিপূর্বেই ছাত্র বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের নেতা রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ও পরে তদন্ত কমিটির সামনেও কোনওরকম দুঃখপ্রকাশ পর্যন্ত কবেননি। এই পরিস্থিতিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পক্ষে ছাত্রদের আচরণ উপেক্ষা বা লঘু করে দেখার সুপারিশ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা জানা প্রয়োজন। এটি কৃষ্ণা বসু তাঁর 'প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র' বইটিতে লিখেছেন। তিনি শুনেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর মুখে। সুভাষের সঙ্গে দেশবন্ধু ও তাঁর প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করে বাসন্তী দেবী বলেন, "প্রথম তাকে কবে দেখি জানো ? সে অনেক কাল আগের কথা। ওটেনকে যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে মার দেওয়া হয় সেদিন। ওটেনকে প্রহার দিয়ে বাবুরা এসে হাজির। আমরা সব রাত্রে খাবার টেবিলে বসেছি, 'বয়'টা এসে খবর দিল প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি ছেলে দেখা করতে চায়। উনি (দেশবন্ধু) তো অমনি বললেন, ডেকে দাও এখানে। আমি বলি, কী কাণ্ড! আমরা যে খাচ্ছি, এখানে ডাকবে কি! উনি বললেন, তা কী আর হয়েছে। ছেলের দলের সঙ্গে সুভাষ এসে দাঁড়াল। সেই প্রথম দেখা। উনি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। তারপর বললেন, যাক যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক ব্যাপার কী দাঁড়ায়।" কিন্তু দেশবন্ধুও কিছু করতে পারেননি। বাসন্তী দেবীর স্মৃতিচারণের মধ্যে কিছু ভুল হয়েছিল কি না বলা শক্ত। কেননা, সুভাষচন্দ্র নিজে বলেছেন যে, দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯২১ সালে। সুভাষচন্দ্র আই সি এস থেকে পদত্যাগ করে বিলেত থেকে কলকাতায় ফেরার পর। ওটেনের ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর কোনও লেখা বা চিঠিতে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে ঘটনার দিনই রাত্রে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। সম্ভবত ওই দিন রাত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছাত্র তাঁর কাছে গিয়েছিল। সুভাষ

তাদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু সুভাষের নাম এমনভাবে ঘটনাটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, এবং বাসন্তী দেবী নিজে সুভাষকে পরে ওই নিয়ে এতবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন সুভাষও ওই ছাত্রদের মধ্যে সেদিন রাত্রে ছিলেন। এইরকম ভ্রম হওয়া দীর্ঘকালের ব্যবধানে খুবই স্বাভাবিক। তবে দেশবন্ধু পারলে নিশ্চয় ছাত্রদেব সাহায্য করতেন। কিন্তু তখনই কারওর পক্ষেই বিশেষ কিছু কবা সম্ভব ছিল না।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায যে সুভাষচন্দ্রকে আবার কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিতে আগ্রহী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি অত্যন্ত ছাত্রবৎসল ছিলেন। বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। বসু পবিবারের সঙ্গে তাঁর অবশ্যই ভাল পবিচয ছিল। এর ফল হল ; সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি অন্য কোনও কলেজ তাঁকে ভর্তি করে নেয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি নেই। সুভাষ সোজাসুজি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আরকুহার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, তিনি 'দর্শন'-এ অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। সব শুনে, সুভাষের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়ে তিনি সম্মত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন অধ্যক্ষও এই ভর্তির ব্যাপাবে আপত্তি জানালেন না। শরৎচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ছোটভায়ের পক্ষে এই অনুরোধ জানান। সুভাষ নিজেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষচন্দ্র আবাব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। অধ্যক্ষ আরকুহার্ট খুব বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি দর্শনের ভাল অধ্যাপকও ছিলেন। বাইবেলও পড়াতেন। তাঁর পড়ানো সুভাষের খুব আকর্ষণীয় মনে হত। কলেজে কোনও গোলমালে যেন জড়িয়ে না পড়েন সে বিষয়ে সুভাষ খুব সতর্ক থাকতেন। অবশ্য আবকুহার্টের মতো সুবিবেচক ছাত্রদরদী অধ্যক্ষ থাকার ফলে কলেজে ছাত্র অসন্তোষেব কারণও ঘটেনি। ১৯১৯ সালে বি. এ. পরীক্ষায় 'দর্শন'-এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সুভাষ উত্তীর্ণ হন। প্রথম স্থান না পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র খুব খুশি হননি। দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ার ইচ্ছা তাঁর আর ছিল না, যদিও দর্শন বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ কমেনি। তাঁর মনে নতুন ভাবনা-চিন্তা দেখা দিচ্ছিল। তিনি স্থির করলেন 'পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব' নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করবেন। বিষয়টি ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন। সুভাষও তাই এই বিষয় নিয়ে পড়ার জন্যে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের কোনও কিছুই ঠিক ছকে বাঁধা পথে চলেনি। ভেবেছেন এক, কিন্তু ঘটনাচক্রে ঘটেছে অন্যরকম। আবার তাই হল। বাড়িতে না জানিয়ে যখন সুভাষ সাধু সঙ্গ, গুরুর সন্ধান ও তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে দু'মাস পরে বাড়ি ফিরেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে জানকীনাথের একান্তে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাতে সুভাষের ধারণা জন্মেছিল যে তাঁর বাবা আর কখনও কোনও বিষয়ে জোর করবেন না। সুভাষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু তাঁর অনুমান ঠিক হয়নি। জানকীনাথ হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার বাড়িতে সুভাষকে ডেকে জানতে চাইলেন তিনি ইংলণ্ডে আই সি এস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষা দেবার জন্যে যেতে রাজি আছেন কি না। যদি থাকেন তাহলে তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার

জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। মনস্থির করার জন্যে তাঁকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হল। বোঝাই যায় যে, জানকীনাথ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন। অন্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মেজদাদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে কথা বলে নিয়েছিলেন। আই সি এস পাস করে উচ্চ সরকারি চাকরিতে প্রবেশ কবা তখন মেধাবী, উচ্চবিত্ত ভারতীয় তরুণদের ও তাদের অভিভাবকদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্রের মেধা ছিল প্রশ্নাতীত। পুত্র সিভিল সার্ভিসে সুযোগ পেলে শুধু তারই নয়, বংশের সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য বৃদ্ধি পাবে এটা জানকীনাথের মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পুত্রের মতিগতির ওপরও তাঁর ভরসা ছিল না। দেশের, বিশেষ করে কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই যেমন জটিল ও উত্তপ্ত হয়ে পড়ছিল তাতে সুভাষচন্দ্রের মতো একটি তরুণের জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা খুব বেশি ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনার পর জানকীনাথ ও বাড়ির অন্য অগ্রজরা সুভাষকে নৈতিক সমর্থন জানালেও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবতই আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্যে সুদূর ইংলন্ডে পাঠালে সুভাষকে এইসব থেকে দূরে কবে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তার জীবনকে অন্যপথে চালিত করা—দুই-ই সম্ভব হবে বলে তিনি ভাবছিলেন।

জানকীনাথের আকস্মিক এই প্রস্তাবে সুভাষ গভীর বিস্মিত হলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টাব মধ্যেই তিনি মন স্থির করে তাঁর সম্মতি জানালেন। কেন সুভাষচন্দ্র ইংলন্ডে আই সি এস পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ? আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়া ছাড়ার জন্যে তাঁর তেমন কষ্ট হয়নি। কিন্তু আই সি এস পাস করে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করার কথা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। তবে তাঁর মনে হয়েছিল যে মাত্র আট মাসের প্রস্তুতিতে তিনি আই সি এস পরীক্ষায় কিছুতেই পাস করতে পারবেন না। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার সুযোগও থাকবে না। তার মধ্যে তাঁর ওই পরীক্ষায় বসার বয়স পেরিয়ে যাবে। আর, যদিও বা কোনও ক্রমে পরীক্ষায় পাস করে যান, তখন ভাববেন কী করবেন না করবেন। সুভাষ তাঁর মানসিক সঙ্কট ও উদ্বেগের কথা লিখেছিলেন ইংলন্ডে যাত্রা করার ক'দিন আগে দু'টি চিঠিতে। একটি লিখেছিলেন প্রিয়বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে (২৬ আগস্ট, ১৯১৯) অন্যটি ভোলানাথ রায়কে (১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯)।

হেমন্তকুমার সরকারকে তিনি লেখেন যে, বাড়ি থেকে বিলেত যাবার "offer" পেয়ে তিনি "গুরুতর সমস্যা"র মধ্যে পড়েছেন। তিনি ভেবে দেখেছেন যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তাঁর পাস করার আশা নেই। ফেল করলে, সবার মত হল তিনি কেমব্রিজ বা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবেন। নিজের ইচ্ছা প্রসঙ্গে লেখেন, "আমার নিজের primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ করা কারণ তাহা না হইলে Education Line-এ সুবিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মতো (এবং চিরকালের মতো) বিলাত যাত্রার প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত ?" সুভাষ তারই সঙ্গে লেখেন যে, যদি পরীক্ষায় পাস করে যান তাহলে "গুরুতর মুশকিল"

হবে। তিনি "উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট" হবেন। নিজের সিদ্ধান্ত সঠিক হল কি না এই নিয়ে সুভাষ উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। বন্ধু হেমন্তকুমারকে তাই একান্ত অনুরোধ জানান তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসতে। তাঁর পরামর্শের খুব প্রয়োজন সুভাষ বোধ করছিলেন। এর সপ্তাহখানেক পরে ভোলানাথ রায়কে সুভাষ তাঁর আসন্ন বিলাত যাত্রা প্রসঙ্গে লেখেন যে, আই সি এস পরীক্ষায় সফল না হলে তিনি কেমব্রিজে পড়তে যাবেন।

সুভাষচন্দ্র ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে জাহাজে যাত্রা শুরু করে ২০ অক্টোবর লন্ডনে পৌঁছন। হেমন্তকুমার সরকারের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়ে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। প্রিয়বন্ধুকে সুভাষ আবার লেখেন (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) গত কয়দিন "মানসিক তুফানের" মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছেন। "অনেক সংগ্রামে"ব পর তিনি বিলাত যাত্রা স্থির করেছেন। তবু মনের চাঞ্চল্য যায়নি।

সুভাষচন্দ্র যেদিন হঠাৎ দিলীপকুমার রায়কে জানান যে, আই সি এস পরীক্ষায বসতে ইংলন্ডে যাচ্ছেন দিলীপকুমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেননি। অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি, সুভাষ! তুমি আই সি এস দিতে চাও?" নিরুত্তর সুভাষ শুধু মৃদু হেসেছিলেন। ঐ হাসি রহস্যময় ছিল।

সুভাষচন্দ্রের বিলাতযাত্রার আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯)। এই নৃশংস ঘটনা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্বন্ধে বাইরে অন্যান্য অঞ্চলের সাধাবণ মানুষ তেমন কিছু জানতে পারেনি। খবর পাঠানোর ওপর কড়া সেন্সর চালু ছিল। সুভাষচন্দ্র তাই একটা "আত্মসন্তুষ্টি"র ভাব নিয়েই ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন। তাঁর এই "আত্মসন্তুষ্টি" কিছুটা বিস্ময়কর। কেননা, যতই কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা থাকুক না কেন, পঞ্জাবের নারকীয় ঘটনার কাহিনী কলকাতায় পৌঁছেছিল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ ও ভাইসরয়কে লেখা ঐতিহাসিক চিঠিটি সারা দেশে ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং, কলকাতার বসু পরিবারে, বিশেষ করে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের মতো সচেতন ও সংবেদনশীল মনে, ঐ ঘটনা তেমন কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি তা মনে হয় না। সম্ভবত, সুভাষচন্দ্র ওই মুহূর্তে কোনও রাজনৈতিক আবর্তে পড়তে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা-মাতার উদ্বেগ দূর হয়নি। পুত্রকে অল্প সময়ের মধ্যে বিলেতে পাঠাবার সিদ্ধান্তের পিছনে ঐ উদ্বেগই কাজ করেছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেও কিছুটা আত্মসমীক্ষা করছিলেন। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, পাশ্চাত্যে যাওয়ার এবং ইংলন্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জনের ইচ্ছা তাঁর ঐ সময়ে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, ঐ অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যতের কর্মজীবনে খুবই কাজে লাগবে। এই সময় লেখা তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় যে অধ্যাপনা বা সাংবাদিকতা করার প্রতি তাঁর একটা প্রবণতা এসেছিল। বিলাত থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লেখা প্রথম চিঠিতেই তিনি ওই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

আই সি এস পরীক্ষার ব্যাপারটা প্রথম থেকেই তাঁর কাছে গৌণ ছিল। এটি ছিল বিদেশ যাবার একটি সুযোগ ও উপলক্ষ মাত্র। প্রথম থেকেই তিনি মনস্থির করেছিলেন যে আই সি এস পরীক্ষায় ফল যাই-ই হোক না কেন, তিনি বিদেশের পড়াশোনা শেষ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে ফিরে বৃহত্তর কর্মজীবনে নামবেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কোনও চাকরি গ্রহণ করা তাঁর চিন্তারও অতীত ছিল। তবুও আই সি এস পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর মনে ইংলন্ডে পৌঁছবার কয়েক মাস পরেও কাঁটার মতো বিঁধেছিল। হেমন্তকুমার সরকারের কাছে একটি চিঠিতে এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন (১৯ জানুয়ারি, ১৯২০), "এখনও বুঝিতে পারি নাই—আমি আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি কি না। আমি আত্মপ্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাই না যে Civil Service-এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিসটা ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধহয় করি—এ অবস্থায় Civil Service-এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্বলতার নিদর্শন অথবা কোনও দূরবর্তী মঙ্গলের সূচক তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন। অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌঁছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তাহা হইতে পারে না ?"

সুভাষচন্দ্র ওই চিঠিতে যেন নিজের ভাগ্যলিপি দেখতে পাচ্ছিলেন। শুধু আই সি এস পরীক্ষার জন্যে বিলেতে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই নয়, এরকম একাধিকবার ঘটেছিল তাঁর জীবনের বহু স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে।

ইংলন্ডে পৌঁছে সুভাষচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। তিনি পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ আগেই কেমব্রিজে নতুন শিক্ষা বৎসরের পড়াশোনা শুরু হয়ে গেলেও কিছু অসুবিধার পর তিনি শেষপর্যন্ত ভর্তি হবার সুযোগ পান। তিনি Mental and Moral Sciences-এ (মানসিক ও নীতি বিজ্ঞান) ট্রাইপোজের (Tripos) জন্যে পড়া শুরু করেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন (১২ নভেম্বর, ১৯১৯), "আমার মতলব আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া এবং পাস করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।"

১০

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পিছনে তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সাহায্য, বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল ও কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্স' বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকটা সহায়তা করেছিল। এই IDF Service-এর পূর্ব অভিজ্ঞতা কেমব্রিজে ভর্তির ব্যাপারে কাজে লাগার কথা তিনি চিঠিতেও উল্লেখ করেছিলেন। সামরিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণের সঙ্গে পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা ও 'নেতাজি'র ভূমিকা নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই, সুভাষচন্দ্রের এই মানসিকতা ও অভিজ্ঞতার একটু বিশদ উল্লেখ প্রয়োজন।

ছোটবেলায় পি. ই. স্কুলে পড়ার সময় তিনি খেলাধুলা করতে ভালবাসতেন না। শুধু ড্রিল করাই তাঁর পছন্দ ছিল। স্কুলের সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার পরিবেশ তাঁর মনে দাগ ফেলেছিল। কলকাতায় কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের জাতি বিদ্বেষ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, কেমনভাবে তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল তা আমরা দেখেছি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে সামরিক শক্তি যে কতখানি অপরিহার্য তা তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেন ওই সময় থেকেই। জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে সামরিক শক্তি অর্জনের কোনও বিকল্প নেই, এটি তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পব এক বছর কটকে কাটিয়ে কলকাতায ফিরে এসে, অন্য কোনও কলেজে ভর্তি হবার আবেদন যখন বিবেচনাধীন রয়েছে তখন তিনি '49th Bengalee' বাহিনীতে যোগ দেবেন মনস্থ করেন। অপেক্ষায় থেকে তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। নিজেব কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় পাস করতে না পারায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্কটিশ চার্চ কলেজে পডাব সময় সামরিক ট্রেনিং নেওয়াব একটা সুযোগ তিনি পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-রক্ষা বাহিনীর একটি শাখা গঠিত হয়েছিল। এ শাখায লোক সংগ্রহ করা হচ্ছিল। এখানে ভর্তির ব্যাপারে স্বাস্থ্যপরীক্ষা তেমন কঠোর না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র সুযোগ পেয়ে যান। চারমাস বীতিমত সামরিক ট্রেনিং নিতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি তা খুবই উপভোগ করেছিলেন। কিছুদিন তাঁদেব কলকাতার অদূরে বেলঘরিয়ায বন্দুক চালানো শিখতে হয়েছিল। মাত্র কিছুকাল পূর্বে সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্রিটিশ সামবিক অফিসাবের কাছে শিক্ষানবিস-এর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে সুভাষচন্দ্র নিজেই অবাক হযে যেতেন। শিবিব জীবনের নানান শিক্ষা ও তার সুফল প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ভাই ভাই ভাব' জাগিয়ে তোলার দিকটি। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বাঙালি ছাত্ররা যখন প্রথম সামরিক শিক্ষা শুরু করে তখন তাদের সম্বন্ধে সামরিক অফিসারদের ধাবণা ছিল খুবই খারাপ। ওইসব ছেলে কোনওদিন সত্যিই ভালভাবে বন্দুক রাইফেল চালাতে শিখবে, যুদ্ধ করতে পারবে এ তারা বিশ্বাসই করত না। কিন্তু মাত্র তিন সপ্তাহের ট্রেনিং-এর পর বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় যখন ওই 'আনাড়ির দল' তাদের শিক্ষকদেরই হারিয়েছিল তখন তারা অবাক হয়ে যায়। ছাত্রজীবনের এ সামরিক শিক্ষার কথা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র যা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, "এই শিক্ষা আমাকে এমন কিছু দিয়েছিল যা আমার প্রয়োজন ছিল অথবা যা আমার মধ্যে ছিল না। মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সৈনিক হিসাবে আমাদের এমন কতকগুলি অধিকার ছিল ভারতীয় হিসাবে যা আমাদের ছিল না। ... আমরা প্রথম যেদিন আমাদের রাইফেল আনবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে মার্চ করে ঢুকলাম, সেদিন অদ্ভুত এক ধরনের তৃপ্তিবোধ আমাদের হয়েছিল, যেন আমরা এমন একটা কিছুর দখল নিচ্ছি, যাতে আমাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে, অথচ যার থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।" এই লেখা পড়লে যেন মনে হয় অদূর ভবিষ্যতের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের 'চলো দিল্লির' ডাক শোনা যাচ্ছে।

কেমব্রিজে পড়ার সময়ও সুভাষচন্দ্র সামরিক শিক্ষালাভের জন্যে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি একটি বিজ্ঞাপন পড়ে 'ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর'-এ ভর্তির জন্যে আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনকারী ভারতীয় ছাত্রদের জানানো হয় যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আপত্তি থাকায় তাদেব আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব হবে না। এর কারণ, ওই ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অধিকার জন্মায়। ভবিষ্যতে যদি কোনও ট্রেনিংপ্রাপ্ত দক্ষ ভারতীয় সম্মিলিত ব্রিটিশবাহিনীর অফিসার পদে নিযুক্ত হন তাহলে সঙ্কটজনক পবিস্থিতি দেখা দেবে। কেননা, ভারতীয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এটা মানতে চাইবে না। ওটিসি-তে যোগদানে ইচ্ছুক ছাত্ররা জানায় যে, তারা আশ্বাস দিতে প্রস্তুত যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে তারা চাকরি চাইবে না। তাদেব আগ্রহ সামবিক শিক্ষালাভে ; ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে নয়। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। কোনও কোনও মহলে ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে ভারতীয় ছাত্রদের ওই সামরিক শিক্ষা লাভের পথে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে।

একই সঙ্গে আই সি এস পবীক্ষাব জন্যে প্রস্তুতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করার ফলে সুভাষেব ওপর চাপ পড়ে খুব বেশি। বহু বিচিত্র ধরনের বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে পডতে হত। মাত্র কযেকমাস পরেই সিভিল সার্ভিস পবীক্ষা থাকায় তাঁকে অবশ্য বেশি সময দিতে হয়েছিল এ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে। পড়াশোনার পর যেটুকু সময় পেতেন তা কাটাতেন ভারতীয় মজলিস ও ইউনিয়ন সোসাইটির সভা সমিতিতে যোগ দিযে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁব বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এখানে ভারতবাসীদের একটি সমিতি আছে। নাম Indian Majlis, সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। এবং মধ্যে মধ্যে বাহিব হইতে বক্তারা আসেন। এই বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সরোজিনী নাইডু, এন্ড্রুজ, বাল গঙ্গাধব তিলক প্রমুখ। ইংলন্ডে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তখন উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবণতা প্রবল। তাদের 'সুরটা' ছিল 'বড় চড়া'। নরম বক্তৃতা শুনতে তারা ভালবাসত না। এর কারণ, ভারতবর্ষে তখন 'নরমপন্থী (Moderates) এবং 'চরমপন্থী' (Extremists) বিতর্ক-বিরোধে চরমপন্থীদের জয় হয়ে গেছে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের (এপ্রিল, ১৯১৮) প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার ও তা কার্যকর করার জন্যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের সম্পূর্ণ হতাশ করেছিল। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পরও ভারতে দমনমূলক ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে রাওলাট আইনের প্রবর্তন, রাওলাট অ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলন এবং অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বিদেশেও ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, উত্তেজনা ও ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল।

সুভাষচন্দ্র দেশ থেকেই এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা নিয়ে এসেছিলেন। তারই তীব্রতা প্রকট হয়েছিল সাদা চামড়ার লোককে তাঁর জুতো সাফ করতে দেখে খুশি হওয়ার মধ্যে। কিন্তু ওই চিঠিতে তিনি ইংলন্ডের লোকেদের উদ্যমশীলতা ও সজীবতার প্রশংসা করেছিলেন। তাদের সময়জ্ঞান, সব কাজে 'method', ছাত্রদের মর্যাদা, অধ্যাপকের ব্যবহার ও মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এইসব গুণাবলী দেখে শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়েছিল। তিনি আরও মুগ্ধ হয়েছিলেন বিতর্ক-সভার পরিবেশ ও সকলের বাক্-স্বাধীনতা দেখে। যত নামী দামী বক্তাই হোন না কেন শ্রোতারা প্রশ্ন-সমালোচনা করতে ছাড়ত না। কেমব্রিজে ব্রিটিশ ও ভারতীয়

ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি সৌহার্দ্যপূর্ণ হলেও খুব কমক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠত। সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে, অমায়িকতার আড়ালে ব্রিটিশদের মনে একটা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ছিল। তাছাড়া, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি মধ্যবিত্ত ইংরাজদের একটা সহানুভূতি ছিল। রাজনৈতিক সচেতন ভারতীয়দের পক্ষে এটা দুঃখজনক মনে হত। জাতি ও বর্ণের কারণে পক্ষপাতিত্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। কেমব্রিজেও তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা যে কতটা খাঁটি তা সুভাষচন্দ্র ইংলন্ডে গিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন পাশ্চাত্য জগৎ দেখিয়েছে "Power of the People"—জনগণের ক্ষমতা কতখানি। ভারতের উন্নতি কোনওদিনই হবে না যতক্ষণ না নিম্নবর্গের মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে। শূদ্র জাগরণ, শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান ও সংগঠন ভারতের উন্নতির জন্যে অপরিহার্য। একটি চিঠিতে (২৩ মার্চ, ১৯২০) সুভাষচন্দ্র স্বামীজির এই কথাগুলির ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি ইংলন্ডে এসে এসব দেখে বুঝেছেন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও শ্রমিক আন্দোলন ভারতের পক্ষে কতটা জরুরি।

আজকের দিনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ভেবে দেখার মতো। প্রশ্নটি হল : ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো বাঞ্ছনীয় কি না, এবং যদি হয়, তাহলে কোন বয়সে তাদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠানো উচিত। এই বিষয়ে তিনি যা দেখেছিলেন এবং তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল যে, কিছুটা সাবালকত্ব অর্জনের পরই বিদেশে যাওয়া উচিত। অপরিণত মন নিয়ে বিদেশে শিক্ষালাভ করলে বিশেষ সুফল হয় না। তিনি মনে করতেন, "নিম্নতর ধাপগুলিতে শিক্ষা অবশ্য 'জাতীয়' হওয়া চাই। দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ থাকা চাই। স্বদেশের সংস্কৃতি থেকে মনের খোরাক আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অল্প বয়সেই কাউকে অন্যস্থানে পাঠিয়ে দিলে তা কী করে সম্ভব হবে? না, ছেলেমেয়েদের অপরিণত বয়সে একেবারে একাকী বিদেশের স্কুলগুলিতে পাঠাবার চিন্তাকে আমাদের সচরাচর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে উচ্চতর ধাপগুলিতে। তখনই শুধু ছাত্রেরা বিদেশে গিয়ে উপকৃত হতে পারে, এবং তখনই পারস্পরিক কল্যাণের জন্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটতে পারে।"

বর্তমান কালে ছেলেমেয়েদের বিদেশের স্কুলে পড়াশোনা করার চিন্তা অবশ্যই খুবই কমসংখ্যক পিতা-মাতা করেন। ওইরকম আর্থিক সামর্থ এবং সুযোগ-সুবিধা আছে এমন পরিবার বিরল। কিন্তু দেশের মধ্যেই এমন বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলির পরিবেশ, পাঠ্যক্রম ও আচরণবিধি "বিদেশী" স্কুলের মতোই। স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে ওইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শুরু থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ির টান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ বা সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাদর্শ ও অভিমত সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা লন্ডনে শুরু হয়। ওই সময় যাদের যোগ্যতা ছিল তারা সকলে এই পরীক্ষা দিতে পারত (open competitive

examination)। পরীক্ষা একমাস ধরে চলেছিল। দীর্ঘ পরীক্ষা চলার সময় সুভাষচন্দ্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু ওই যন্ত্রণা পরীক্ষার চাপ ও উদ্বেগের জন্যে, না এরপর কী পরিস্থিতি হবে সেই চিন্তায় তা বলা কঠিন। পরীক্ষা শুরুব চারমাস আগে তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "কোন দিকে ভেসে যাচ্ছি জানি না। কোন তীবে গিয়ে উঠব তাও জানি না। তবে বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।" স্পষ্টতই তিনি তাঁর ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হননি। একে তো প্রস্তুতিব সময় পেয়েছিলেন মাত্র আট মাস। তার ওপর সংস্কৃত পবীক্ষা ভাল হয়নি। জানা সহজ প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটি ঠিকভাবে লিখলে অনেক নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। পরীক্ষা যে ভাল হয়নি তা তিনি বাড়িতে জানযেও দিয়েছিলেন। মনস্থিবই কবে ফেলেছিলেন এবাব 'ট্রাইপোজে'র জন্যে মন দিয়ে পড়াশোনা করবেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে আসে। সুভাষচন্দ্র যদি সিভিল সার্ভিস পবীক্ষায পাস কবা বিষযটিকে তেমন গুরুত্ব নাই দিয়ে থাকেন, পবীক্ষায সফল হলেও সবকাবি চাকবি নেবেন না বলে মনে মনে সঙ্কল্প করে থাকেন, তাহলে পবীক্ষায ভাল না করা নিয়ে তাঁর মনস্তাপের কী কারণ ছিল? কেন তিনি 'বোকাব মত' ১৫০ নম্বব ছেড়ে দিয়ে উত্তবপত্র জমা দিয়ে 'আঙুল কামড়ে' ছিলেন? এব থেকে মনে হতে পাবে মুখে যাই বলুন না কেন, সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পবীক্ষায় সফল হতে চেযেছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নয়। সুভাষচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি নিজেও ওই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে কোনও পরীক্ষায় বা কোনও কাজেই ব্যর্থতা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি সে ধাতের মানুষই ছিলেন না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসে ফেল করা তাঁর মানসিকতায় ছিল না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সরকারি চাকরি না নেওয়া, আর সফল হয়ে তারপর চাকরি প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে যে তফাৎ তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাবপর তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করবেন এই ছিল তাঁর মনোগত ইচ্ছা। পরীক্ষায় ভাল না করায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন ওই কারণে। কিন্তু বিরাট বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রে এক বন্ধুর 'তার' পেলেন। বন্ধু তাঁকে পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছে। পরের দিন সকালে কাগজ খুলে দেখলেন সত্যিই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর, শুধু উত্তীর্ণই নয়—চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। উৎফুল্ল বিস্মিত সুভাষ বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন সুখবরটি জানিয়ে। কিন্তু, তাঁর কাছে এটা সত্যিই কতটা সুখবর ছিল?

১১

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সাফল্য সুভাষচন্দ্রকে এক বিরাট সমস্যার মধ্যে ফেলল। এতদিনের সব বিশ্বাস, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে তিনি কি এবার পরম নিশ্চিন্ত হয়ে সরকারি চাকরি গ্রহণ করবেন? এরকম সুযোগ পেয়ে সেটা করাই একান্ত স্বাভাবিক বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হবে। সবাই তাই করে থাকে। নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল

তাঁর মনে। ইতিপূর্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার সুযোগ প্রত্যাখ্যান কোনও ভারতীয় করেননি। এরপরে চূড়ান্ত পরীক্ষা বাকি ছিল। এ পরীক্ষা হবার কথা ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে। সুভাষের হাতে প্রস্তুতির সময় ছিল প্রায় ন'মাস। যে বিষয়গুলি বাকি ছিল সেগুলিতে পাস করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। যেমন, ভারতীয় ফৌজদারি আইন (Indian Penal Code), ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতীয় ভাষা প্রভৃতি। এর সঙ্গে ছিল অশ্বারোহণ পরীক্ষা (riding test)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অরবিন্দ অশ্বারোহণ পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি, যদিও অন্যসব বিষয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছিলেন। সুভাষের পক্ষে অশ্বারোহণে পাস করা মোটেই দুরূহ হত না। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসবেন কি না এই সিদ্ধান্ত নেওয়াব পূর্বে তিনি দারুণ মানসিক অশান্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

বাবা-মা, বাড়ির সবাই, আত্মীয় বন্ধুরা এবং (সম্ভবত) শরৎচন্দ্র পর্যন্ত চাইছিলেন সুভাষ যেন এত বড় সম্মান, সুযোগ ছেড়ে না দেন। শুধু কলকাতার কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক ও তীব্র রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বন্ধু সুভাষের আই সি এস-এ যোগদান না করার সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে এক ঝড় চলছিল। তিনি তাঁর বাবা-মা ও অগ্রজদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদেব মনে আঘাত দেওয়ার চিন্তা তাঁকে বিচলিত করছিল। অন্যদিকে তাঁর নিজের আদর্শ ও জীবনের লক্ষ্য। তখনও তিনি সুনিশ্চিত হতে পারছেন না যে, যাই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিন না কেন, তা ঠিক হবে কি না।

প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও সঙ্কটের সময় যাঁর সঙ্গে তিনি তাঁর সব কথা মন খুলে বলতে পারতেন, পরামর্শ চাইতেন, তিনি ছিলেন মেজদাদা শবৎচন্দ্র। পরীক্ষার খবর বেরবার পর সুভাষচন্দ্র অসংখ্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি খুশি হতে পারেননি। শরৎচন্দ্রকে সেই কথা জানিয়ে তিনি লেখেন, "চাকরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে? চাকরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্যের বিনিময়ে?" আই সি এস-এর চাকরি অবশ্যই লোভনীয়। কিন্তু সুভাষের মতো মানুষের কাছে জীবনে সুনিশ্চিত সাফল্য ও নিরাপত্তা সর্বোত্তম লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ, তাঁর মতে, "সংগ্রামহীন ঝুঁকিহীন জীবন তাব অর্ধেক মাধুর্য হারায়"। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, একবার সিভিল সার্ভিসে ঢুকলে আর তাঁর 'তেজ' থাকবে না, চাকরির মোহে পড়ে যাবেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর ক্ষেত্রে এরকম ঘটবে না। তিনি শরৎচন্দ্রকে জানান, "আমি বিবাহ করব না।" ফলে নিজের জাগতিক স্বার্থের চিন্তা তাঁর ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না। সুভাষ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর পিতার মতামত জানার জন্যে। কিন্তু নিজে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনও কথাবার্তা না বলে তিনি মেজদাদাকে অনুরোধ করেন এই ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটভায়ের সঙ্গে একমত হবেন। জানকীনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। এই চিঠিটি সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

শরৎচন্দ্রকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এই চিঠি বাড়িতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

আই সি এস-এ যোগদানের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ও নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাঁব পরিকল্পনা জেনে সবাই ক্ষুব্ধ, হতবাক্ হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তা অনুমানই কবেছিলেন। তাই, নিজের ওই চিঠিকে 'বিস্ফোরক' বলে বর্ণনা করেছিলেন। জানকীনাথ পুত্রকে বোঝাবাব চেষ্টা কবেন যে, সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ওই চাকরির দোষ-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা এবং দেশের কল্যাণ করা সম্ভব। দৃষ্টান্তরূপে বমেশচন্দ্র দত্তের কথা ওঠা স্বাভাবিক ছিল। সুভাষ এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ কবতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, রমেশচন্দ্র দত্ত সিভিল সার্ভিসের বাইরে থাকলে দেশের অনেক বেশি মঙ্গল হত। তাঁকে নিয়ে কলকাতার আত্মীয়-বন্ধু মহলে যে হইচই ও সমালোচনার গুঞ্জন হচ্ছিল তাতে সুভাষ অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ১৯২১ সালের ২৬ জানুয়ারির এক চিঠিতে তিনি শবৎচন্দ্রকে লেখেন যে, অন্য কে কী বলল বা ভাবল তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তাঁর আবেদন মেজদাদার আদর্শবাদের কাছে। একদিন 'ওটেন ঘটনা'কে কেন্দ্র করে যখন তাঁর জীবনে এক বিপর্যয় ঘটেছিল তখন শবৎচন্দ্র তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। আজ আবার সেই সমর্থনই তিনি আশা করছেন। তিনি জানান, "ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি দৃঢ়তা, সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব।" কয়েকদিন পরে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) তিনি আর এক চিঠিতে চিত্তরঞ্জন দাশের সবকিছু ত্যাগের আদর্শের উল্লেখ করে লেখেন যে, আত্মত্যাগ, সরল জীবন, উচ্চ চিন্তা এবং দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগই হল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। অরবিন্দ ঘোষের আদর্শ তাঁব কাছে রমেশচন্দ্র দত্তের কর্মপথের চেয়ে বেশি মহৎ, উন্নত ও অনুপ্রেরণাদায়ক। এক সপ্তাহ পরে আর একটি চিঠিতে তিনি অরবিন্দকে তাঁর "আধ্যাত্মিক গুরু" বলে শ্রদ্ধা জানান। জীবনের ওই সন্ধিক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে গভীবভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সুভাষ তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২২ এপ্রিল (১৯২১) ভারত-সচিব ই.এস. মন্টেগুকে চিঠি লিখে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রবেশনার্স (Probationers) তালিকা থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। তার দু'সপ্তাহ আগে (৬ এপ্রিল) শরৎচন্দ্রকে বসুকে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে লেখেন, "মনের দীর্ঘ বিরোধ আমি মেটাতে সক্ষম হইনি। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যদিকে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে আমরা যারা বড় হয়েছি—দুর্ভাগ্যজনকভাবেই হোক আর সৌভাগ্যজনকভাবেই হোক তাদের মানসিকতা এইরকম দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতের মধ্যস্থ কোন কিছুকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না।"

শেষপর্যন্ত যে মানসিকতায় সুভাষচন্দ্র গড়ে উঠেছিলেন তারই জয় হয়েছিল। যেদিন তিনি চিত্তরঞ্জনের সর্বস্ব ত্যাগের উল্লেখ করে চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে কার্যত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প "অন্ন সংস্থানের" মতো চাকরির কথা চিন্তা করেছেন, ওইদিনই (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কেমব্রিজ থেকে নিজের পরিচয়, ইংলন্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য, সরকারি চাকরি গ্রহণে তীব্র অনিচ্ছা ও দেশবন্ধুর স্বদেশসেবার কাজে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি দেন। ওই ঐতিহাসিক চিঠিতে কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর কিছু প্রস্তাবও ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানান যে, দেশে

প্রত্যাবর্তন করে তিনি অধ্যাপনা ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করলে খুশি হবেন। আরও জানান যে, তাঁর মনোগত বাসনার কথা শুধুমাত্র তাঁর বাবা ও দাদাকে জানিয়েছেন। এখনও তিনি আই সি এস-এ 'শিক্ষানবিশ' (Probationer)। সুতরাং তাঁর চিঠির কথা জানাজানি হওয়া কাম্য নয়। তিনি দেশবন্ধুকে লেখেন, "আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মেব আদেশ দিন।" দু'সপ্তাহ পবে দেশবন্ধুকে জানান যে চাকরি ছাড়া সম্বন্ধে তিনি কৃতসঙ্কল্প। তিনি কী কী কাজ কবতে পারেন সে বিষয়েও সুভাষ আবার লেখেন। কংগ্রেস সংগঠন ও কর্মসূচী কীভাবে আরও সুদৃঢ় এবং কার্যকর করা যেতে পাবে সেই বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার কথা বিশদভাবে জানান।

শরৎচন্দ্র বসু সুভাষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশে ফেরার পর পদত্যাগ করাই সুবিবেচকের কাজ হবে। কিন্তু সুভাষ জানান যে কিছু আইনগত অসুবিধা ছাড়াও, 'দাসত্বের প্রতীক চুক্তিপত্রে' সই করা তাঁর পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব নয়। প্রায আট মাস আগে ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হযেছিল (১ আগস্ট, ১৯২০)। শরৎচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে ওই আন্দোলনের তখন এক অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে অপেক্ষা ও লক্ষ্য করাই ভাল। শরৎচন্দ্রের ইঙ্গিত ছিল যে, বর্তমান অবস্থায় সুভাষেব বাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। সুভাষচন্দ্র তার উত্তরে যা লেখেন তা ছিল তাঁর চরিত্র ও লৌহ সঙ্কল্পের পরিচয়। তিনি লেখেন, "আন্দোলন বিফল হওয়ার কিংবা শিথিল হওয়ার আশঙ্কাতেই আমি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, যাতে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে খুব বেশি দেরি না হয়ে যায়।" যেদিন মন্টেগুব কাছে পদত্যাগপত্র লেখেন সেইদিনই বন্ধু চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লেখেন, 'Power, Property, Wealth' যখন করতলগত তখন তাঁর মন তাঁকে বলেছে—'এতে তোমার আনন্দ নেই। তোমার আনন্দ সমুদ্রের ঢেউ'এর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো'।

জানকীনাথ পুত্রের সিদ্ধান্ত অনুমোদন কবতে পারেননি। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে সিভিল সার্ভিসে থেকেও সুভাষ দেশের মঙ্গল করতে পারবে। তাছাড়া, তাঁর মতে আগামী দশ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করবে। সুভাষ পিতার এই অভিমত ও যুক্তি মানতে পারেননি। তিনি ত্যাগের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। দেশে যে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার চলছিল তার প্রেরণায় একজনও সিভিল সারভেন্ট চাকরি থেকে ইস্তফা দেননি। সুভাষ তা প্রথম করে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কেমব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সচিব রবার্টস, সহকারী ভারত-সচিব স্যার উইলিয়াম ডিউক ও আরও অনেকেই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। বাবা-মা, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মেজদাদার অনুরোধ, পরামর্শ পর্যন্ত তিনি শোনেননি। এরজন্যে তিনি গভীর মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আদর্শ ও কর্তব্যবোধের জন্যে তিনি তাও সহ্য করতে পেরেছিলেন। তবে সুভাষের এক গভীর সান্ত্বনা ছিল যে তাঁর মা তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রভাবতী পুত্রকে চিঠি লিখে জানান যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তাঁর নিজের আস্থা আছে। মা'র ওই চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুভাষচন্দ্র মেজদাদাকে লেখেন, "এটি আমার কাছে একটি স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে কারণ এটি আমার মন থেকে

একটি ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছে।" শরৎচন্দ্রও কিন্তু তাঁর স্নেহের অনুজের বলিষ্ঠ আদর্শবাদী সিদ্ধান্ত মনে মনে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর উপদেশ সুভাষচন্দ্র না মানলেও তাঁর প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর স্নেহ এতটুকু কমেনি। পিতা জানকীনাথ যে পুত্রের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তাও প্রত্যাশিত ছিল। তাঁর কর্মজীবন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজ আনুগত্য ও চারিত্রিক গঠনের কথা মনে রাখলে এটা স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু পুত্রেব সৎ সাহস, আত্মত্যাগ ও গভীর স্বদেশপ্রেম এবং দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁকেও ক্রমেই বিচলিত করে তুলছিল। তারই পরিণতি রূপে তিনি কয়েক বছব পবেই তাঁর 'রায়বাহাদুর' খেতাব বর্জন করেছিলেন।

আই সি এস থেকে পদত্যাগের পর সুভাষচন্দ্র আরও কয়েক মাস কেমব্রিজে পড়াশোনা করে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন আর তাঁর পড়াশোনায় একেবারেই মন ছিল না। তাঁর মন তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ। ট্রাইপোজে তাই তাঁর ফল তেমন ভাল হয়নি। অত্যন্ত মেধাবী বলেই তিনি প্রায় পড়াশোনা না করেই ওই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেবেছিলেন। দেশে ফিরতে এতই অধীর হয়েছিলেন যে, পরীক্ষা পাসের 'ডিপ্লোমা' নেবাব জন্যেও তাঁর তব সয়নি। সতীর্থ বন্ধু ক্ষিতীশকে বলে যান তাঁর হয়ে 'ডিপ্লোমা'টি সংগ্রহ করতে।

ইংলন্ডে সুভাষচন্দ্রের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দিলীপকুমার রায় ও ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়। তিন বন্ধুর সঙ্গে ধর্মবীর নামে এক পাঞ্জাবি ডাক্তার, তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী ও তাঁদের দুই কন্যাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। প্রায়ই তাঁরা ওই পরিবারের বাড়িতে যেতেন। ডাঃ ধর্মবীরের স্ত্রীকে সুভাষচন্দ্র 'দিদি' বলতেন। ধর্মবীরদের দুই কন্যাকে তিনি ছোটবোনের মতো স্নেহ করতেন। ধর্মবীরদের বাড়িতে প্রায়ই গান ও কবিতা পাঠের আসর বসত। দিলীপকুমার গান গাইতেন। সুভাষ আবৃত্তি করতেন। ইংলন্ড ছেড়ে চলে আসার আগে শ্রীমতী ধর্মবীরকে এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে ইংলন্ডে প্রবাস জীবনে তিনি কখনই সুখী হতে পারেননি। ভারত ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক যা সম্পর্ক তাতে তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি মুহূর্ত একজন স্পর্শকাতর ভারতীয়কে স্মরণ করিয়ে দেয় তার মাতৃভূমির করুণ অবস্থা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেই যে তিনি খুশি হতে পারবেন তা নয়। সেখানেও একই অনুভূতি তাঁকে অস্থির করে তুলবে। তবে তার একটাই সান্ত্বনা থাকবে—সেটি হল যে, স্বদেশে তিনি নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজে সাধ্যমত কিছু করার চেষ্টা করবেন। শ্রীমতী ধর্মবীর সুভাষের কাছে ছিলেন মাতা ও ভগিনীর মতো। দেশে ফিরেও ধর্মবীর পরিবারের সঙ্গে তাঁর চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। শ্রীমতী ধর্মবীরকে ভারত ভ্রমণে আসার অনুরোধ করে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন যে, এদেশের অনেককিছুই তাঁদের ভাল লাগবে না। কিন্তু একটি নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেন—প্রাচ্যের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা পাশ্চাত্যের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সহজ। আর একটি কথা—ভারতের মানুষের কাছে 'সভ্যতা'র নিদর্শন বলতে কলকারখানা, আকাশচুম্বী বাড়ি বা সুন্দর সুন্দর সাজপোশাকের মালিকানা বোঝায় না। ভারতীয়দের কাছে উন্নত মানবাত্মা, দিব্যশক্তির সঙ্গে মানুষের নৈকট্যই সভ্যতার লক্ষণ। ভারতের মানুষ রাজনৈতিক নেতা, ধনকুবের বা ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে না। কপর্দকহীন, একমাত্র

ঈশ্বব-সম্বল কঠোব যোগী তপস্বীই তাদেব কাছে অধিকতব শ্রদ্ধেয় ।

সিভিল সার্ভিস পবীক্ষাব একটি ঘটনা তেমন পবিচিত নয়। পবীক্ষায় মুদ্রিত নির্দেশগুলিতে ভাবতীয়দেব প্রতি অপমানকব কিছু মন্তব্যেব তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। যেমন একটি নির্দেশে 'ভাবতে অশ্বেব পবিচর্যা' প্রসঙ্গে লেখা ছিল যে, 'ভাবতীয় সহিস তাব অশ্ব যা খায় সেই একই খাদ্য খেযে থাকে।' আব এক স্থানে লেখা ছিল, 'ভাবতীয ব্যবসাযীবা যে অসাধু তা একবকম প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে।' এক বড কর্তাব কাছে গিযে এইবকম সব আপত্তিকব মন্তব্যেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে তিনি প্রথমে বেগে অগ্নিশর্মা হযে সুভাষকে বলেন, "দেখ, মিঃ বোস, যদি তুমি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকাব না কবো, তাহলে আশঙ্কা হয় তোমাকে বিদায় নিতে হবে।" চোখ বাঙানোতে কাজ না হওযায তাঁব সুব নবম হয়। তিনি এই বিষযে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ কববেন বলে কথা দেন। দিন পনেবো পবে তিনি সুভাষকে ডেকে পাঠিয়ে জানান যে পববর্তী মুদ্রণেব সময এইসব আপত্তিকব মন্তব্য বাদ দিযে দেওযা হবে। যাঁব কাছে সুভাষ প্রতিবাদ জানাতে গিযেছিলেন, যাঁব সঙ্গে তাঁব বাদানুবাদ হয়েছিল তিনি হলেন মিঃ রবার্টস। এই ববার্টসই সুভাষকে তাঁব পদত্যাগপত্র প্রত্যাহাব কবতে বিশেষ অনুবোধ কবেছিলেন।

১২

১৯২১ সালেব জুন মাসে সুভাষচন্দ্র ইংলন্ড ত্যাগ কবে ১৬ জুলাই জাহাজ থেকে বোম্বাই-এ নামলেন। এদিনই বিকেলে তিনি গান্ধীজিব সঙ্গে দেখা কবেন। তাঁব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনেব ও তাঁব কর্মসূচী সম্পর্কে গান্ধীজিব নিজেব কাছ থেকে শুনে একটা স্পষ্ট ধাবণা কবা। গান্ধীজিব নীতি, আদর্শ, কর্মসূচী ও পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা থাকলেও সুভাষের মনে যে বেশ কিছু প্রশ্ন এবং সংশয় ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অসহযোগ আন্দোলন প্রায় এক বছব পূর্বে শুরু হয়ে গেলেও (১ আগস্ট, ১৯২০) তখনও পর্যন্ত প্রত্যাশামত সাড়া জাগাতে পাবেনি। বিশেষ কবে বাংলাদেশে গান্ধীজিব কর্মসূচী তেমন ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি কবেনি, যদিও সাবা দেশজুড়ে এক নতুন আন্দোলনেব জোয়াব শুরু হযেছিল। রাজনৈতিক পবিস্থিতি যে অনিশ্চিত তা শবৎচন্দ্র চিঠিতে সুভাষকে জানিয়েছিলেন। সতর্কভাবে বিবেচনা করে তবেই সুভাষেব আই সি এস থেকে পদত্যাগ কবে বাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া ঠিক হবে এই ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। শবৎচন্দ্র নিজে তখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বেশ দূবে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ পবামর্শ শোনেননি। কেন তিনি আন্দোলনেব বর্তমান অবস্থা জেনেও নিজেব সিদ্ধান্তে অবিচল থাকছেন তাও তিনি জানিয়েছিলেন। পূর্বেই তা উল্লেখ কবা হয়েছে। গান্ধীজিকে তিনি গভীব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁব নেতৃত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁব আকর্ষণ ছিল। তাঁর মা'ব গান্ধীজিব আদর্শের প্রতি আস্থা আছে জেনে তিনি খুব আশ্বস্ত ও উৎসাহিত বোধ কবেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি, তাঁব সামগ্রিক কর্মসূচী ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার গভীর কৌতূহল ছিল সুভাষচন্দ্রেব। লক্ষণীয় হল, সুভাষচন্দ্র দেশে ফিবে 'স্বদেশ সেবার যজ্ঞে' নিজেকে কীভাবে নিয়োগ করতে পারেন তা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন

চিত্তরঞ্জন দাশকে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)। কংগ্রেসের বিষয়ে নানা প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ওই চিঠিতে। কিন্তু কিছুটা বিস্ময়কর হল যে, ওই দীর্ঘ চিঠিতে কোথাও গান্ধীজির নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। অথচ ১৯২১ সালের পূর্বেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'গান্ধী যুগে'র সূচনা হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৯ সালের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনই 'গান্ধী কংগ্রেস' বলে চিহ্নিত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আরও বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা গান্ধীজির মত ও পথের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য হতে পারেননি। সুভাষচন্দ্রের মনেও যে কংগ্রেসের সংগঠন, কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট বোধ হচ্ছিল তাও সুস্পষ্ট ছিল দেশবন্ধুকে লেখা চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন যে, কংগ্রেস যদিও এখন "existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত" তবুও "এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে কোনও সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই।"

সুভাষচন্দ্র অধীর হয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজির কাছ থেকে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর পেতে। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি খোলাখুলি তাঁর মূল প্রশ্নগুলি করেন। গান্ধীজির বক্তব্যে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অখুশি অতৃপ্ত মন নিয়ে তিনি ফিরে যান। গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের পববর্তীকালের সম্পর্ককে 'রোদ ও মেঘের খেলা' বলে গর্ডন বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কেও আলো-ছায়া থাকলেও শেষ পর্যন্ত ওই সম্পর্ক ছায়াচ্ছন্নই হয়ে পড়েছিল। কেন, কী পরিস্থিতি ও কোন প্রশ্নে গান্ধী-সুভাষ ও নেহরু-সুভাষ সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তা পরে পরিস্ফুট হবে।

গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি সুভাষচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত কবেছিল। বিদেশ থেকে ফিরেই সরাসরি সাহেবি পোশাক পরে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা কবতে গিয়ে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। লজ্জিত হয়ে নিজের পোশাকের জন্যে ক্ষমা চাইলে গান্ধীজির প্রাণখোলা হাসি সুভাষচন্দ্রকে সহজ করে তোলে। নানান প্রশ্ন তিনি গান্ধীজিকে করেন। গান্ধীজিও ধৈর্য ধরে সব প্রশ্ন শোনেন ও উত্তর দেন। তিনটি প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম : অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপ কী করে শেষ ধাপ অর্থাৎ কর-বন্ধে পরিণত হবে? দ্বিতীয় : শুধুমাত্র কর-বন্ধ বা আইন অমান্য করলেই কি ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে? তৃতীয় : গান্ধীজি বলেছেন, এক বছরের মধ্যেই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে। এরকম প্রতিশ্রুতি তিনি কীভাবে দিতে পারেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অন্য দু'টি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি যে ঠিক কী বলতে চাইছিলেন তা বোঝাই যায়নি। মনে হয়েছিল ওই বিষয়ে গান্ধীজির কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। খুব হতাশ ও নিরুৎসাহ হয়ে সুভাষ কলকাতায় আসেন। গান্ধীজি তাঁকে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য সুভাষচন্দ্র বহু পূর্বেই মনস্থির করেছিলেন যে তাঁর প্রথম কাজ হবে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করা। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশমত নিজের কর্মপন্থা স্থির করা।

সুভাষচন্দ্রের কেমব্রিজ থেকে লেখা চিঠি পেয়ে চিত্তরঞ্জন খুবই খুশি হয়েছিলেন। চিঠির উত্তরে তিনি সুভাষকে জানিয়েছিলেন যে বর্তমানে একনিষ্ঠ কর্মীর একান্ত

অভাব। স্বদেশে ফিরে সুভাষ নিজের মনোমত অনেক কাজ পাবেন। প্রথম যখন সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জের বাড়িতে যান তখন তিনি ছিলেন না। তাঁকে গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনেব স্ত্রী বাসন্তী দেবী অভ্যর্থনা জানান। প্রথম পরিচয়েই বাসন্তী দেবী ও সুভাষের মধ্যে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। পরবর্তী জীবনে এই সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রের মা বাসন্তী দেবীকে বলতেন, "আপনিই মা, আমি তো ধাত্রী।" শুনে বাসন্তী দেবী অভিভূত হয়ে বলতেন, "এমন মা না হলে এমন ছেলে কি আর হয়।" সুভাষচন্দ্রের সব কাজের, সব ঝড়ঝাপটার মধ্যে বাসন্তী দেবী ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। প্রকৃতই সুভাষ তাঁর ও প্রভাবতীব দুই মায়েবই সন্তান ছিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে ক'দিন পরে সুভাষের দেখা হয়। তাঁব আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এ সুভাষ চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর 'ওটেন ঘটনা'র পব দেখা হয়েছিল তার কোনও উল্লেখ করেননি। চিঠিপত্রেও নয়। কিন্তু তাঁব 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' (The Indian Struggle) গ্রন্থে সুভাষ লিখেছেন যে এ সময় তিনি বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী রূপে খ্যাত চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে উপদেশ নেবার জন্যে একবাব গিয়েছিলেন। এটা বিস্ময়কর। চিত্তরঞ্জনেব সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া, তাঁর পরামর্শেব কথা সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে বা অন্য কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না, এটা সম্ভব হল কেমন কবে? বিশেষ করে যে দেশবন্ধু ছিলেন তাঁর জীবনের 'ধ্রুবতারা'র মতো? হয়তো জানকীনাথ বসু পুত্রের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের পরামর্শ চেয়েছিলেন। সেই সময় সুভাষ পিতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সরাসবি তেমন কোনও কথা হয়নি।

প্রথম দর্শনেই সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ, অভিভূত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জনের সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত, তরুণ সুভাষকে গভীরভাবে নাড়া দিযেছিল। কিন্তু সেই মানুষটিকে কাছ থেকে দেখে, তাঁব সঙ্গে কথা বলে তাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি দেখলেন একজন মানুষকে যিনি যুবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখেব কথা বুঝতে পারেন গভীর মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে। ঠিক এইরকম এক মানুষই সুভাষ খুঁজছিলেন। ওই ঐতিহাসিক প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সুভাষ লিখেছেন, "আমাদের আলোচনা যখন শেষ, আমার মন তৈবি। মনে হল নেতা খুঁজে পেয়েছি। তাঁকেই অনুসরণ করব।" কথায়-কাজে, মনে-প্রাণে সুভাষচন্দ্র বসু তাই করেছিলেন, যতদিন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরও।

দেশবন্ধুকে সুভাষচন্দ্র তাঁর দু'টি চিঠিতেই জানিয়েছিলেন যে, তিনি 'জাতীয় কলেজে' অধ্যাপনা, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনায় সহায়তা বা সাংবাদিকতার কাজ, জাতীয় কংগ্রেসের নীতি, কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশের কাজ ইত্যাদি করতে আগ্রহী আছেন। শরৎচন্দ্রকেও তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। ১৯২১ সালের ২ মার্চের চিঠিতে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে লিখেছিলেন, "শিক্ষকতা এবং Journalism বোধহয় আমার মনের মতো কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করতে পারি, তারপর সুবিধামত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরি ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা। সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।" সুভাষচন্দ্রের মতো একজন অসাধারণ মেধাবী, স্বদেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী, যে কোনও ত্যাগ-কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত তরুণের কাছ থেকে এইরকম প্রস্তাব

দেশবন্ধুর কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছিল। দেশ, জাতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এইরকম একজন সহযোগীর প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের ওপর একাধিক গুরুদায়িত্ব দিলেন। সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রচার বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বভার পেলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বহু অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করছিলেন। বহু কৃতী, উজ্জ্বল জীবনের সম্ভাবনাময় ছাত্র, তরুণ শিক্ষক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সব ভাল ছেলেরা কলেজ ছেড়ে দিয়েছে শুনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নাকি বলেছিলেন, "ভাল ছেলে বলেই ছেড়ে দিয়েছে।" ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে দেশবন্ধু বলেছিলেন যে, তারাই হচ্ছে দেশের আশা-ভরসা। তিনি যেসব ছেলেরা কলেজ ছেড়েছে তাদের জন্যে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' (Calcutta National College) প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সেগুলির পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্যে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন (Board of National Education) স্থাপিত হয়। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবস ম্যানসন'-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন এবং আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কবি, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত তরুণ সুভাষচন্দ্র কীভাবে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষের কঠিন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ করেছেন সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কিরণশঙ্কর রায় ব্যারিস্টার হয়ে ইংলন্ড থেকে দেশে ফেরেন। তিনি সর্ববিদ্যায়তনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। বিদ্যাপীঠে সুভাষচন্দ্র ইংরাজি, ভূগোল ও দর্শন পড়াতেন। কিরণশঙ্কর পড়াতেন ইতিহাস ও ইংরাজি কবিতা। হেমন্তকুমার সরকার ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পড়াতেন বাংলা। একদিন সন্ধ্যাবেলা সারা দিনের কাজের পর সাবিত্রীপ্রসন্ন ও কিরণশঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নামার পর দেখলেন সুভাষচন্দ্র সঙ্গে নেই। কিরণশঙ্করবাবু সাবিত্রীপ্রসন্নকে বললেন, "আরে এ ভদ্রলোকের আবার কী হল ? যান তো একবার দেখে আসুন।" সাবিত্রীপ্রসন্ন গিয়ে দেখেন অধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র সকলের 'ডেস্ক' গুছিয়ে রাখছেন। টুকরো ছেঁড়া সব কাগজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এক কোণে জমা করছেন। সাবিত্রীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঝাড়ুদার আসে তো ?" ভিতরে ও বাইরের কোনও অপরিচ্ছন্নতা সুভাষচন্দ্র পছন্দ করতেন না। যখন যেখানেই তিনি কাজ করুন না কেন সব কিছু সুবিন্যস্ত রাখার ওপর নজর দিতেন। দিনের কাজের শেষে পরের দিনের জরুরি কাজের তালিকা করে টেবিলের ওপর রেখে যেতেন।

দেশবন্ধুর সকল প্রচেষ্টা, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আদর্শনিষ্ঠ সহকর্মীদের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা সফল হয়নি। ক্রমে ক্রমে নেতৃস্থানীয় শিক্ষকরা প্রায় সকলেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।

স্বভাবতই এর ফলে পড়াশোনা ব্যাহত হয়। তাছাড়া সরকারি অনুমোদনহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পর ভবিষ্যতে কর্মজীবনের সমস্যা ও সঙ্কটের কথা চিন্তা করে অভিভাবকদের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে অনীহা দেখা দেয়। ইতিপূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ ও প্রবর্তন হয়েছিল তাও দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সফল হয়নি।

দেশজুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। প্রথমে গান্ধীজির 'অসহযোগ' নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতপার্থক্য হলেও শেষপর্যন্ত তিনি গান্ধীজিকেই সমর্থন করেন। বিপ্লবীরাও গান্ধীজির মত ও পথের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে দেশবন্ধুর এক বিশেষ ভাবমূর্তি ছিল। বিপ্লবী সংগঠনগুলি তাঁকে শ্রদ্ধা করত, যদিও দেশবন্ধু অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। বিপ্লবীদের কাজকর্ম তিনি সমর্থন করতেন না। কিন্তু তাঁদের গভীর স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা স্পৃহা ও আত্মত্যাগেব প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। মূলত দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় বিপ্লবীবা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে কংগ্রেসেব আন্দোলনের বিরোধিতা না করতে সম্মত হলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসের সক্রিয সদস্য হয়ে আন্দোলনে যোগদানও করেন। এর ফলে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন আরও ব্যাপক এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রও তাঁব অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছাড়াও রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতিব সদস্যরা যখন দেশবন্ধুর অতিথিরূপে ছিলেন তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, মহম্মদ আলি প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। সর্বভারতীয় নেতাদেরও সুভাষচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

১৩

সামগ্রিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও ক্রমেই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছিল। গান্ধীজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। ফলে প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছিল। ঠিক এই সময় ঘোষণা করা হল, ব্রিটেনের যুবরাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ভারত ভ্রমণ করবেন। ১৭ নভেম্বর (১৯২১) তিনি বোম্বাই-এ পৌঁছবেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই ঘোষণা এক সুবর্ণসুযোগ এনে দিল আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে জনসাধারণকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করার। স্থির হল, যুবরাজের ভারতে পদার্পণের দিনটিতে সারা দেশে হরতাল পালন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় হরতাল ও বিক্ষোভ বেশি সফল হল কলকাতায়। এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, কিন্তু অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে 'বয়কট' ও বিক্ষোভ সফল করার মূলে ছিলেন তিনি। তাঁর কর্মক্ষমতা দেখে সকলে বিস্মিত হল। ওই সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার সময়ে তাঁকে দেখলেই লোকজন ঘিরে দাঁড়াত। প্রত্যক্ষদর্শী সাবিত্রীপ্রসন্ন অবাক হয়ে দেখেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের নানান শ্রেণীর মানুষ তাঁকে চিনে এগিয়ে এসে কথাবার্তা বলত। বোঝাই যেত কী অমানুষিক

পরিশ্রম করে তিনি জনসংযোগ ও সংগঠন গড়ে তুলেছেন। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র ক্লান্তি কাকে বলে জানতেন না। 'বুল ডগ'-এর মতো জিদ বা ধরে থাকার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কোনও কাজ একবার ধরলে তা শেষ না কবে তিনি ছাড়তেন না। অন্য কারওর শৈথিল্যও বরদাস্ত করতেন না। বাঙালিব সহজাত 'আলসেমি' তাঁব স্বভাব ও চরিত্রে ছিল না। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম কোনও কিছুই তিনি চাইতেন না যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।

কলকাতা তথা বাংলার যুব সমাজের কাছে তিনি কত শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তা সুস্পষ্ট হয এ সময় থেকে।

কলকাতায় বিক্ষোভ এত সফল হয়েছিল যে পরের দিন 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' কাগজ লিখল, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা শহর দখল করে ফেলেছে। দেখে মনে হবে সরকাব ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক এসব কাগজে দাবি কবা হল এখনি যেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিচলিত, উদ্বিগ্ন বাংলাব সবকার ইস্তাহার প্রচার করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনি বলে ঘোষণা কবল। পরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ আদেশ ঘোষিত হল।

সরকাবি নিষেধাজ্ঞা ও দমননীতি জনসাধারণকে আরও ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তোলে। এবপর সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ পদে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তিনি ওই পদ ছেড়ে 'মালকোচা দিয়ে' নেমে পড়লেন স্বেচ্ছাসেবকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে। কিন্তু সরকারি আদেশ অমান্য করে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দিতে খুব বেশি সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সকলের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে দেশবন্ধু স্থির করলেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন স্বেচ্ছাসেবকরূপে পথে নামবেন। এই প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের সায় ছিল না। তিনি বলেন যে, একজন পুরুষও থাকা পর্যন্ত কোনও মহিলাকে কারাবরণ করতে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু দেশবন্ধু তাঁব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। বিক্ষোভ দেখানোর জন্যে বাসন্তী দেবীও গ্রেপ্তার হলেন। এই সংবাদ রটে যাওয়ার পরে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। দলে দলে মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে এগিয়ে আসেন। এই ঘটনাটির চিত্তস্পর্শী স্মৃতিচারণ করে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন, "উনি (দেশবন্ধু) হুকুম করলেন আমাকে পিকেটিং করতে বার হতে হবে। সুভাষের প্রচণ্ড আপত্তি। বাড়ির মেয়েরা কেন যাবে আমরা থাকতে, আমি যাব। উনি বললেন সে হয় না। তোমার যে বাইরে অনেক কাজ, তুমি জেলে গেলে এসময় চলবে না।" এরপর বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করার দিনই গভীর রাত্রে তাঁকে ছেড়ে দেবার পর তিনি বাড়ি ফিরে এলে, সুভাষচন্দ্র এসে হাজির। ছাড়ার খবর তিনি পাননি। বাসন্তী দেবীকে দেখে শুরু হল তাঁর কান্না। বাসন্তী দেবী যত বোঝান, "কি বিপদ। ও সুভাষ কাঁদছ কেন? এই তো আমি এসে গেছি। আমার তো কিছু হয়নি। তত সে আরও বেশি কাঁদে। এরকম ছেলেমানুষী কেউ দেখেছে কখনো?" জেলে না যেতে দেবার জন্যে কান্না, বাসন্তী দেবী কারাবরণ করায় কান্না, পরে কলকাতা কর্পোরেশনের 'চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার' হতে বলায় কান্না। এর জন্যে দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে বলতেন 'Crying Captain'। একান্ত সুহৃদ দিলীপকুমার রায়ও দেখেছিলেন সুভাষের মনটা কত কোমল। তিনি লিখেছেন, "যে

করুণা মাতৃত্বে ফোটে সেই করুণা, সেই দরদ দিয়ে বিধাতা ওর মনকে গড়েছিল।”

দেশবন্ধু না চাইলেও সুভাষচন্দ্রকে জেলে যেতে হয়েছিল কয়েকদিন পরেই। অসহযোগ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা ও ব্যাপ্তি সরকারের পক্ষে আর বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। ১০ ডিসেম্বর দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন। উভয়েরই ছ' মাসের কারাদণ্ড হল। সুভাষের কারাববণের সংবাদে পিতা জানকীনাথ শবৎচন্দ্রকে লিখলেন, “সুভাষ ও তোমাদের সবার জন্যে আমি গর্বিত। আমি এতটুকু দুঃখিত নই, কেননা আমি আত্মত্যাগের নীতিতে বিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিনই আমি এর প্রত্যাশা করেছিলাম। তোমার মা'ও খুব সাহসের সঙ্গে এটা মেনে নিয়েছেন এবং তিনিও বিশ্বাস করেন যে এইরকম আত্মত্যাগ শেষপর্যন্ত স্ববাজ প্রতিষ্ঠিত করবে। স্নেহের সুভাষকে আমাদের অন্তরের আশীর্বাদ জানিও।” সুভাষের স্বদেশপ্রেম, আদর্শনিষ্ঠা, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বসু পরিবারের সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হয়ে পডেছিল। শবৎচন্দ্রও ক্রমেই জাতীয় আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

আলিপুব জেলে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে যে ক'মাস ছিলেন সেই সময়টি সুভাষচন্দ্রেব জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পরে যখন তিনি বর্মাব মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন তখন বিভিন্ন চিঠিতে তিনি ওই কারাজীবনেব ও দেশবন্ধুর যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন তা এক অমূল্য সম্পদ। এক আত্মত্যাগী সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আর তারুণ্যেব প্রতীক, নির্ভীক, আদর্শনিষ্ঠ, দেশবন্ধুর পবম স্নেহের ও আস্থাভাজন সুভাষচন্দ্র বসু—এই দুই পরিচিত নামের পিছনে যে দু'জন 'মানুষ' ছিলেন তাব অন্তরঙ্গ দুর্লভ চিত্র ফুটে উঠেছিল ওই চিঠিগুলিতে। চিঠিগুলি না পড়লে দেশবন্ধু ও 'নেতাজি সুভাষ' দু'জনই বহুলাংশে অজানা থেকে যাবেন।

১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যখন মৃত্যু হয় তখন সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে ওই সংবাদ পড়ে প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতেই চাননি। কিন্তু যখন জানলেন যে মর্মান্তিক সংবাদটি ভুল নয়, তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে হতচেতন, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। দিলীপকুমার রায়কে তিনি লেখেন, “আমি তাঁর অত্যন্ত কাছ থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিত আভাস দিতে পাবব আশা করি।” সুভাষচন্দ্র 'অসতর্ক মুহূর্তে' দেখার ওপর যে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তার তাৎপর্য অসীম। আর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জন্মেছিল। জেলে দু'জনে পাশাপাশি 'সেলে' ছিলেন। এ সময় দেশবন্ধুকে দেখাশোনা করা ছাড়া তিনি তাঁর একবেলার রান্নার কাজও করেছিলেন। এই নিয়ে তাঁর একটা গর্ব ছিল। প্রায়ই এই কথাটি শোনাতেন। দেশবন্ধুর কাছে থাকা, তাঁকে নিকট থেকে দেখা ও বোঝার যে সুযোগ সুভাব পেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয়। জেলে যাওয়ার আগে তিনি মাত্র কয়েকমাস দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক নেতা ও গুরু রূপে দেখেছিলেন। 'খাঁটি মানুব' দেশবন্ধুকে জানা ও চেনার তেমন সুযোগ তখনও হয়নি। ইংরাজিতে একটি কথা আছে—'Familiarity

breeds contempt', বেশি ঘনিষ্ঠতা হলে অশ্রদ্ধা জন্মায়। এই কথাটির উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, দেশবন্ধু ও তাঁর ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটেছিল। কারাগারের ক্ষুদ্র পরিবেশে দেশবন্ধুকে দিনের পর দিন দেখে, খুব কাছাকাছি এসে চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধুর কোমল হৃদয়, অসীম মমতা, ভাল-মন্দ শত্রু-মিত্র সবকিছু নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার ক্ষমতার কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন।

জেলেতে মাথুর নামে এক দাগী আসামী একই 'Yard'-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে এর আগে আটবার জেলে গিয়েছিল। কিন্তু সেও দেশবন্ধুর অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায়; আর অপরাধ না করে। কয়েদিটি রাজি হয়েছিল। সেইমত জীবন কাটিয়েছিল। ঘটনাটির উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—এ কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। দেশবন্ধু বিশ্বাস করতেন মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই তাকে ভালবাসা উচিত।" সুভাষ দেশবন্ধুর চরিত্রের এই মানবিকতা দেখে কেবলমাত্র মুগ্ধ ও অভিভূত হননি, নিজের জীবনেও তা গ্রহণ ও পালন করেছিলেন। রাষ্ট্রনেতা সুভাষচন্দ্র, 'নেতাজি' তাঁর ঐতিহাসিক অবদান ছাড়াও শুধু চারিত্রিক গুণ ও মানবিকতার জন্যেই এক মহান পুরুষ রূপে শ্রদ্ধেয় হতেন। দেশবন্ধু সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলি শুধুমাত্র শোকাহত মনের সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ছিল না। দেশবন্ধুর আদর্শ ও দৃষ্টান্তে তাঁর নিজের জীবনও আলোকিত হয়েছিল। যে দাগী আসামী মাথুরকে দেশবন্ধু স্নেহ করতেন, তাঁর কাছে আশ্রয় দেবেন বলেছিলেন, তার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে মান্দালয় জেল থেকে লেখেন যে, দেশবন্ধুর জামাতা সুধীরচন্দ্র রায় যদি মাথুরকে কাজ না দিতে পারেন তাহলে যতদিন তিনি (সুভাষ) না ফিরছেন ততদিন শরৎচন্দ্র যেন তার একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। মাথুরকে আশ্রয় দিলে দেশবন্ধুর বিগত আত্মার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। ওই চিঠিতেই তিনি অনুরোধ করেছেন যে, একটি ছাত্রকে তিনি সাহায্য করতেন। এখন সে বিপদে পড়েছে। পড়াশোনা, থাকার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র যেন তাকে আগের মতোই সাহায্য করে যান। তিনি নিজেও অন্য কয়েকজন বন্ধুকে ওই বিষয়ে লিখছেন। এরকম অনেক ছাত্রকেই সুভাষ সাহায্য করতেন। দেশবন্ধুকে সুভাষচন্দ্র শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক গুরু ও নেতা রূপে গ্রহণ করেননি, দেশবন্ধুর জীবনের ধ্যান-ধারণা সব কিছুই তিনি আদর্শ বলে মনে করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেস ও কংগ্রেস রাজনীতির 'ডিক্টেটর' বলে অনেকে মনে করতেন। দেশবন্ধুকেও বাংলার রাজনীতি ও 'স্বরাজ' পার্টিতে তাই মনে করতেন অনেকে। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ এখনও তা ভাবেন। সম্প্রতি একটি লেখায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, 'নেতাজি' যুদ্ধের পর ফিরে এলে দেশের 'ডিক্টেটর' হতেন। এই অনুমান ভিত্তিহীন। দেশবন্ধু তাঁর অনুগামীদের সম্পূর্ণ আনুগত্য পেয়েছিলেন। তাঁর কথাই শেষ কথা ছিল এটা ঠিকই, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'ডিক্টেটর'-এর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ছিল না। সুভাষচন্দ্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, "অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁব সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হত। কিন্তু আমি জানতুম যে যত ঝগড়া কবি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট। যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে।" এই শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্যই ছিল দেশবন্ধুব 'ডিক্টেটব' হওয়ার মূলে। প্রায় দু'দশক পরে এইরকম আনুগত্য পেয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ নিজেও। অবশ্য দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের গভীরতা ও মাধুর্য এক দুর্লভ অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

১৯২২ সালে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যরা যখন মুক্তি পেলেন তার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পবিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯২১ সালেব ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস ব্যক্তিগত এবং গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত আন্দোলন কার্যকর করার পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজির ওপর অর্পণ করা হয়। এই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব কবার কথা ছিল দেশবন্ধুর। তাঁর অনুপস্থিতিতে গান্ধীজি দেশবন্ধুর লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন। অল্পকাল পরে গান্ধীজি ঘোষণা কবেন, পশ্চিম ভারতের সুবাট জেলাব অন্তর্গত বারদৌলিতে তিনি গণআইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। এই ঘোষণা সারা দেশে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি কবে। কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়াব পূর্বেই উত্তর প্রদেশের গোবখপুব জেলার অন্তর্গত চৌরিচৌরার পুলিশ-ফাঁড়ির ওপব এক হিংসাত্মক জনতার আক্রমণে বাইশজন পুলিশ নিহত হয় (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২)। এই ঘটনায় গভীর মর্মাহত হয়ে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। অনতিকাল পর গান্ধীজি গ্রেপ্তার হন। তাঁর দু'বছরের কারাদণ্ড হয়। গান্ধীজির গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের সংবাদ প্রত্যাশিত বিক্ষোভ বা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ইতিমধ্যে তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। তুরস্ক কামাল পাশার নেতৃত্বে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় খিলাফত আন্দোলনও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৪

গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতানৈক্য, ক্রমে তা প্রকাশ্য বিরোধ ও সংঘাতে পরিণত হয়ে সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন, তিন বছরের জন্যে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের' অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিক কমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্বন্ধে এক প্রচলিত ধারণা হল যে, ওই ঘটনা প্রবাহের সূচনা হয়েছিল তিরিশের দশকের শেষের দিকে। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা নয়। গান্ধীজির প্রতি ক্ষোভ, তাঁর কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় সুভাষচন্দ্রের মনে দেখা দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সময় থেকেই। তারপর থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনে গান্ধীজির মত, পথ, নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ও অনাস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গান্ধীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে খুব আশাব্যঞ্জক হয়নি। গান্ধীজির পরিকল্পনার মধ্যে তিনি স্পষ্টতার 'শোচনীয় অভাব' লক্ষ্য করেছিলেন।

কেমন করে ধাপে ধাপে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করবে সে বিষয়ে গান্ধীজির নিজেরই কোনও স্পষ্ট ধাবণা আছে বলে সুভাষের মনে হয়নি। তিনি খুবই নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়েছিলেন গান্ধীজির কথাবার্তায়। যিনি ইতিমধ্যেই কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনেব সর্বময় নেতা রূপে স্বীকৃত, তাঁর সম্বন্ধে প্রথমেই এরকম মনে হওয়া উভয়েব সম্পর্কেব পক্ষে শুভ ইঙ্গিত ছিল না। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোনও কিছুই বা কাউকেই বিচার-বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করতেন না। নিজেব পিতা, মাতা, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মেজদাদা শরৎচন্দ্রকেও নয়। তাঁর মানসিকতাই ছিল বিদ্রোহীব। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল দেশবন্ধুর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁব কথারও প্রতিবাদ কবতে সুভাষ ছাড়তেন না। দেশবন্ধুর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তর্ক বিতর্কের পর নিজেব সিদ্ধান্তে অন্যদের সম্মত করানোতে। অন্যদিকে গান্ধীজিও নিজের মত ও বিশ্বাসে অটল থাকতেন। আলাপ-আলোচনা করলেও তিনি সহকর্মী ও অনুগামীদেব পূর্ণ আনুগত্য প্রত্যাশা করতেন। অন্যথা হলে বেশ অপ্রসন্ন হতেন। এইবকম দুই চবিত্র ও মানসিকতার ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা বেশ দুরূহ ছিল। গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের যে একটা বন্ধন গড়ে ওঠেনি তা নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত মৌলিক নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীকে কেন্দ্র কবে যে মতপার্থক্য উভয়েব মধ্যে দেখা দেয় তা ওই বন্ধনকে শিথিল করে তোলে।

চৌবিচৌবাব ঘটনার পব গান্ধীজি হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখায় দেশের সর্বত্র এক গভীর হতাশা নেমে আসে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠে ব্রিটিশ সরকারকে সত্যিই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ঠিক সেই সময় এই সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্রের কাছে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' বলে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল গান্ধীজি দেশব্যাপী আন্দেলানকে 'গলা টিপে হত্যা' করেছেন। মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে কংগ্রেসের হাজার হাজার কর্মী গান্ধীজির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। সুভাষচন্দ্র তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে কারাগারে। গান্ধীজির সিদ্ধান্তের কথা জেনে দেশবন্ধু রাগে ও দুঃখে আত্মহারা হয়ে যান। সেই সময় অনেকেই সন্দেহ কবেছিলেন যে, গান্ধীজি গোপন সূত্রে কিছু তথ্য পেয়ে নিজেও আঁচ কবেছিলেন যে বারদৌলিতে কর-বন্ধ আন্দোলন সফল হবে না। আর, সে ক্ষেত্রে তাঁব পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তাই চৌরিচৌরার ঘটনাটিকে আন্দোলন প্রত্যাহারের অজুহাত রূপে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের লেখা পড়ে মনে হয় তিনি নিজেও এরকম সন্দেহ করেছিলেন। একমাত্র 'মহাত্মার গোঁড়া ভক্তের দল' ছাড়া সকলেই মহাত্মার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। কথাটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। গান্ধীজি যে কংগ্রেসের 'একচ্ছত্র অধিনায়ক' হয়ে উঠেছিলেন তা সুভাষচন্দ্র পছন্দ করেননি। প্রথম থেকেই তাঁর আপসমূলক নীতি তিনি সমর্থন করতে পারেননি। জাতিভেদ, জমিদার-কৃষক সম্পর্ক, পুঁজিবাদ-শ্রমিক স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের নীতি প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ছিল কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁদের দিকে।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী, নীতি ও শেষপর্যন্ত গান্ধীজির প্রতিশ্রুতি—'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে, কতটা ও কীভাবে সফল হবে এই সন্দেহ

সুভাষচন্দ্রের প্রথম থেকেই ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও গান্ধীজির নীতি ও কর্মসূচী পছন্দ হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত গান্ধীজি কৌশলে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনতে সক্ষম হন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর এক বোঝাপড়া সম্ভব হয়। তাঁর বিপুল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার দ্বারা দেশবন্ধু কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদেরও নিরস্ত করতে সফল হন। এরপর অসহযোগ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। জনসমর্থন ও উদ্দীপনা বাড়তে থাকে।

সুভাষচন্দ্র তখন পর্যন্ত কংগ্রেসে কোনও পরিচিত বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন। নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর কোনও ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের মতো কিছু সহকর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, জনসংযোগ, সংগঠনের ক্ষমতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সর্বত্র অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি করে। যে দু'টি প্রশ্নে গান্ধীজি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার একটি সম্পর্কে অন্য অনেকের মতো সুভাষচন্দ্রেরও সংশয় ছিল। ওই প্রশ্নটি ছিল, তুরস্কের সম্রাট (যিনি একাধারে ছিলেন 'সুলতান ও খলিফা') তাঁকে স্বস্থানে ও স্বমর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল (খিলাফৎ আন্দোলন) তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ওই বিষয়টিকে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য রূপে ঘোষণা করা। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় কিছুটা স্ববিরোধ ছিল। তাঁর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' (The Indian Struggle 1920-1942) গ্রন্থে এটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে জাতীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে খিলাফৎ প্রশ্নকে যুক্ত করার মধ্যে 'কোনও প্রকৃত ভুল নিহিত ছিল না'। আসল ভুল হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি সংগঠন রূপে দেশব্যাপী খিলাফৎ কমিটি গঠন করতে দেওয়া। যদি তা না করতে দিয়ে খিলাফৎপন্থী মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলা হত, তাহলে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও খলিফা পদের অবলুপ্তির ফলে যখন খিলাফৎ প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ল, তখন কংগ্রেস তাদের দলভুক্ত করে নিতে পারত। খিলাফৎপন্থী মুসলমানদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্রিটিশ-ঘেঁষা মুসলমান দলে যোগ দিতেন না। অন্যত্র সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফৎ প্রশ্নকে স্থান দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল।" একই সঙ্গে তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন যে খিলাফৎপন্থী মুসলমানরা একটি পৃথক দল গঠন না করে কংগ্রেসে যোগদান করলে এরকম 'অবাঞ্ছিত পরিণাম' হত না। খিলাফৎপন্থী মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতেন।

সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ ও অভিমত ছিল অতি সরলীকরণের এক দৃষ্টান্ত। বাস্তবে খিলাফৎপন্থীদের অধিকাংশই ধর্মীয় আবেগের দ্বারা তাড়িত ও পরিচালিত ছিলেন। ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবি তাঁদের কাছে গৌণ ছিল। ব্যতিক্রম মানুষ যে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল কম। জাতীয় কংগ্রেস বহু পূর্ব থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবির সঙ্গে তুরস্কের সম্রাটকে 'সুলতান' ও 'খলিফা' রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে নীতিগত মিল কমই ছিল। গান্ধীজি ও খিলাফৎ নেতারা যে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের (political expediency) লক্ষ্য। জাতীয় কংগ্রেস যদি সত্যিই সিদ্ধান্ত নিতেন যে, খিলাফৎপন্থীরা

পৃথক কোনও দল গঠন করতে পারবেন না, তাঁদের সকলকে কংগ্রেসে যোগদান করতে হবে, তাহলে খিলাফৎপন্থীরা সম্মত হতেন কিনা সন্দেহ আছে। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বা প্রয়োজনমত রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করাটা তেমন ভাল বুঝতেন না। তিনি বড় হয়েছিলেন এক উদার পরিবেশে। কোনওরকম সাম্প্রদায়িক বিতর্ক, বিবোধ বা বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা ও জাতপাতের ক্ষুদ্রতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি এইসব প্রশ্নে এমন এক মানসলোকে বাস করতেন, এমন দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি দেখতেন, সহজ সমাধানের কথা ভাবতেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও সব সময়ে বাস্তবনিষ্ঠ ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ও জাতিবর্ণ এবং সামাজিক বৈষম্যতার বিষ ইতিমধ্যেই প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। কঠোর আদর্শবাদী সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাস্তববুদ্ধির অভাব মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করা যেত। তাঁর জীবনের এই দিকটি পরে আরও সুস্পষ্ট হয়।

গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে সমস্ত রাজকীয় খেতাব ও সম্মানজনক পদ বর্জন, স্থানীয় সংস্থাগুলি থেকে সরকার মনোনীত সদস্যপদ ত্যাগ, সরকারি অনুষ্ঠান পরিহার, সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পুত্র-কন্যাদের নাম প্রত্যাহাব, জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, আইন-আদালত, আইনসভা ইত্যাদি বর্জন অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ক্রয়, হাতে সুতা কাটা ও বুনন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মাদকতা বর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। 'চরকা' ও 'খাদি' নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রতীকের মর্যাদালাভ করে। 'খাদি' ও 'চরকা'কে গান্ধীজি যতটা ও যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজনীয বলে মনে করেছিলেন সে বিষয়ে বহু লোকের, বিশেষ করে বাংলার বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী ও চরমপন্থীদের মনে গভীর সংশয় ছিল। গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা ও তাঁর কর্মসূচীকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন করলেও রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল যে, আরও গঠনমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের পক্ষে ছিলেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল এর ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। চরকা ও খাদির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ—এর মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবে, অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা আসেব তা তিনি মনে করতেন না। ইংলন্ড থেকে একই জাহাজে স্বদেশে ফেরার সময় এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তিনি কবির সঙ্গে একমত ছিলেন। দেশে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির গভীর পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গান্ধীজির কর্মসূচী ও নীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের অনেকটা পরিবর্তন ঘটে।

'খাদি' ও 'চরকা'র ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয় তাকে কিন্তু সুভাষচন্দ্র স্বাগত জানিয়েছিলেন। চরকার ব্যবহার পূর্বেও ছিল। তার পুনরায় প্রচলন প্রচেষ্টাকে তিনি 'অভিনব ও দুঃসাহসিক' বলে মনে করেছিলেন। গান্ধীজির প্রচেষ্টায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারা দেশের সুদূরতম গ্রামগুলিতেও সুতো-কাটতে শিক্ষা দেবার জন্যে হাজার-হাজার নারী পুরুষকে পাঠানো হয়। অল্প দিনের মধ্যেই 'খাদি' বা 'খদ্দর' ভারতের সব কংগ্রেস কর্মীর পোশাক হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র নিজে এই উদ্যোগে

উৎসাহ বোধ করেছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে বোম্বাইয়ে দেখা করে কলকাতায় ফিরে তিনি খদ্দর পরতে শুরু করেন। কলকাতায় তথা বাংলাদেশে কিন্তু চরকা ও খাদি সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতার ভাব ছিল। চরকা কেটে আর খাদি পরে দেশ থেকে ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে বুদ্ধিজীবী বাঙালিদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। এই নিয়ে প্রায়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিতর্ক হত। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন। খদ্দরের ধুতি জলে ভেজাবার পর তোলা যায় না বলে খদ্দর পরার অসুবিধার কথা তিনি রসিয়ে বলতেন। সুভাষচন্দ্র তখন সবে খদ্দর পরা শুরু করেছেন। একদিন শরৎচন্দ্র সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে খদ্দবের পাঞ্জাবি কিন্তু মিলের ধুতি পরা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাবিত্রী, খদ্দর পরনি ? পরো, ওর Educative Value আছে।" সুভাষচন্দ্র তখন উপস্থিত ছিলেন। কিছু পরে সাবিত্রীপ্রসন্ন ও সুভাষচন্দ্র বেরলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে সুভাষচন্দ্র সাবিত্রীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খদ্দর কিনতে যাবেন না ?" সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন যে, খদ্দর কিনতে হবে, পবতেও হবে। কিন্তু 'Congressman' হওয়ার জন্যেই যদি চরকা কাটার পরীক্ষা দিতে হয় তাহলেই মুশকিল ! চরকা কাটার সার্থকতা তিনি মানেন। এটা 'পরাধীনতার স্মারক'—একটা 'Symbol' বলে যদি ধরা হয়। তারপর তিনি সুভাষচন্দ্রকে বললেন, "আপনি দেখেছেন খদ্দরকে 'মিটিংকা কাপড়া' বলে কাগজে ঠাট্টা করেছে ?" সুভাষ চুপ করে রইলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন বুঝলেন কথাবার্তায় সুভাষ খুব খুশি হননি। তাঁর মনোগত ভাবটা বুঝে সাবিত্রীপ্রসন্ন ওয়েলিংটন স্ট্রিটের (এখন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রিট) নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির নীচের ঘরের খদ্দরের দোকান থেকে খদ্দরের ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবি কিনলেন। কিছু খুচরো টাকা কম পড়তে সুভাষ তা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিলেন। ওই ধার শোধ করার কোনও সুযোগ সাবিত্রীপ্রসন্নকে সুভাষচন্দ্র আর দেননি। ফেরার পথে আবার খদ্দর প্রসঙ্গে সাবিত্রপ্রসন্ন বলেন, "শুনেছি শরৎবাবু চরকা কাটেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।' কথাটা এড়িয়ে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, " 'কিন্তু সুতাকাটা কংগ্রেস' বলে যারা ব্যঙ্গ করে—তারাও হয় ভুল বোঝে, নয়তো 'নেতি নেতি' ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে জড়ত্বকে আশ্রয় করে।"

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বহু একনিষ্ঠ কর্মী ও শত শত উৎসাহী ছাত্রদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে চরকা ও খাদি সম্বন্ধে যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে পরিমাণ খাদির উৎপাদন হয়েছিল তা গান্ধীজিকে হতাশ করেছিল। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "যদি বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক না মেলে, তাহলে বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়ে আরও উপযুক্ত নারী ও পুরুষের জন্যে স্থান করে দেওয়া উচিত।" তিনি অবশ্য আশা প্রকাশ করেন যে একবার সম্পূর্ণ জাগলে বাংলা আর পিছিয়ে থাকবে না। গান্ধীজির এই ক্ষুব্ধ মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সরকার-ঘেঁষা ও গান্ধী-দেশবন্ধু বিরোধী 'স্টেটসম্যান' লেখে, "বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা 'চরকা' প্রত্যাখান করেছে বলেই গান্ধীজির এত রাগ ! গান্ধীজির এখনও বুঝতে বাকি আছে যে বাঙালি এই বিষয়ে পিছিয়ে আছে, কেননা বাংলা সম্পূর্ণ

সজাগ।" 'স্টেটসম্যানে'র সমালোচনার পিছনে প্রকৃত কারণ ছিল গান্ধীজি ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বীতরাগ। বাঙালিদের প্রতি কোনও প্রকৃত অনুরাগ নয়। কিন্তু গান্ধীজিও যে বাংলার স্বদেশপ্রেমিক অসংখ্য মানুষের মন ও চিন্তাধারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৫

গান্ধীজির নীতি, কর্মসূচী ও চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের যাই সংশয় থাকুক না কেন, কলকাতায় ফিরে ওই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর আন্তরিকতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোনও সীমা ছিল না। গান্ধীজির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন আলোড়ন, জনজাগরণ সৃষ্টি করায় তাঁর সাফল্য, ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র মাধুর্যের প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর আকর্ষণ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। কংগ্রেস সংগঠনে, ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রধান কৃতিত্ব যে গান্ধীজির, তা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। গান্ধীজিই সর্বপ্রথম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশকে একটি সুসংহত রাজনৈতিক সংগঠন দিয়েছিলেন, বক্তৃতা-সর্বস্ব একটি দল থেকে কংগ্রেসকে জাতীয় ভিত্তি দিয়েছিলেন তা সুভাষচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ও লেখায় উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজির নেতৃত্বের ফলেই "আধুনিক রাজনৈতিক দলের সব বৈশিষ্ট্য ভারতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে" বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু একই সঙ্গে গান্ধীজির দুর্বলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধেও প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্র সচেতন ছিলেন। প্রয়োজনে তা প্রকাশ করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। যে দলে একজন মানুষই হিমালয় প্রমাণ ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী, তিনি 'হিমালয় প্রমাণ' ভুল করলে ক্ষতিও যে তেমনি বিরাট হবে তা ছিল অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীজি ও তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ও অনাস্থা ক্রমেই বেড়েছিল। গান্ধীজিরও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একই মনোভাব দেখা দিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে।

'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' (The Indian Struggle) বইটি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রামাণ্য দলিল। বইটির প্রথম অংশ (১৯২০-১৯৩৪) সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালে ইউরোপে লিখেছিলেন। দ্বিতীয় অংশ (১৯৩৫-১৯৪২) তিনি বার্লিনে লিখেছিলেন ১৯৪২ সালে। বইটির প্রথম অংশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে, লন্ডন থেকে। ইংলন্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হলেও ভারত সরকার বইটি ভারতে প্রবেশ করতে দেয়নি। ওই নিষেধাজ্ঞার কারণ, সরকারের মতে বইটিতে সন্ত্রাসবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন আছে। ইংলন্ডের কাগজে যেসব সমালোচনা বেরিয়েছিল তার মধ্যে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' ও 'ডেইলি হেরাল্ড'-এর দু'টি মন্তব্য বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' লেখে যে, সুভাষচন্দ্রের বিরোধীরা তাঁর গুরুত্ব কম করে দেখেন এই যুক্তিতে যে, আত্মম্ভরিতা ও অসহিষ্ণুতা তাঁর কর্মদক্ষতায় বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আলোচ্য বইটি তাঁর সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করে। একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ হয়েও লেখক অন্যসব দল ও ব্যক্তির প্রতি যতটা সুবিচার করেছেন তার

বেশি আশা করা যায় না। বইটিতে কঠোরতম সমালোচনা রয়েছে গান্ধীজির। কিন্তু গান্ধীজির "অনুগামীরাও স্বীকার করবেন যে সমালোচনায় যুক্তি আছে এবং হীন মনোভাবের লেশমাত্র নেই।" 'ডেইলি হেরাল্ড' লেখে যে, শান্ত, যুক্তিপূর্ণ, ধীর চিত্তে লেখক বইটি লিখেছেন। তাঁর নিজের মতামত দৃঢ় হলেও সেগুলি লিখতে গিয়ে তিনি অন্যের প্রতি অবিচার করেননি। লেখক মোটেই গোঁড়া নন। বয়স চল্লিশের কম হলেও সুভাষচন্দ্র "যে কোনও দেশের রাজনৈতিক গর্ব ও অলঙ্কার হতে পারেন।"

প্রকৃতপক্ষে, তাঁর গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নীরব নিজের প্রসঙ্গে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আন্দোলনে ও গঠনমূলক কাজে তাঁর নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি প্রায় উল্লেখই করেননি। এই নীরবতা বিশেষ করে প্রকট তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিক সম্বন্ধে। অথচ, এই সময়েই সুভাষচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনে, ভারতীয় যুবকদের কাছে যৌবনের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। সেই ভাবমূর্তি আজও অম্লান আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। নিজের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নীরবতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক হবে। ১৯২১ সালের ১ আগস্ট তিলকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে দেশব্যাপী বিদেশী বস্ত্রের যে বিরাট বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছিল, দলে দলে ছাত্র বিদেশী বর্জন, চরকা ও তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজে নেমেছিল, ব্রিটিশ যুবরাজের ভারতে আগমন ও তাঁর 'সংবর্ধনা বয়কট' কলকাতায় যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে সফল হয়েছিল তার কৃতিত্বের মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম সুভাষচন্দ্র। এই সাফল্যের জন্যে পরোক্ষভাবেও তিনি কোনও দাবি করেননি।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হঠাৎ ভয়াবহ বন্যা হয়। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস ত্রাণ কার্যের জন্যে আবেদন করে। বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম যে দলটি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পৌঁছয় তাতে 'আমিও ছিলাম', এইটুকু মাত্র সুভাষ বলেছেন। তারপর তিনি ত্রাণ সমিতির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও জনসাধারণের বদান্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসের এই ত্রাণ কার্যের যে সাফল্য, কংগ্রেসের সম্মান বৃদ্ধি, এমনকি বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনের পর কংগ্রেসের ত্রাণ কার্যের প্রশংসা—সবকিছুর জন্যেই তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন কংগ্রেস সদস্যদের। কিন্তু এই বিরাট সেবামূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কংগ্রেস সদস্য ও অন্য সকলকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করার পিছনে তাঁর যে অমানুষিক পরিশ্রম ও ক্লেশ ছিল সে বিষয়ে একটি কথাও লেখেননি। আর্তত্রাণ সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র সান্তাহারে বিরাট তাঁবুতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সব কিছু তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি কাজ তিনি নিজে দেখতেন। স্বেচ্ছাকর্মী, বন্যাক্লিষ্ট হাজার হাজার মানুষ, অসুস্থ মানুষ, আসতেন অবিরাম। দু'মাস সুভাষচন্দ্র শুয়েছিলেন তাঁবুতে, ছোট্ট একটি তক্তপোশে, দুটো মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে। রাত্রে তাঁর টেবিলের আলো আদৌ নিবত কিনা বা কখন আলো আবার জ্বেলে টেবিলে রাখা হত কেউ জানত না। ভোরে অন্য সব স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতেন, সকলের সঙ্গে একই জলখাবার খেতেন—আদার কুচি, ভিজে ছোলা, চিঁড়ে ভাজা। দুপুরের খাবার খেতেন সবার শেষে। তার আগে স্টেশনের পাশে ছোট ডোবায় দুটো ডুব দিয়ে আসতেন। 'মেনু'—ভাত, ডাল, তরকারি। রাতেও তাই। শুধু ভাতের বদলে

রুটি। সুভাষচন্দ্রের অনুগত সহকর্মী গোপাললাল সান্যাল তাঁর 'যে কথার শেষ নেই' স্মৃতিচারণমূলক বইটিতে সেবাব্রতী সুভাষের এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র ধরে রেখেছেন। গোপাললাল সান্যালকে তিনি তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের স্বত্বদান করেছিলেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন গোপাললাল সান্যাল। ভাইফোঁটার দিন সকাল বেলা বগুড়ার হরিপুরের জমিদার বাড়ি থেকে বাঁকে বাঁকে এল দই, ক্ষীর, নানান রকমের মিষ্টি, খই, মুড়কি, মোয়া, কলা ইত্যাদি। জমিদার বাড়ির মেয়েরা ভাইফোঁটা উপলক্ষে ওইসব পাঠিয়েছেন সুভাষচন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে। সবাই বোনেদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। শুধু সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তিনি বললেন, "আমরা এখানে ভোজ খেতে আসিনি।"

আর্তত্রাণের অর্থ নিয়ে কেনাবেচার নৈতিক ও আইনগত সমস্যার কথা চিন্তা করে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' নামে একটি পল্লী উন্নয়নমূলক উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গান্ধীজির আর্থিক পুনর্গঠন, গ্রামীণ স্বনির্ভরতা ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে এই রকমের উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সেই আদর্শের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠান গড়ায় উৎসাহী হয়েছিলেন। মূলত তাঁরই কর্মক্ষমতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'খাদি প্রতিষ্ঠান' গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ও অনুরাগীদের এক দুঃখ ও অভিযোগ ছিল যে, ১৯২৩ সালে 'স্বরাজ্য' দল গঠনের পর থেকেই 'খাদি প্রতিষ্ঠান' গান্ধীবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অঙ্গরূপে পরিচিত হয়। পরে গান্ধী-সুভাষ বিরোধের সময় এই সংস্থা সুভাষ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণ কার্যে সুভাষচন্দ্র 'সেবাধর্ম-জনকল্যাণ' এবং 'স্বদেশ প্রেম-স্বদেশ কল্যাণ'-এর সমন্বিত রূপ দেখেছিলেন। নিজের কৈশোর ও ছাত্র জীবনের স্বপ্ন তাঁর কাছে সার্থক হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক দুর্গাপূজায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে জানকীনাথ পুত্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দেশের বাড়ির পুজোয় যাবার জন্যে বলেন। সুভাষ পিতাকে বলেন, "না বাবা। আপনারা সবাই গৃহে মা দুর্গার পূজার জন্যে যান। আমি আমার প্রকৃত মা দুর্গাকে অসহায় মানুষদের মধ্যে পূজা করতে যাব।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে একাধিক গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করার পূর্বে ও মুক্তি পাওয়ার পরে। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে তাঁর ভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র ইংলন্ড থেকে দেশবন্ধুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তিনি সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র-পত্রিকায় সম্পাদনে সহযোগিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের কার্যসূচী ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছার কথা দেশবন্ধুর মনে ছিল। বিচক্ষণ নেতা অল্প দিনেই বুঝেছিলেন এই কাজে সুভাষচন্দ্রের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতা কতখানি। তাই ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার। এইগুলির মধ্যে ছিল 'বাঙ্গলার কথা' (১৯২১), 'আত্মশক্তি' (১৯২২) ও 'ফরওয়ার্ড' (১৯২৩)। দেশবন্ধু জেলের মধ্যে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনায় প্রায়ই বলতেন ইংরাজি ও মাতৃভাষায় দৈনিক কাগজ প্রকাশের প্রয়োজন কতখানি। 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশের সিদ্ধান্ত স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা (১৯২৩), তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনেব ব্যর্থতা এবং গান্ধীজির কারাদণ্ড কংগ্রেস নেতাদের জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তিত করে তোলে। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন নেতা অসহযোগের বিকল্প কর্মসূচীর কথা চিন্তা করেন। তাঁরা স্থির করেন, আইনসভাগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত এবং নির্বাচিত হবার পর ভিতর থেকে 'সুসংবদ্ধ', নিয়মিত এবং নিরন্তর বাধা সৃষ্টি করে আইনসভা তথা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বানচালের চেষ্টা করার কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু অন্য অনেক কংগ্রেস নেতা এই পরিবর্তিত নীতির প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। তাঁরা গান্ধীজির নীতি ও পথ অপরিবর্তিত রাখার সমর্থক ছিলেন। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁরা পরিবর্তনের পক্ষে তাঁরা 'Pro-changers' নামে, আর, যাঁরা পরিবর্তনের বিপক্ষে তাঁরা 'No-changers' নামে পরিচিত হন। ১৯২২ সালে গয়া শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'পরিবর্তন বিরোধী' অর্থাৎ গান্ধীজির সমর্থকদের জয় হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য দল' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্বরাজ্য দল কংগ্রেসেরই একটি শাখা রূপে কাজ করতে থাকে।

গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যরা গিয়েছিলেন। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বাস্তব অবস্থা বিচার করে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। স্বরাজ্য দলের প্রস্তাবিত কার্যসূচীর জরুরি প্রয়োজন গান্ধীজি ও তাঁর সমর্থকরা উপলব্ধি করবেন। তা না হওয়ায় চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে অনুভব করেন যে, তাঁদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করা জরুরি প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধানের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'ফরওয়ার্ড'-এ নানান বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হত। লেখার মান ছিল উন্নত। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, গোপন সরকারি সংবাদ আবিষ্কার করে সুকৌশলে তা ফাঁস করা।

'ফরওয়ার্ড'-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে ছিল সুভাষচন্দ্রের দক্ষতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা। যখন কাগজটি প্রথম প্রকাশ হয় তখন, দেশবন্ধু তথা স্বরাজ্য দলের পক্ষে পরিবেশ খুবই প্রতিকূল। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর 'পরাজয়' তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়। স্বপক্ষে কিছু লেখা তো দূরের কথা, বেশির ভাগ কাগজেই বিরূপ মন্তব্য ও ভুল সংবাদে ভরা। সেই দুর্দিনের কথা স্মরণ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, ' লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই ; অতি ছোট যাহারা তাহারও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা।" সুভাষচন্দ্রও লিখেছেন, "যখন অর্থের প্রয়োজন, তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে এক সময় লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম।" 'ফরওয়ার্ড' কাগজ পরিচালনায়, কাগজটিকে সর্বাংশে একটি আধুনিক উচ্চমানের জনপ্রিয় ইংরাজি দৈনিকে পরিণত করার কাজে সুভাষচন্দ্র, উপেন্দ্রনারায়ণ

নিয়োগী, হেমচন্দ্র নাগ, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখের সহযোগিতা পান। সংবাদ সংগ্রহ, সরবরাহ, রিপোর্ট ও লেখার মান লক্ষ্য করা ছাড়াও সংবাদ সাজানো, ভাল ছাপা, ভাল কালি, ভাল টাইপ ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি সুভাষচন্দ্র নিজে লক্ষ্য রাখতেন। 'ফরওয়ার্ড' ও অন্য কাগজগুলির চাহিদা কেমন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তিনি প্রায়ই কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে, চৌরঙ্গির ট্রাম ডিপোতে কাগজের হকারদের স্টলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় শুধু 'ফরওয়ার্ড'ই নয়, 'আত্মশক্তির' মতো অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত পত্রিকার সাফল্য সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমরা আগেও লিখতাম, এখনও লিখছি ; কিন্তু তখন সপ্তাহে এক হাজারও বিক্রি হত না, অথচ এখন এরা দশ হাজার ছেপেও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হকারেরা আরো দাও আরো দাও করছে। কাগজের জন্যে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্যে সুভাষচন্দ্র নিজে লোকের কাছে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অফিসে যেতেন।" খ্যাতনামা সাংবাদিক, সুভাষের সহপাঠী বন্ধু পূর্ণচন্দ্র সেন লিখেছেন যে, "ফরওয়ার্ডের প্রথম অবস্থার ইতিহাসই সুভাষচন্দ্র বসুর ইতিহাস।" সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় কাগজগুলি জনসাধারণের মনে গভীব প্রভাব ফেলতে শুরু করে। সরকারি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ উদ্বিগ্ন হযে ওঠে।

১৬

প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুমুখী কাজে জড়িত হওয়া ছাড়াও সুভাষচন্দ্র ১৯২২-২৩ সালে নানাবিধ তাৎপর্যপূর্ণ সুদূরপ্রসারী ঘটনায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা নেন। তিনি জাতীয় জীবনের বৃহত্তর সার্বিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তিত হন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এসব বিষয়ে গঠনমূলক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন। অন্যটি কলকাতায় ইয়ং মেনস কনফারেন্স। লাহোরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দেশবন্ধু ঘোষণা করেন যে, 'স্বরাজ' কোনও শ্রেণী বিশেষের জন্যে নয়। সাধারণ মানুষের জন্যেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দেশবন্ধুর বিশেষ আগ্রহ ও সমর্থন ছিল। সুভাষচন্দ্রও স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় এই সময় থেকে ভাষণ দিতে শুরু করেন। হাওড়ার টাউন হলে এক সভায় তিনি বলেন যে, দিন মজুরদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারলে দেশের কল্যাণ সম্ভব নয়।

কলকাতার যুব সম্মেলন বাংলা তথা সারা দেশে যুব আন্দোলনের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। এই যুব সভায় ঘোষণা করা যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক সংগঠন ও আন্দোলন যুব সমাজের করা একান্ত প্রয়োজন। যুব সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র। মূল সভাপতি নির্বাচিত হন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। সুভাষচন্দ্রের ভাষণটি ছিল স্মরণীয়। জনসভায় এত সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উদ্দীপ্ত ভাষণ তাঁর জীবনে এটাই ছিল প্রথম। বাংলার তরুণদের মনে এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা ইতিপূর্বে কোনও বক্তৃতা সৃষ্টি করতে

পারেনি। শুধুমাত্র 'দৈনিক বসুমতী'তে পরের দিন ভাষণটি ছাপা হয়। 'তরুণের আহ্বান' নামে এটি পরে সুভাষ-রচনাবলীতে সঙ্কলিত হয়। তিনি বাংলার যুবশক্তির উদ্দেশে বলেন, "সর্বস্পৃহাশূন্য পুণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা, নরনারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মুহ্যমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে। তর্কযুদ্ধ করে জাতির লজ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের অপমানকে আর বৃদ্ধি না করে দেশ ও জাতির দাসত্ব কালিমার রেখা মুছে ফেলতে হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহঙ্কারের জন্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বের আত্মম্ভরী জ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনায় ব্রতী হও। আচার-অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি, 'ছুৎমার্গ', 'অস্পৃশ্যতার ভূত'কে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্প্রীতি ও ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর হও।" গভীর আবেগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি ভাই, প্রেম চাই, অনুকম্পা চাই—সবার উপরে মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের মুক্তি—নান্যঃ পন্থা।" সে দিন উপস্থিত যুবকরা সুভাষচন্দ্রের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্রের নতুন পাঠ শুনে ওই স্বপ্ন সার্থক করে তোলার শপথ গ্রহণ করেছিল।

গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় স্বরাজ্যপন্থীরা খুবই হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। বাংলাতেও কংগ্রেসের মধ্যে 'নো-চেঞ্জার'দের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা খুবই বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। বাংলার রাজনীতিতে দলাদলি, স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই, স্বরাজ্যপন্থীদের সম্পর্কে মিথ্যাপ্রচার প্রকট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পরিবেশ হতাশাব্যঞ্জক ও কলুষিত হবার লক্ষণ দেখা দিলেও দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের মনোবল কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এক জনসভায় সুভাষচন্দ্র দলের বর্তমান অবস্থা ও দেশবন্ধুর সমর্থকদের কর্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক কর্মসূচী গ্রহণের সময় এসেছে। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন করে, গঠনমূলক কাজ করে, আমলাতন্ত্রের প্রতিটি ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে।

১৯২৩ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বছরটিকে 'স্বরাজ বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন। সুশৃঙ্খল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মীদের উৎসাহ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে স্বরাজ্যপন্থীদের শক্তি ও জনসমর্থন বাড়তে থাকে। দেশবন্ধু নিজের স্বাস্থ্যহানি ও দারুণ কষ্ট উপেক্ষা করে দক্ষিণ ভারতের গান্ধীবাদের ঘাঁটিগুলিতে প্রচার করতে যান। তাঁর ওই দীর্ঘ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ফলপ্রসূ হয়। এর প্রভাব দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা দেয়। বাংলাদেশেও 'পরিবর্তন বিরোধীরা' পরাজিত হন। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধিতে গান্ধীজির সমর্থকরা উপলব্ধি করলেন যে, কংগ্রেসের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের (স্বরাজ্য দল গঠিত হলেও কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল) মধ্যে মিটমাট হওয়া প্রয়োজন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয় যে, আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আইনসভার ভিতরে অবিচ্ছিন্নভাবে সরকারের বিরোধিতা চালিয়ে যাবার অনুমতি কংগ্রেস সদস্যদের দেওয়া হবে। গয়া কংগ্রেসে পরাজিত হবার দু'বছরের মধ্যে স্বরাজ্যপন্থীদের জয় হল। গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে এই

জয়লাভে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন। 'গোঁড়া গান্ধীবাদী'দের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কতটা অপ্রসন্ন ছিল তা তিনি গোপন রাখেননি। কিন্তু গোঁড়া গান্ধীবাদীরা যা কিছু করতেন তার পিছনে স্বয়ং গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থন সব সময়ই থাকত। গান্ধীজির অনুমোদন নেই বা তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এমন কোনও কিছু বলা বা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং গান্ধীভক্তদের সম্বন্ধে সুভাষের সমালোচনা ও তির্যক মন্তব্যের প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজি। তাঁর সঙ্গে সুভাষের মানসিক দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছিল।

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। পরের বছর অনুষ্ঠিত হল ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ পৌরসভা—কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেব নির্বাচন। স্বরাজ্য দলের কাছে এই নির্বাচনে জয়লাভ করা ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জেব মতো। দলের স্থিতি ও ভবিষ্যতের পক্ষে ওই নির্বাচনে জয়লাভ করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাই সর্বশক্তি দিয়ে স্বরাজ্যপন্থীরা নির্বাচন যুদ্ধে নামেন ও জয়লাভ করেন। এর পিছনে যাঁদের বিরাট ভূমিকা ছিল তাঁদের শীর্ষে অবশ্যই ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর তরুণ সেনাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। পৃথক মনোনয়নের ভিত্তিতে এই নির্বাচন হয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দু ভোটদাতারা কেবল হিন্দু, আর মুসলমান ভোটদাতারা কেবল মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিতে পেরেছিলেন। স্বরাজ্য দলের জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে দেশবন্ধু তথা স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তার এটিও একটি লক্ষণ।

নির্বাচনের পর কলকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ডেপুটি মেয়র হন শহীদ সুরাবর্দী। দেশবন্ধুর একান্ত অনুরোধে (যা প্রায় আদেশের নামান্তর ছিল) সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (Chief Executive Officer) পদ গ্রহণে সম্মত হন। পৌরসভার নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে পরিচালন ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ছিলেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। সমগ্রভাবে কর্পোরেশনের প্রধান ছিলেন মেয়র। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে কোনও ব্যক্তির নিয়োগ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্রের নিয়োগে সরকার মোটেই খুশি হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকার অনুমোদন করে। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর। স্বরাজ্য দলের মধ্যেও একাংশ সুভাষচন্দ্রের নিয়োগে খুশি হননি। সুভাষচন্দ্রের অনস্বীকার্য যোগ্যতা ও দক্ষতা ছাড়াও, তিনি যে মাত্র অল্পদিন আগে উচ্চশিক্ষিত, উচ্চাভিলাষী ভারতীয় যুবকদের 'স্বপ্নের' চাকরি আই সি এস থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে এসে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন—ঈর্ষা, ব্যক্তিস্বার্থ ও দলাদলির ফলে এই সবই তাঁরা বিস্মৃত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ'কে প্রথম নির্বাচিত মেয়র, সুভাষচন্দ্র বসুকে কার্য পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তারূপে যে পৌরসভা পেয়েছিল সেখানেও কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গোষ্ঠীতন্ত্রের লড়াই সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই ধারা অব্যাহত থেকে ক্রমেই আরও বিস্তৃত ও পঙ্কিল হয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্র নিজে ওই পদ নিতে একেবারেই সম্মত ছিলেন না। চিত্তরঞ্জন যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন তখন তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের বেতনভুক উচ্চপদস্থ কর্মচারী হবার জন্যে তিনি আই সি এস থেকে পদত্যাগ করেননি—এ কথা বলার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর

মনে হয়েছিল বৃহত্তর স্বার্থে সুভাষচন্দ্রই ওই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর ওই পদ গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁর মতো আস্থাভাজন সুদক্ষ সহযোগী ছাড়া চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মেয়রের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। শেষপর্যন্ত দেশবন্ধুর ইচ্ছা ও আদেশ উপেক্ষা করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওই পদের বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেড় হাজার টাকার বেশি না নেবার সিদ্ধান্ত করেন। ওই টাকাও তাঁব ব্যয় হত দুঃস্থ, দরিদ্র ছাত্র, কর্মীদের সাহায্য করতে এবং সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে।

কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মজীবন সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কলকাতার মেয়র ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশের মানুষের কাছে ছিল অতি সম্মানজনক উচ্চপদ। কলকাতা কর্পোরেশন তখন ভারতে বৃহত্তম স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক আয় দু'কোটি টাকারও বেশি। সমসাময়িক অনেক প্রাদেশিক সরকারের আয়ের চেয়ে কম নয়। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, যখনই যে কাজ ধরতেন বা যে কাজের ভার নিতেন তা সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে করতেন। কোথাও এতটুকু ফাঁকি বা শৈথিল্য থাকত না। তা বরদাস্তও করতেন না। কর্পোরেশনে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার সময় তাঁর সারা দিন-রাতের কাজ ও চিন্তা ছিল কর্পোবেশনের সুষ্ঠু পরিচালনা। নাগরিক জীবনের সার্বিক উন্নতি, সুখ-সুবিধা, অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কলকাতা বলতে শুধু যে সাহেব-পাড়া চৌরঙ্গী বা পার্ক স্ট্রিট নয় তা তিনি প্রথম থেকেই সকলকে বোঝাতে শুরু করেন। সকল সুযোগ-সুবিধা সব পাড়ার মানুষ যেন পায় প্রথম থেকেই সে দিকে তিনি নজর দেন। সকাল সাতটায় কাজে বেরতেন। সঙ্গে থাকতেন কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্তারা। রাজনৈতিক চমক দেখাতে নয়, হাতে-কলমে, নিজের চোখে সবকিছু জানতে ও দেখতে। একদিন শরৎচন্দ্র বসু সুভাষের ঘরে ঢুকে দেখেন একজোড়া বিরাট আকারের গামবুট। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আবার কী ? এ দিয়ে কী হবে ?" সুভাষ বললেন, তিনি পরবেন। ঠনঠনে কালীতলায় যাচ্ছেন। ড্রেনে নামতে হবে। কেন ওখানে অত জল জমে জানতে, প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে। এরকম অভিযান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কোথাও জল জমে, কোথাও রাস্তার অবস্থা জরাজীর্ণ, কোথাও পরিশ্রুত জলের অভাব—সবকিছুই নিজে দেখার চেষ্টা করতেন। প্রতিকারের যথা সম্ভব ব্যবস্থা নিতেন। প্রভাতে শহর পরিদর্শনের পর অফিসে যেতেন সকাল দশটায়। বেশির ভাগ দিনই বাড়ি ফিরে খাবার সময় পেতেন না। আর, খাওয়া হয়ে উঠত না। শুধু মাঝে মাঝে চা পান। বাড়ি ফিরতে রাত ন'টা দশটা হয়ে যেত। বাড়িতেও তখন লোকের ভিড়। প্রায় সবাই প্রার্থী, কিছু না কিছু চাই! সকলের সঙ্গে কথা বলা শেষ হতে প্রায় মাঝ রাত। এরপর শুরু হত নিজের পড়াশোনা। কর্পোরেশনের নতুন আইন সংক্রান্ত সব কিছু খুঁটিয়ে পড়া। শরীরের ওপর এত ধকলের জন্যে সুভাষচন্দ্রকে মাশুল দিতে হয়েছিল পরে। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য, ভবিষ্যতের ভাল-মন্দর চিন্তা করার কোনও অবসর সুভাষচন্দ্র জীবনে পাননি।

সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে কার্যত ছিলেন মাত্র ছ'মাস। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন দক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে কতখানি নাগরিক চেতনা আনা, নাগরিক কল্যাণ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা সম্ভব। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলকাতা ভারতের অন্যান্য শহরের কাছে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল। মেয়র দেশবন্ধু ও পরিচালন ব্যবস্থার প্রধান সুভাষ অভূতপূর্ব নতুন নির্দেশ ও পরিকল্পনা চালু করেছিলেন। নব-নির্বাচিত স্বরাজ্য কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান ও মেয়র স্বয়ং সকলেই ঘরে প্রস্তুত খদ্দরের পোশাক পরে আসতেন। কর্মচারীদের সরকারি পোশাকও হল খদ্দর। শহরের বহু রাস্তা ও পার্কের নামকরণ হল শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানদের নামে। এই প্রথম একটি শিক্ষা-বিভাগ খোলা হল। এই বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হলেন কেমব্রিজের স্নাতক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সারা শহরে কর্পোরেশনের পরিচালনায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। জনস্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমাজসেবী নাগরিকদের নিয়ে স্বাস্থ্য-সমিতি গড়া হল। দরিদ্র মানুষদের জন্যে পৌরসভা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলল। পৌরসভার সব জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে স্বদেশী পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই নির্দেশ ইউরোপীয় বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠীকে খুবই ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত করে তোলে। এতদিন কর্পোরেশনে যেসব সাহেব আমলা কর্তৃত্ব করছিল তারা খুবই অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে দুধ সরবরাহ ইত্যাদি। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এর আগে পর্যন্ত ভাইসরয়, গভর্নর এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদেরই নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হত। এখন সেই রীতি রদ করে দেশবরেণ্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার নীতি গৃহীত হল। নতুন নীতি অনুসারে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তিদের সংবর্ধিত করা হয়েছিল। 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর প্রকাশ ও কলকাতা কর্পোরেশন কমার্সিয়াল মিউজিয়ম-এর প্রতিষ্ঠাও এই সময় হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় যে চমকপ্রদ কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল, তার ফলে স্বরাজ্য দলের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা স্বভাবতই খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদেশী আমলা ও সরকারি মহল এতে খুবই বিচলিত বোধ করতে শুরু করে। পৌরশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও তার সাফল্যের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক ছিল। কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ক্ষমতাকে স্বরাজ্য দল যে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির একটি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন তা বুঝতে সরকারের ভুল হয়নি। জনমানসে প্রতিক্রিয়ার পিছনে দেশবন্ধুর ভাবমূর্তি ও সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত কর্মদক্ষতার অবদানই ছিল সর্বাধিক। তাই সরকারি প্রত্যাঘাত প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠছিল। নানান কারণে সরকারি রোষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কলকাতা পৌরসভাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু জটিলতা, দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের সময়

থেকেই শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদের দায়িত্ব চাননি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সোজাসুজি চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন, "আমি কি এই কাজ করার জন্যে আই সি এস ছেড়েছি?" দেশবন্ধু শুধু বলেছিলেন, "তোমাকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ নিয়ে বেশ জল ঘোলা হয়েছিল। আসলে, স্বরাজ্য দল কর্পোরেশনের নির্বাচনে জেতার আগেই ক্ষমতা পেলে কে কোন পদ পাবে সেই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা মন কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের জেলায় কাঁথিতে চৌকিদারি খাজনার বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন করে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনুগত অনেকের আশা ছিল তিনিই ওই পদটি পাবেন। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁরা খুব হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রকাশ্যে, আকারে-ইঙ্গিতে সমালোচনা, তির্যক মন্তব্য থেকে স্বয়ং দেশবন্ধুও অব্যাহতি পাননি। এক আধুনিক ঐতিহাসিক তো লিখেছেন যে, শুধু কলকাতার কায়স্থ গোষ্ঠীকে খুশি করতে পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েও মাহিষ্য বংশীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে দেশবন্ধু কর্পোরেশনের ওই পদে বসাতে পারেননি। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিপ্লবীদের, মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং সর্বোপরি দেশবন্ধুর কেন অত শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল তা উপলব্ধি করলে এরকম ভাবার কোনও অবকাশই থাকত না।

দুঃখের বিষয় হল জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতার ছায়া স্বরাজ্য দলে এবং জাতীয় আন্দোলনেও পড়ছিল তখন থেকেই। তারই সঙ্গে বাড়ছিল দলাদলি। গোষ্ঠী ও ব্যক্তি স্বার্থের লড়াই। পড়লে ও জানলে মন খারাপ হলেও স্বরাজ্য দলের কর্পোরেশনে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনায় বাংলার রাজনীতির যে দুঃখজনক দিকটি ফুটে উঠতে শুরু করে তার একটি সমকালীন বর্ণনা তুলে না ধরলেই নয়। এই চিত্রটি আমাদের একান্ত পরিচিত। কে কোন পদ পাবে, লোভের প্রকাশ, নানান গুজবের ফলে রাজনৈতিক পঙ্কিলতা দেশবন্ধুর জীবনকে দুঃসহ করে তুলতে শুরু করে। গোপাললাল সান্যাল ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছেন, "কোথায় স্বরাজ-সংগ্রাম, আর কোথায় চাকরি নিয়ে কাড়াকাড়ি। মানুষের মনোগজতের এক বিচিত্র ও বিকৃত রূপ দেখে তরুণ দেশসেবকগণ যেমন নেতৃবর্গের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর মনেও নানা সংশয় উপস্থিত হতে থাকলে—এত হৈ চৈ, হাততালি, বক্তৃতা, আন্দোলন, অত্যাচার, স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ—কিন্তু কী লাভ হল, আমরা কতদূর এগোলাম, স্বরাজের পথে?" কী কর্পোরেশন, কী বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য পাকাপাকি করার ব্যবস্থা হয়েছে, বিভিন্ন স্বার্থের এমনই সংঘাত যে জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে স্বরাজ্য দলের আসল লক্ষ্য (ভিতর থেকে নিরন্তর চেষ্টা করে নতুন শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করা) কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের মতো আদর্শনিষ্ঠ নেতারা গভীরভাবে মর্মাহত। দলের নীতি অমান্য করে সরকারি পক্ষে ভোট দিলে "হাতে হাতে ফললাভের আশা প্রবল। কোনও সদস্যের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেও চাকরি পাচ্ছে না। কারো জামাতা বাবাজী সরকারি চাকরিতে আছেন বটে, কিন্তু মফঃস্বলের দূর-দূরান্তের শহরগুলিতেই তার নিয়ত

বদলাবদলি চলছে। কারো বা ওপরওয়ালার অবসর-গ্রহণের কাল আসন্ন—সে স্থলে নিজের পুত্রটিকে কোনোরকম যোগসাজশের সাহায্যে ওই পদে বসানো যায়, ইত্যাদি। নানারূপ স্বার্থক্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারি দলে থাকাই লাভজনক মনে করেন। সমগ্র দেশের স্বরাজ যে কী বস্তু, তা আহরণ করতে একটি ভোটের মূল্যই বা কত, তা উপলব্ধি করবার আগ্রহ অপেক্ষা ছেলে বা জামাতার চাকরি বা পদোন্নতি হাতে হাতে অর্জন করা—কোনটা লোভনীয় ?"

স্বরাজ্য দল এবং কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সুভাষচন্দ্রকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দলীয় অন্তর্বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায়। গান্ধীজির সমর্থনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব পান। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সমর্থকরা এর বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই লড়াই চলে। এমনকি, কিছুদিনের জন্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও গঠিত হয়। ১৯২৭ সালের কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠীর প্রার্থীই নির্বাচন যুদ্ধে নামেন। সুভাষচন্দ্র এই সময় বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও যন্ত্রণা ব্যক্ত করে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন যে, খাঁটি কর্মীর অভাব বড় বেশি। কিন্তু এরই মধ্যে কাজ করে যেতে হবে। যেমন ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না, তেমনি নিজে মানুষ না হলে মানুষ তৈরিও করা যায় না। "রাজনীতির স্রোত ক্রমশ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অন্তত কিছুকালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য ও ত্যাগ—এই দুটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে।" আর একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সংযম ও শৃঙ্খলার অভাবের জন্যে দায়ী কর্মীরা নয়, নেতারা। সবাই 'স্ব স্ব প্রধান' হয়ে পড়েছে। তাই কেউ কোনও নেতাকে মানতে চায় না। Sincerity এবং tenacity-র খুব অভাব কর্মীদের মধ্যে। Congress Politics এখন এত unreal হয়ে পড়েছে যে, কোনও খাঁটি লোক ওই কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই অবস্থা দেখে যারা কিছু কাজ করতে চায় তারা বোধহয় কাউন্সিলের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবে না। "দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কর্মীদের মধ্যে 'ব্যবসায়ী ও পাটোয়ারি বুদ্ধি' জমে উঠেছে। এখন তারা বলছে, আমায় ক্ষমতা দাও—নয়তো আমি কাজ করব না। বাংলার সর্বত্র শুধু ঝগড়া আর দলাদলি। যেখানে কাজকর্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশি।" সুভাষচন্দ্রের এই সময়ের চিঠিপত্র, ভাষণ পড়লে মনে হবে তিনি যেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বাস্তব ছবি তুলে ধরে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। জেল থেকে মুক্তিলাভ করে রাজনৈতিক জগতে ফিরে এসে তিনি নিজেও কিন্তু এই রোগ নির্মূল করতে পারেননি। রাজনৈতিক দলাদলি থেকে দূরে থাকা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। রাজনীতিতে এই সমস্যা চিরকালীন। যত বড় মাপেরই হোন না কেন, সব রাষ্ট্রনেতারই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। ১৯২৭ সালে শিলং থেকে এক গভীর আবেগপূর্ণ আবেদনে তিনি শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভেতরে যে দুঃখজনক বিরোধ, অনৈক্য চলছিল তার

অবসানের জন্যেই নয়, যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদেরও ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ জানান। অনুরূপ আবেদন তিনি বহুবার করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত নানান কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ ঐক্যবদ্ধ ফলপ্রসূ আন্দোলনের অনুকূল ছিল না। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম এলেও অন্তর্বিরোধ, মনান্তর ও গোষ্ঠীতন্ত্রের অবসান হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর থেকেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি মাথা চাড়া দিচ্ছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের শুধু অবনতিই নয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থার মনোভাব প্রকট হয়ে উঠছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের ঐক্য, সংহতি ও ভবিষ্যতের পক্ষে এর পরিণতির চিন্তা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতি, পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতেন। সংখ্যালঘুদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের অভাব, অভিযোগ ও তাদের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায় বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষোভ দূর করতে না পারলে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে আনা সম্ভব হবে না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯২৩ সালে তিনি বাংলার মুসলমান নেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তি 'দি বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত হয়। চুক্তিতে স্থির হয় যে, স্বরাজ্য দল ক্ষমতাসীন হলে সমস্ত সরকারি চাকরির ৬০% মুসলমান প্রার্থীদের দেওয়া হবে। যতদিন না মুসলমানরা দেশের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সরকারি চাকরি পাচ্ছে ততদিন এই নীতি চালু থাকবে। অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নানা সমস্যাও এই চুক্তিতে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষণের প্রশ্নটিই প্রধান ও বিতর্কিত হয়ে ওঠে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু বাংলো কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে এই চুক্তিটি অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৩) চুক্তিটি অনুমোদিত হয়নি। অনেকের কাছে মনে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাবির প্রতি দেশবন্ধু তোষামোদমূলক না হলেও আপসমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। অনেকে তা মনে না করলেও ওই চুক্তি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর, এতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হবে না বলে মনে করেছিলেন। বাংলাদেশে দেশবন্ধুর এমন এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল, তাঁর প্রতি সকলের, এমনকি তাঁর বিরোধীদেরও, এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে সিরাজগঞ্জে ওই চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় চিত্র তা ছিল না। তাঁর একক প্রভাবে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এ সাফল্য সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক প্রভাবশালী হিন্দু জনমত গড়ে উঠেছিল। তাঁরা অভিযোগ করছিলেন, হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাবির যথাযথ প্রতিরোধ করতে পারছে না।

'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পর্কে আপত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল না। শুধুমাত্র চাকরির সংরক্ষণ ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিনের জটিল আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার প্রকৃত স্থায়ী সমাধান যে সম্ভব নয় তা ভারতবর্ষের পরবর্তী কয়েক দশকের ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণিত

হয়েছে। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও ঐক্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তা অতুলনীয়। মনুষটি প্রকৃতই সকল ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্দেহ-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে ছিলেন। জাতীয় ঐক্যের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকতর ঔদার্য দেখাতে হবে, সহনশীল হতে হবে এই নীতি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ নির্মূল করে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র সর্বতোভাবে দেশবন্ধুর অনুগামী ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল বাংলার তরুণদের কাছে। নিখিলবঙ্গ যুব সম্মিলনীর অধিবেশনের ভাষণে তিনি এই কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল পদে বসেই তিনি 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এ গৃহীত নীতি কার্যকর করতে উদ্যোগী হন। ফলে, বেশ কিছু কাউন্সিলার খুবই ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানান যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৩টি পদে ২৫ জন মুসলমান প্রার্থী নিযুক্ত হয়েছেন। আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১০০০-এর বেশি। তাঁদের মধ্যে কিছু বি এ, এম এ পাসও ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে কোনও প্রার্থীকে বিচার করা যায় না। কর্পোরেশনের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও নিয়োগ করা হয়নি। সুভাষচন্দ্র বলেন, তিনি মুসলমানদের যে দাবি ন্যায্য বলে মনে করেন তা মনে রেখেই কাজ করেছেন। ভবিষ্যতেও তাই করবেন। নিজের সিদ্ধান্তের সব দায়িত্ব নিয়ে তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও, প্রার্থীদেব চরিত্র, উৎসাহ, আন্তরিকতা ও সততাও বিচার্য হওয়া উচিত। উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশ্নের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চিন্তার কোনও কারণ নেই। যদি সব পদেই মুসলমান, খ্রিস্টান, অনুন্নত শ্রেণীর প্রার্থীরা নিযুক্ত হন তাহলেও নয়। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের যদি ওই পদের অযোগ্য মনে হয়, তাহলে তিনি তাঁদের বরখাস্ত করতেও ইতস্তত করবেন না। হিন্দুরা অতীতে চাকরির ব্যাপারে প্রায় একচেটিয়া সুযোগ পেয়েছে। এখন এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। কর্পোরেশনকে সেই যুগোপযোগী হতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের ওই বলিষ্ঠ নির্ভীক সিদ্ধান্তকে দেশবন্ধু তো বটেই, গান্ধীজিও স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে তিনি লেখেন (৩১ জুলাই, ১৯২৪), "সুভাষের সিদ্ধান্ত খুবই প্রশংসনীয়, পক্ষপাতশূন্য। হিন্দুরা যদি সত্যিই ভারতকে স্বাধীন দেখতে চায় তাহলে তাদের মুসলমান এবং অন্যান্যদের জন্যে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।" সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু তিনি সমস্যাটির সরলীকরণ করেছিলেন, একাধারে মুসলমানদের আস্থা, স্বরাজ্য দলের প্রতি সমর্থন লাভ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি সংরক্ষণের প্রশ্নটি খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর ছিল। তা ছাড়া, একবার সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থায় নিযুক্ত করে তারপর অযোগ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত করা যে কত কঠিন হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। বিশেষ করে যদি নিযুক্তির পিছনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্নটি বিশেষ বিচার্য হয় তাহলে সেইরকম কোনও প্রার্থীকে বরখাস্তের প্রশ্নে কত গভীর সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা বিশেষ চিন্তার

কারণ ছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার শিকড়টি এত গভীরে ছিল যে তার তাৎক্ষণিক সমাধান সহজলভ্য ছিল না।

১৮

কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে যোগদানের পর সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি একাগ্র মনে সেই কাজ করতেন। ঘোর আপত্তি থাকলেও, কর্পোরেশনের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাই তিনি রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছিলেন। পৌরসভার কাজেই দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। তবুও তাঁর সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগেব গভীর সন্দেহ ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা, কর্পোরেশনে তাঁর নীতি ও কর্মসূচী, সাংগঠনিক ক্ষমতা, ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী মনোভাব ও স্বাধীনতা স্পৃহা শাসকগোষ্ঠী ও পুলিশের কর্মকর্তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিল। এঁদের মধ্যে যাঁর রোষানলে তিনি সবচেয়ে বেশি পড়েছিলেন তিনি হলেন কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। বাংলার বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে টেগার্ট ছিলেন এক নম্বর গণশত্রু। টেগার্টের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গোপন যোগাযোগ আছে। তিনি আসলে নিজেও সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসের সমর্থক। টেগার্টের ওই সন্দেহ বদ্ধমূল হল গোপীনাথ সাহার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

তরুণ বিপ্লবী ছাত্র গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভুলবশত টেগার্টের বদলে আর্নেস্ট ডে নামে অন্য এক ইংরেজ তাঁর গুলিতে প্রাণ হারায়। আদালতে বিচারের সময় গোপীনাথ ভুল করে অন্য একজনকে হত্যা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল টেগার্ট। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে দেশের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হবে। বিচারে গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গ করে গোপীনাথ শহীদ হন। গোপীনাথের আত্মবলিদান জনসাধারণকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। যাঁরা সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, কোনও কারণেই হিংসার পথ সমর্থন করেন না তাঁরাও শহীদ গোপীনাথের সাহস, মনোবল ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে চরম মূল্য দেওয়ার দ্বিধাহীন সঙ্কল্পে মুগ্ধ হন। গোপীনাথ সাহার বিচার ও ফাঁসি সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করে। ফাঁসির দিন সকালে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের অফিসঘরে গিয়ে দেখেন দেওয়ালে টাঙানো একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর গুনগুন করে গাইছেন, "তোমার পতাকা যারে দাও—তারে বহিবারে দাও শকতি"। সাবিত্রীপ্রসন্ন অবাক। ইতিপূর্বে তিনি সুভাষচন্দ্রকে কখনও গান গাইতে শোনেননি। তিনি কখন ঘরে ঢুকেছেন তাও সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেননি। একটু পরে যখন মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তখন তাঁর মূর্তি দেখে সাবিত্রীপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। "সারা মুখে যেন কে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয়—ঠিক তেমনি। দু' চোখের কোণে জল।" অফিসে তখনও লোকজন আসেনি। আবেগ-কম্পিত ভারী কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বললেন, "গোপীনাথ সা'র

ফাঁসি হয়ে গেল—জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি।" আর কোনও কথা বললেন না। সাবিত্রীপ্রসন্ন লিখেছেন, "সুভাষবাবুকে এমন বিচলিত, এমন ব্যথাতুর, এমন ক্লান্ত যেন আমি এর আগে কখনও দেখিনি। দেখলাম তিনি স্নান সমাধা করেছেন—পরিধানে শুভ্র খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর—যেন তিনি বিশেষ কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে ফিরছেন।"

একেবারে প্রত্যুষে সত্যিই এক মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র যোগ দিয়ে এসেছিলেন। গোপীনাথের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতরের এলাকায় হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র, পূর্ণ দাস ও বহু ছাত্র শেষ কাজে যোগ দেবার জন্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবেশপত্র না পাওয়ায় জেলের ভিতরে যেতে পারেননি। যখন শহীদ গোপীনাথের জামাকাপড় নিয়ে তাঁর দাদা জেলের বাইরে আসেন তখন সুভাষচন্দ্র তা স্পর্শ করেন। বলা বাহুল্য, সবকিছুর ওপর গোয়েন্দা বিভাগের কঠোর নজর ছিল। যাঁরা এদিন জেলের গেটে যাবেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোপীনাথ তথা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কোনওরকম সমর্থন বা সহানুভূতি জানাবেন, তাঁরা যে সরকারের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে উঠবেন তা সুভাষচন্দ্রের অজানা ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিসন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নীতিগতভাবে সমর্থন না করলেও নিজের অনুভূতি, মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে সুভাষচন্দ্রের কোনও দ্বিধা, ভয় ছিল না। সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হলেও গোপীনাথ সাহার সাহস, স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র ওই সম্মেলনে যোগ দেননি। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কিন্তু গোপীনাথ সাহা সম্পর্কে অনুরূপ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী কট্টর গান্ধীপন্থীরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। এর ফলে স্বরাজ্য দল ও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের বহির্ভূত কোনও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়নি। কংগ্রেসের 'পরিবর্তন-বিরোধী' নেতাদের সঙ্গে স্বরাজ্যপন্থী নেতাদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য, যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত থাকে। গান্ধীজি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে উপলব্ধি করেন যে, বাস্তব পরিস্থিতিতে নীতির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যপন্থীদের শক্তি ও মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা জরুরি হয়ে পড়েছে। এর ফলে তিনি দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে এক আপস-মীমাংসা করেন। স্থির হয় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার থাকবে স্বরাজ্যপন্থীদের ওপর। গান্ধীজি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাদি আন্দোলনে নিয়োজিত করবেন। এই বোঝাপড়া 'গান্ধী-দাশ' চুক্তি নামে পরিচিত হয়। গান্ধীজি অবশ্য জাতীয় কংগ্রেস এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর প্রভাব হারাননি।

স্বরাজ্য দলের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে ভারত সরকার ও বাংলা সরকার ক্রমেই উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। বাংলায় দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর ওপর বাংলার সাহেব আমলারা, বিশেষ করে টেগার্ট অত্যন্ত রুষ্ট হচ্ছিলেন। গোপীনাথ সাহার ঘটনা টেগার্টকে আরও ক্রুদ্ধ করেছিল। এরপর আর একটি ঘটনা ঘটল। পুজোর পরে, ভোরবেলা কর্পোরেশনের রাস্তায় জল দেওয়া কর্মীরা পার্ক স্ট্রিটের

ফুটপাথের পাইপ খুলে রাস্তা ধুচ্ছে। (তখন কলকাতার রাস্তায় জল দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল।) অত ভোরে রাস্তায় লোকজন খুব কম। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। দেখা গেল, একজন কর্পোরেশন কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছেন। রক্ত ঝরে পড়ছে। কর্পোরেশন অফিসে খবর গেল। সুভাষচন্দ্র খবর দিলেন পুলিশে। খোঁজ-তল্লাশি করে দোষীকে খুঁজে বার করতে হবে। পার্ক স্ট্রিট সাহেব-পাড়া। রাস্তার দু'পাশের বড় বড় বাড়ির বাসিন্দারা প্রায় সবাই ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়। অধিকাংশেরই বন্দুক বা রিভলবারের লাইসেন্স আছে। কোন বাড়ির কোণা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে তা খুঁজে বার করা, সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করা সহজ নয়। সুতরাং পুলিশের দিক থেকে তেমন কোনও আগ্রহই দেখা গেল না। তাছাড়া, নিহত হয়েছেন একজন অতি সাধারণ কর্মী, 'কালা আদমি'। সুভাষচন্দ্র কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। দাবি করলেন, কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত পৌরকর্মীর পোষ্যদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে, অকর্মণ্য পুলিশ বিভাগকে। যথাযথ প্রতিকার না হলে পুলিশ তথা সরকারের বিরুদ্ধে কলকাতা কর্পোরেশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই ঘটনা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে সরকার এবং টেগার্টের রোষানলে ঘৃতাহুতির কাজ করল। স্বরাজ্য দলের সাফল্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সুস্পষ্ট জোয়ার রোধ করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ল। কিন্তু স্বরাজ্য দল এমন কোনও আইন-বিরুদ্ধ কাজ বা আন্দোলন করেনি যে অভিযোগে দলের নেতা বা কর্মীদের আদালতে অভিযুক্ত করা যায়। তাই মরিয়া হয়ে '১৮১৮-র ৩ নং ধারা' নামে একটি পুরনো আইনানুসারে বিনা বিচারে স্বরাজ্য দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর ভোরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। সরকারের অজুহাত ছিল, দেশে সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সরকারের তাঁবেদার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজ 'দি স্টেটসম্যান', 'দি ইংলিশম্যান' এবং 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' অভিযোগ করল, সুভাষচন্দ্র এই 'বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের নায়ক'। সুভাষচন্দ্র ওই সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। তাঁর হয়ে মামলা চালিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। 'ইংলিশম্যান' ও 'ক্যাথলিক হেরাল্ড'-এর বিরুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। কাগজ দু'টিকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'স্টেটসম্যান' বিস্ময়করভাবে অব্যাহতি পায়।

সরকারের অভিযোগ ছিল সর্বৈব মিথ্যা। ওই অভিযোগের পক্ষে কোনওরকম সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের আঘাত হানা, কলকাতা পৌর শাসনে তাঁদের সাফল্য বানচাল করা এবং বিশেষ করে, সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে রেখে তাঁকে অকর্মণ্য করে তোলাই ছিল ওইসব কিছুর মূল লক্ষ্য। প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় সরকার সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেবার কথা ভাবলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। দেশবন্ধু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় সুভাষ ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও লোকের মুখে শোনা যায়। মেয়র রূপে তিনি বলেন, "আমি এইটুকু বলতে পারি, আমি যতটা

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু তার বেশি কিছু নন। ওরা (সরকার) আমাকে গ্রেপ্তার করছে না কেন ? আমি জানতে চাই, কেন ? দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমিও অপরাধী। এই পৌরসভার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শুধু নন, মেয়রও সমান অপরাধী।"

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী তথা বিপ্লবীদের ও বিপ্লব আন্দোলনের কতটুকু সম্পর্ক ছিল এই নিয়ে সরকারি কাগজপত্রে এবং পুলিশের রিপোর্টে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, সরকারের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র খুবই সন্দেহভাজন ছিলেন। স্বরাজ্য দলের শক্তি ও সাফল্য, কর্পোরেশনে সুভাষের 'চিফ এক্সিকিউটিভ' পদে নিয়োগ, অসহযোগ আন্দোলনের পর বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সবকিছুর পিছনে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী দলগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কাজ করছে বলে সরকারি মহল সুনিশ্চিত ছিল। স্বয়ং দেশবন্ধুকেও সন্দেহের উর্ধ্বে মনে করা হত না। তাঁকেও বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করা হত। সংবাদপত্র-পত্রিকায় বিপ্লবী প্রচার সম্পর্কে এক পুলিশ রিপোর্টে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 'আত্মশক্তি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের তিনি প্রধান সংগঠক। তাঁর সঙ্গে বিদেশের বিপ্লবীদের ও বলশেভিক প্রচারকদের যোগাযোগ আছে। পুলিশ অফিসারদের হত্যার ও অস্ত্রশস্ত্র গোপনে আমদানি করার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ আছে। এই কাজে তিনি কর্পোরেশনের টাকা ব্যবহার করছেন। তিনি একজন 'বিশিষ্ট কংগ্রেসি-কমিউনিস্ট', এমন অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি রিপোর্টে করা হয়। এইসব গুরুতর অভিযোগের সপক্ষে আদালতে গ্রহণযোগ্য কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। থাকলে, সুভাষচন্দ্রকে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে বন্দী না রেখে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী জেল, দীপান্তর বা আরও চরম শাস্তি দেবার চেষ্টা করতে টেগার্টের পুলিশ বিভাগ ছাড়ত না।

২৫ অক্টোবর খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ সুভাষচন্দ্রের বাড়ি তল্লাশি করে কিছুই পায়নি। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে। তাঁর মতো পদমর্যাদার ও বিখ্যাত 'অতিথি'দের হঠাৎ থাকার ব্যবস্থা করতে জেল কর্তৃপক্ষ বেশ বিপাকে পড়েন। আলিপুর জেলে থাকাকালে সরকারি নির্দেশে জেলের মধ্যেই তিনি পৌরসভার কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি দেখার ও প্রয়োজনীয় কাজ করার অনুমতি পান। তা না হলে কর্পোরেশনের কাজে অচল অবস্থা দেখা দিত। কিন্তু তাঁর সচিবের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় একজন পুলিশ অফিসার ও জেলার উপস্থিত থাকতেন। এতে কাজকর্মের অসুবিধা হত এবং অভদ্র আচরণের জন্যে কোনও কোনও পুলিশ অফিসার সুভাষচন্দ্রের কাছে ধমক খেতেন। শাস্তিস্বরূপ সুভাষচন্দ্রকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। দু' মাস পরে তাঁকে আবার কলকাতায় নিয়ে আসার আদেশ হল। আসার পথে তিনি জানলেন, আসলে তাঁকে সুদূর উত্তর বর্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে। লালবাজারে সুভাষচন্দ্রের নরক দর্শন হয়েছিল। তাঁর ওই রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন, "ওই থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হয়েছিল তা ছিল একটি নোংরা অন্ধকূপ এবং মশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষের জন্যও চোখের পাতা এক করা সম্ভব হয়নি। বাথরুমের অবস্থা ছিল নিদারুণ এবং

গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তা হল লালবাজার থানা—বহুশ্রুত এই কথাটির যাথার্থ্য আমি সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম।"

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই সুভাষচন্দ্র ও আরও সাতজন বন্দীকে প্রিজন ভ্যানে করে দ্রুত গতিতে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সব বন্দীকে তিন ঘণ্টা একটি ছোট মোটর বোটে 'নৌকা-বিহার' করানোর পর একটি জাহাজে তোলা হল, অন্যদিক থেকে, গোপনে। আসলে আশঙ্কা ছিল সুভাষচন্দ্রকে বর্মার মান্দালয় জেলে পাঠানোর সংবাদ জানাজানি হলে বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা হতে পারে। তাই অত সতর্কতা ও গোপনীয়তা। বন্দীদের মান্দালয় নিয়ে যাবার দায়িত্বে ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ লোম্যান। জাহাজে ছিল কড়া পুলিশি পাহারা। তবু চারদিন পরে রেঙ্গুন পৌঁছবার আগের দিন রাতে লোম্যান এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন—জাহাজ থেকে কয়েকজন রাজবন্দী পালিয়ে গেছেন! সুভাষচন্দ্র সত্যিই ইংরাজ সরকার ও পুলিশের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন সেই ১৯২৪ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ, 'নেতাজি' হবার বহু পূর্বেই।

১৯

মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রায় আড়াই বছর। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টির গুরুত্ব অসীম। বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতি তাঁর গভীরতম শ্রদ্ধা জানাতে তিনি তিলকের মান্দালয় জেলের দীর্ঘ ছ'বছবের নির্বাসিত জীবনের কথা আবেগ ও তীব্র অনুভূতির সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। তাঁর অসহনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার কথা খুব কমসংখ্যক লোকই জানে বলে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন। সব যন্ত্রণা ও পরাধীনতার মধ্যেও কারাবাসের অমানুষিক প্রতিক্রিয়া তুচ্ছ করা ও মানসিক স্থৈর্য বজায় রেখে গীতা-ভাষ্যের মতো একটি বিরাট যুগ-সৃষ্টিকারী গ্রন্থ রচনা শুধু লোকমান্যের মতো অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন দার্শনিক, এক শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানের পক্ষেই সম্ভব বলে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। মান্দালয়ে নির্বাসিন, জেলের নোংরা, একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন তাঁর অসহনীয় মনে হলেও ওই জেল সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিল একটি 'পবিত্র তীর্থস্থান'। তিনি নিজে তিলকের কথা স্মরণ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য, মানসিক নির্যাতন উপেক্ষা করে কঠোরতর সংগ্রামের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। ছ'মাস দুঃসহ জীবনের পর লিখেছিলেন যে, স্বদেশ ও স্বগৃহ থেকে মান্দালয়ে বাধ্যতামূলক নির্বাসিন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করবে, তাঁর কাছে সান্ত্বনা ও প্রেরণাস্বরূপ হবে। তিলক প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "আশা করি দেশবাসী লোকমান্যের মহত্ত্বের পরিমাপ করবার সময় এসব বিষয় মনে রাখবেন।" তিলক সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার প্রতিটি শব্দ সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্রের বন্দীজীবনের কথা না জানলে, তাঁর মনের গভীরতা, ব্যাপ্তি, জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র দিক সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতির অন্তত কিছু পরিচয় না পেলে সুভাষচন্দ্র বসু অনেকটাই অজানা থেকে যাবেন।

মান্দালয় জেলে আসার কয়েকদিন পর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে। সেখানকার জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হয়নি। কারও পক্ষেই তা হওয়া সম্ভব ছিল না। মান্দালয় ছিল 'ধূলার রাজ্য'। শরৎচন্দ্র বসুকে তিনি মান্দালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে লেখেন, "জনৈক কবি একবার বলেছিলেন যে মৃত্যুর কাছে বছরের সব ঋতুই সমান, মান্দালয়ে ধূলাও তেমনি বারোমাস। কারণ পৃথিবীব এ প্রান্তে বর্ষা ঋতু বলে কিছু নেই।...বাতাসে ধুলো উড়ে বেড়ায়, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্যের সঙ্গেও একে গ্রহণ করতে হয়। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায় সর্বত্রই এর কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়...মাঝে মাঝে ধূলোর ঝড়ও ওঠে...মান্দালয়ের চারদিকেই ধুলো ছড়িযে আছে—সর্বত্র তা এত ব্যাপ্ত যে এক অর্থে একে দ্বিতীয় বিধাতাও বলা যায়। ঈশ্বব করেন, আমরা এই নব-বিধাতার হাত থেকে রক্ষা পাই।" সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল বন্দীরা যেন চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো দিন কাটাচ্ছেন। জেলের ওয়ার্ডগুলো কাঠেব খুঁটি পুঁতে বেড়ার আকারে তৈরি। রাত্রে তালাবন্ধ, বন্দীদের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে মানুষের মতো দেখতে কিছু প্রাণী আলোকিত খাঁচার মধ্যে শিকাবেব খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুভাষচন্দ্র কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও রসবোধ হারাননি। জেলের বর্ণনা দিয়ে লেখেন, "এটি এক অদ্ভুত অনুভূতি। ঈশ্বর জানেন, আমাদের এ রূপান্তব কতদিনে শেষ হবে। সে যাই হোক, যে লেজ ও থাবা মানুষ একবার বহু আগেই ত্যাগ করতে পেরেছে, অবস্থার এই সাদৃশ্যের ফলে তা নিশ্চয়ই পুনরায় আমাদের গজাবে না।"

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা যে, তাঁর স্বভাব ছিল গম্ভীর। হাসি, ঠাট্টা বেশি করতেন না। সব বিষয়েই খুব 'serious'। তিনি উপস্থিত থাকল হাল্কা কথাবার্তা, রসিকতা তেমন জমত না। 'আত্মশক্তি'র অফিসে দা ঠাকুর (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আসতেন। এই দু'জন সদাহাস্যময় রসিক স্বদেশপ্রেমিক মানুষকে সুভাষ গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ওঁরা এলে আসর জমে উঠত। কিন্তু সুভাষ চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতেন। একদিন শরৎচন্দ্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, "জানো, সুভাষ হাসতে ভয় পায়। ওর ভয় কি জানো ? দেশ স্বাধীন হবার আগে হাসাহাসি করলে ভারতমাতা যদি রাগ করেন।" সুভাষচন্দ্র কিন্তু খুবই রসিক ছিলেন। নিকট বন্ধুমহলে প্রাণ খুলে হাসতেন। দিলীপকুমার রায় তাঁর স্মৃতিচারণে সুভাষের চরিত্রের এই দিকটির কথা বলেছেন। তবে বাইরে থেকে তা বোঝা যেত না। মান্দালয় থেকে লেখা অনেক চিঠিতে সুভাষের রসবোধ ও সরস লেখার ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে। তাঁর বহু চিঠিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর তেমন কোনও উল্লেখ নেই। শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজির বক্তব্য পড়ে তিনি 'কৌতূহলী' হয়েছেন, এইটুকু মন্তব্য আছে। অন্য একটি চিঠিতে গান্ধীজি সম্বন্ধে সরস ইঙ্গিত আছে। তাঁর হজমের গোলমালের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনসের ধারণা হয়েছিল যে, অতিরিক্ত ভোজনের ফলেই সুভাষচন্দ্রের ডিসপেপসিয়া হচ্ছে। সুভাষ জানান যে, ওই প্রশ্ন অবান্তর কেননা তাঁর খাদ্য ভাতা কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। তবুও সুভাষচন্দ্রকে তিনি উপদেশ দেন মাঝে মাঝে অনশন করতে। এই উপদেশের কথা শরৎচন্দ্রকে জানিয়ে তিনি লেখেন, "তাহলে গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের মধ্যেও,

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য আছে দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে বলেছি সে চেষ্টাও আমি করে ফেলেছি। কিন্তু তা আমাকে শুধু দুর্বল করে ফেলে।”

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী মেজবৌদি বিভাবতী বসুকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, “এ সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মতো কিছু নাই, তাই আপনাকে লিখতে বসেছি, আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখার প্রয়োজন নাই, তাই ঘরকন্না সম্বন্ধে লিখব।” তাঁর ঘরকন্নার যে চিত্র তিনি ওই চিঠিতে তুলে ধরেছিলেন তা সরস, রম্যরচনার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি ছোট ছেলেমেয়ে পছন্দ করলেও বেড়াল ছানা পছন্দ করেন না। বিশেষত যদি সবকটি বেড়ালই বদ রঙের হয়। অন্য কয়েদিদের বেড়াল প্রীতির ফলে বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, জেল তাঁদের (বন্দীদের) গৃহ হলেও কিন্তু গৃহিণী নেই। গৃহিণীর অভাবে একজন কয়েদিকে ম্যানেজারবাবু করা হয়েছে। তিনিই গৃহস্থালীর সর্বেসর্বা। তাঁকেই তাঁরা খাওয়া-পরার জন্যে দায়ী কবেন। খাওয়া খারাপ হলে গালাগালি করেন। মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়। তেমনি নদীর অভাবে তাঁরা বড় চৌবাচ্চার মতো জেলের একটি ডোবায় সাঁতার কাটেন। জেলের এমনই গুণ যে, রজনীগন্ধা ফুল ফুটলেও ওই ফুলে গন্ধ নেই। এই ম্যানেজাব একদিন তাঁর হোটেলে সুভাষচন্দ্রদের গরম গরম জিলিপি খাওযান। মহা আনন্দে এই সুখবর মেজদৌদিকে জানিয়ে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, এর আগে একদিন ম্যানেজারবাবু রসগোল্লাও খাইয়েছিলেন ; যদিও গোল্লাগুলি রসে ভাসছিল, কিন্তু ভেতরে রস ছিল না। ছুঁড়ে মারলে রগ ফেটে যেতে পারত। তবুও সেদিন তাঁরা মহাখুশি হয়ে দু'হাত তুলে ম্যানেজারবাবুকে 'আশীর্বাদ' করেন 'তিনি যেন চিরকাল জেলেই থাকেন'। এই ম্যানেজারবাবু কিছুদিন পরে ম্যানেজারি ছেড়ে শাকসবজির বাগান করার দিকে মন দেন। তাছাড়া ফুলের বাগান করার শখও তাঁর হয়। জেলের মধ্যে জমির অনেকটা জায়গায় রোদ লাগে না বলে তিনি রোদের মধ্যে একটা বড় আরশি ফুলের গাছগুলির ওপর কয়েকঘন্টা ধরে ফেলে রাখছেন! তাঁর বিশ্বাস এই 'বৈজ্ঞানিক উপায়ে' ফুলের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। সুভাষচন্দ্র তাই তাঁকে 'দ্বিতীয় জগদীশ বোস' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর একটি চিঠিতে মেজবৌদিকে জানান, “আমাদের পায়রার খুব বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার খোপও বাড়াতে হচ্ছে। মুরগী মোরগের পালও খুব বেড়ে গেছে। (এতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো?) ২/৩ জোড়া বিলিতি মোরগ ও মুরগীর সাহায্যে কি করে অল্প দিনের মধ্যে এক পাল ভাল জাতের মোরগ ও মুরগী হতে পারে—তা আমরা হাতে হাতে দেখছি। পায়রার সম্বন্ধেও ওই এক কথা খাটে। তবে ময়ুরপঙ্ক্ষীদের বাঁচানো গেল না—তারা ক্রমাগত মরে যায়। টিয়াপাখি বেঁচে আছে—মনের সুখে কি দুঃখে তা বলতে পারি না।”

মেজবৌদিকে প্রথম চিঠিতে মান্দালয় কারাজীবনের 'ঘরকন্না'র কথা লেখার পর সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ ছিল, তাঁর ওইসব গৃহস্থালীর খুঁটিনাটির কথা ভাল লাগবে কি না। যখন বিভাবতী দেবী জানালেন যে, ওই চিঠি পড়ে সকলে রস উপভোগ করেছেন, তখন সুভাষচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন। কেন তিনি জেলের আনন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন, রসশূন্য দৈনন্দিন জীবনেও রসবোধ হারাতে চান না, তার কারণ ব্যাখ্যা করে লেখেন, “মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা হয় যে, হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে 'রসো বৈ সঃ'—অর্থাৎ ভগবান নাকি রসময়। সুতরাং রস যে

লোক হারিয়েছে সে যে জীবনের সারবস্তু আনন্দ হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তার জীবন তখন ব্যর্থ, নিরানন্দ ও দুঃসময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যদি আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে, আমি আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা যেমন দেশবন্ধু, রবি ঠাকুর ইত্যাদি অনেক বয়স পর্যন্ত এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দ ফূর্তি হারান নাই। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে অনুকরণীয়।" সুভাষচন্দ্রের রসঘন চিঠিগুলি পড়ে বিভাবতী দেবী, জানকীনাথ-প্রভাবতী ও পরিবারের সকলের হাসি কান্নার অশ্রুতে চোখ ভরে যেত। সুভাষচন্দ্রের মনের এই দিকটি কিন্তু অনালোকিত হয়ে রয়েছে।

মান্দালয়ে বন্দীজীবনে সুভাষের অন্তহীন কর্মহীন দিনগুলির বেশির ভাগ সময় কাটত বই পড়ে। তাঁর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ছিল অসীম। বাল্যকাল থেকেই তাঁর বই পড়ার উৎসাহ ছিল অদম্য। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতিদিন পড়াশোনা করতেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতারের পর তাঁকে যখন বহরমপুর জেলে রাখা হয় তখন তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল, কী করে তাঁর মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। যে সামান্য মাসিক ভাতা বন্দীদের জন্যে সরকারি বরাদ্দ ছিল তাতে খুব অল্প বই কেনা সম্ভব ছিল। তাই তিনি শরৎচন্দ্র বসুকে বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ যেন তাঁদের কিছু বই রাজবন্দীদের জন্যে উপহার রূপে পাঠান। সমসাময়িক ইংরাজি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছু অনুবাদ গ্রন্থও সম্ভব হলে পাঠাতে বলেছিলেন। কলকাতার এক প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সুভাষচন্দ্রের জন্যে টেনিসনের রচনাবলী ও অভিধান পাঠিয়েছিলেন। মান্দালয় থেকে তিনি অনুরোধ করে পাঠাতেন নানান রকমের বইয়ের জন্যে। ওইসব বইয়ের লেখকদের নাম ও বিষয়গুলির বৈচিত্র্যে সুভাষচন্দ্রের রুচি, পড়াশোনার বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের ইতিহাসের নানান দিক সম্পর্কে পড়াশোনা করতেন। লর্ড রোনাল্ডসের 'হার্ট অফ আর্য ভারত', নরেন্দ্রনাথ লাহার 'এনসিয়েন্ট হিন্দু পলিটি', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এ নেশন ইন মেকিং' ইত্যাদি বই তিনি জেলে আনিয়ে পড়েছিলেন। নতুন বই বেরলে তার সংবাদও তিনি রাখার চেষ্টা করতেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান কলোনিজ ইন দি ফার ইস্ট' বইটি বহির্ভারত বা পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন যুগের সম্পর্কের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ। এই বইটি ওই সময় প্রকাশিত হয়। তিনি শুধু বইটি পাঠাবার জন্যে বলেননি, পড়ার পর ওই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর নিজের যেসব নথিপত্র নজরে এসেছে তা রমেশচন্দ্র ব্যবহার করেছেন কি না দেখার জন্যে। তা না হলে সেই সম্পর্কে ডঃ মজুমদারকে জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ডঃ মজুমদারের কাছে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে লিখেও পাঠিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, ডঃ মজুমদার ওই বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অনেক বই কলকাতা থেকে আনিয়েছিলেন। বোঝাই যায় যে মামুলি নয়, ওই বিষয়ে গবেষণামূলক পড়াশোনা তাঁর ছিল।

সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনার পরিধি ছিল বিস্ময়কর। অ্যাডাম উইলিয়ামসের নদীর

ওপরে লেখা বই, ই. মে-র 'পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর', হ্যামন্ডের ভারতীয় নির্বাচন, নির্বাচন পদ্ধতি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্পিকারদের ভূমিকা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য দর্শনের ওপর নানা গ্রন্থ, নীৎসের রচনাবলী, পাশ্চাত্য সাহিত্যের বই তিনি মান্দালয় জেলে পড়ে চিঠিপত্রে তার উল্লেখ করেছেন। শরীরচর্চা সম্পর্কে ম্যুলারের 'মাই সিস্টেম' বইটি তিনি অন্যদের পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বিবেকানন্দের রচনাবলী, বিশেষ করে তাঁর 'পত্রাবলী', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস, নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনা সম্বন্ধে একটি পৃথক বই লেখা যায়। মান্দালয় জেলে থাকাকালে তিনি কত রকমের বই পড়েছিলেন তা জানলে অবাক হতে হবে। আর তিনি শুধু পড়েননি, বিভিন্ন বই সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য ও টীকাগুলি একত্র করলে একটি বই হবে। শিশিরকুমার বসু সম্পাদিত সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এইগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্র এত বেশি পড়াশোনা করেছিলেন, প্রায় প্রতি চিঠিতে বই পাঠানোর জন্যে এত লিখেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখতে বাধ্য হন, বন্দীদশায় তাঁর মাত্রাতিরিক্ত পড়াশোনা করা ঠিক হবে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে এত মানসিক পরিশ্রম ক্ষতিকর হবে। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি তথ্যের উল্লেখ করি।

সুভাষচন্দ্র জ্যোতিষ ও তন্ত্রবিচার গ্রন্থে আগ্রহী ছিলেন। ওই বিষয়ে ইংরাজি ও বাংলা বই তিনি পড়েছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পুরোহিত দর্পণ' বইটি পড়ে তিনি নিজের মন্তব্য লিখেছিলেন। এটি পড়লেই বোঝা যায় যে, তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতো দুরূহ বিষয়ে তাঁর দখল ছিল। তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন কি না সে বিষয়ে কিছু নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। দিলীপকুমার রায় একটি চিঠিতে (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) সুভাষচন্দ্রকে জানান যে, তিনি বারাণসীতে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন যে এই জ্যোতিষী নাকি নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। দিলীপকুমার এ কথা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু ওই জ্যোতিষীর কাছে যাবার পর তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি সুভাষচন্দ্রকে লেখেন, "ভৃগু সংহিতার সাহায্যে তিনি তোমার সম্পর্কে যে সব কথা বললেন সেগুলি শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। ভৃগু সংহিতার কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। এবার বলছি কী ঘটেছিল ..আমি আমার দুজন বন্ধুর সঙ্গে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তোমার কুণ্ডলী বা রাশিচক্র দেখালাম, এটি আমি তোমার এক বন্ধুর কাছে সংগ্রহ করেছি। তোমার নাম বলেছিলাম এস বসু। তোমার সম্পর্কে আর কিছুই জানাইনি জ্যোতিষীকে। তিনি নিজেও তোমার পরিচয় জানতেন না, মন্তব্যগুলি যথার্থ প্রমাণিত হওয়ার আগে তোমার আসল পরিচয় সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত দিইনি আমি। শ্লোক আউড়ে তিনি তোমার সাধারণ প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে চিত্র দিয়েছেন, সেটি আমি একটি কাগজে টুকে নিয়েছি...মনে হয় এগুলি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করবে।" সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ওই জ্যোতিষী বলেছিলেন, গৌরবর্ণ, মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য, সুদর্শন, পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরাজিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপ সফর করেছেন একবার, উচ্চ সরকারি পদ পেয়েছিলেন, কঠিন পরীক্ষায় পাস করেছেন, ভাল ছাত্র

এবং ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ, বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করেন না, একটি বা দুটি ভ্রাতার মৃত্যু হবে, ২৮ বছর বয়স পূর্ণ হবার পরে সুন্দরী ও বিদুষী মহিলার সঙ্গে বিবাহ হবে, ৩০ বা ৩২ বছর বয়সে পুত্রসন্তান হবে, দেশ বিদেশে যশোলাভ (দেশ দেশান্তরে কীর্তি), পুনরায় ইউরোপ সফর, সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের জন্যে বিখ্যাত, পিতা প্রভাবশালী ব্যক্তি, অত্যন্ত দানশীল প্রকৃতি, তপশ্চর্যাপূর্ণ জীবন, পরমায়ু ৭০-৭১, ধর্মপ্রাণ ও সৎ, অবৈধ প্রণয়ে আগ্রহী নন, ২৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে তীব্র মানসিক সঙ্কটে পড়বেন, ২৯ বছর বয়সে মুক্তি পাবেন, ৩১ বছর বয়সে সমৃদ্ধির জীবন শুরু হবে, ২৭ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বন্দীজীবন, দয়ালু প্রকৃতির।

দিলীপকুমার লেখেন, "তোমার চরিত্র সম্পর্কে তিনি যে চিত্রটি তৈরি করেছেন সেটি বিস্ময়করভাবে সত্য। অন্তত আমার মতে তাই।" সুভাষচন্দ্রের নিজের এই সম্পর্কে কী মনে হয়েছিল তা জানা নেই। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁদের অভিমত কী, তা অনুমান সাপেক্ষ।

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। ওড়িশার প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে তাঁর মান্দালয় থেকে পত্রালাপ ছিল। ওড়িশার উন্নতির বিষয়ে তাঁর গভীর ভাবনা চিন্তা ছিল। গোপবন্ধু সুভাষকে ওড়িয়া ভাষায় লেখা বই পাঠাতেন। এসব বই পড়ে তিনি আরও বই পাঠাতে অনুরোধ করতেন। বিজয় মজুমদারের Orissa in the Making বইটি পড়তে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। মান্দালয়ে সহবন্দী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বর্মী ভাষাও শিখেছিলেন।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে নিয়মিত পাঠাভ্যাস সুভাষচন্দ্র অপরিহার্য মনে করতেন। সব প্রতিষ্ঠানের, এমনকি কারাগারেও, গ্রন্থাগার থাকা তিনি অবশ্য প্রয়োজন মনে করতেন। পাঠ, শরীর-চর্চা ও চিন্তা বা ধ্যান—অন্তত দেড় দু' ঘণ্টার জন্যে, তিনি সার্বিক উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মনে করতেন। সুভাষচন্দ্রের আর এক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে ব্যবধান দূর হওয়া প্রয়োজন। জাতির সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে উভয় জগতের মানুষের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

২০

দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "যেসব জটিল প্রশ্নের উত্তর এতদিন খুঁজে পাইনি সেগুলোর সমাধান দেখা যাচ্ছে। আমাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্যে যে নিরাসক্ত মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই নির্জনতা ও প্রবাসজীবনের ফলে তা আমি পেয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারছি না। যদি আমার শরীর সুস্থ থাকত তাহলে যে নির্বাসন আমাকে বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হচ্ছে তার দ্বারা আরও অনেক কিছু লাভ হত।" জওহরলাল নেহরু তাঁর 'আত্মজীবনী', 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি বহুল পঠিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন কারাগারে। ইন্দিরা গান্ধী একবার বলেছিলেন, "আমার বাবা দীর্ঘকাল

জেলে থাকায় এত লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমি সেই সুযোগ পাইনি।" জওহরলালের স্বাস্থ্য কারাবাসের ফলে ভেঙ্গে যায়নি। জেলের পরিবেশও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। প্রয়োজনীয় বইপত্র পেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। মননশীল নেহরুর পক্ষে তাই এসব গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের সে পরিবেশ ও সুযোগ ছিল না। মান্দালয় জেলে থাকাকালে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমেই অবনতি হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য পরে আর ভাল হয়নি। তা না হলে সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকেও অনুরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আমরা পেতাম। তাঁর চিঠিপত্রগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ কত মৌলিক ও তীক্ষ্ণ ছিল সে পরিচয ছড়িয়ে রয়েছে চিঠিপত্রে, ভাষণে ও সাক্ষাৎকারে।

শিল্পকলা, সঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ ও অভিমত আজও খুবই প্রাসঙ্গিক, বিশেষ মূল্যবান। তিনি মনে কবতেন কারুকলা বা ওই সংক্রান্ত কোনও প্রচেষ্টাই নিষ্ফল নয়। তিনি বলেছিলেন, "এ জন্মে যে আর্টিস্ট হলুন না তার কারণ, হতে পারলুম না, আর আমার বিশ্বাস শিল্পী জন্মায়, তৈরি করা যায় না। একথা অনেকটা সত্য।" কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হলে আর্ট উপভোগ করা যায না, এটা ঠিক নয়। যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই কলার সমজদার হওয়া কঠিন নয়। জীবনকে আনন্দময় ও পরিপূর্ণ করার জন্যে তিনি সঙ্গীত ও শিল্পকে অপবিহার্য বলে মনে করতেন। দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, "বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন কবা কি কখনও সম্ভব?" সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন শিল্প ও সঙ্গীতের আনন্দকে অতি দরিদ্রের কাছেও সহজলভ্য করে তুলতে। বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্যে ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতকে সর্বসাধারণেব উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। তেমনি সাধাবণ মানুষেব কাছে সুগম না হলে শিল্প ও জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে আর্ট বা শিল্প 'নির্জীব ও খর্ব' হয়। এই যোগাযোগ রাখার জন্যে লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই যোগসূত্রটি ভারতবর্ষে প্রায় ছিন্ন হওয়ার মূলে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিন্তু তার জায়গায় নতুন কোনও যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। এর দুঃখজনক পরিণতি কী হতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, যদি আমাদেব গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন তাহলে আমাদের চিত্তের যে কী দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।" মালদার 'গম্ভীরা' গানের মৃত্যুর সম্ভাবনায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। বাংলার নিজস্ব লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য একমাত্র মালদাতেই বেঁচে আছে। তাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে হবে। দিলীপকুমার রায়কে অনুরোধ করেছিলেন মালদায় যেতে, বাংলার লোকসঙ্গীতকে বাঁচাবার, উন্নত করার জন্যে উদ্যোগ নিতে। ভারতীয় সঙ্গীতে আবার প্রাণ সঞ্চার ও তার প্রচারের জন্যে একটি বই ইংরাজিতে লেখার জন্যেও তিনি তাঁকে বলেছিলেন। ইংরাজিতে লিখলে

অন্য ভাষাভাষীদেরও বইটি পড়ার সুবিধা হবে তাই ইংরাজিতে লেখার কথা বলেছিলেন। সব বিষয়েই সুভাষচন্দ্রের একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য ছিল। তাঁর নিজের বিশেষ পরিচিত বইগুলিও তিনি ইংরাজিতে লিখেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের গান ও ছবি আঁকা শেখানো উচিত বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। প্রাথমিক শিক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা, প্রসার, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেবার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে তিনি সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েকে, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের, প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মান্দালয় থেকে তিনি কর্পোরেশনের জনপ্রিয় উদ্যমী কাউন্সিলার সন্তোষকুমার বসুকে একাধিক চিঠিতে কর্পোরেশনের কর্মসূচী ও জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ও বিভিন্ন প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। সন্তোষকুমার বসু পরে কর্পোরেশনের মেয়র ও বিশিষ্ট জননেতা হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি জানান, এটা লজ্জার কথা যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে বোম্বাই, দিল্লি ও চট্টগ্রাম কলকাতার চাইতে এগিয়ে গেছে। তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল ১৯২৬ সালে কয়েকটি অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার। কিন্তু আইনে সেরকম কোনও ক্ষমতা কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়নি। ঐ ক্ষমতা লাভের জন্যে চেষ্টা কবা উচিত। সন্তোষকুমার বসু তাঁর অভিমত ও প্রস্তাবগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ও তাঁকে তা জানাতেন বলে সুভাষচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন। পৌরসভার এডুকেশন অফিসার-এর বিশেষ দায়িত্ব হওয়া উচিত বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের দিকে লক্ষ্য বাখা। কিন্ডারগার্টেন প্রথা, শিশু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়, শিশুদের জন্যে আদর্শ পাঠ্যপুস্তক যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে লেখানো, শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে একটি Training School স্থাপন করা তাঁর দায়িত্ব হওয়া উচিত। এর জন্যে কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগকে একটি পৃথক বিভাগে পরিণত করা দরকার। এটা করতে সময় লাগবে, অর্থের প্রয়োজন হবে ঠিকই। কিন্তু সুভাষচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, "কলকাতার অল্পবয়স্ক গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব যে বিভাগের উপর, গুরুত্বের বিচারে তা অন্য কোনও বিভাগ থেকে কোনও মতেই কম নয়।" আজ সাতদশক পরেও সুভাষের ঐ পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার গুরুত্বের বিষয়টি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কী গভীর পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করেছিলেন তা বিস্ময়কর। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার বড় পার্থক্যের সুন্দর ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছিলেন, "প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন facts শেখাবার চেষ্টাই বেশি প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় নূতন facts যেরূপ শেখাতে হয় তার সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়।" প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তার বা মনে রাখার শক্তি ভালরকম জাগে। উচ্চ শিক্ষায় চিন্তাশক্তির আধিক্য বেশি হয়। প্রাথমিক শিক্ষায়, মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রথম থেকেই 'manual training'-এর ওপর জোর না দিলে শিক্ষার গোড়ায় গলদ থেকে যায়। নিজের হাতে গাছের সৃষ্টি, পুতুল তৈরি ইত্যাদি শেখালে শিশুরা সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করতে শেখে। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন প্রথম দিকে Text Book-এর আদৌ কোনও

প্রয়োজন নেই। যাই শেখানো হোক না কেন তা যেন ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। "খুব গরিব চালে" হলেও গান, ছবি আঁকা, বাগান তৈরি করা শেখানো খুবই প্রয়োজন। ভাল শিক্ষক না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। শিক্ষকের মনে থাকা চাই শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি। শিক্ষার তিনটি উপাদান দরকার : শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ; শিক্ষার প্রণালী ; শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবান শিক্ষক না পাওয়া গেলে শিক্ষা ব্যবস্থা সফল হয় না।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা কত বহুমুখী ছিল তা তাঁর মান্দালয় থেকে লেখা চিঠিগুলিতে যেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তা আর কোথাও হয়নি। কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করেছে জেনে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ছাত্রদের আরও গভীর মনোনিবেশ করা উচিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমার শিক্ষায় যাকে আমি খুঁত বলে মনে করি তা হল বাংলা সাহিত্যে আমার বিশাল অজ্ঞতা এবং কেবলমাত্র এখনই আমি সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছি।" মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রত্নভাণ্ডার অনেক দিক থেকে আধুনিক কালের চেয়েও বেশি বলে তিনি মনে করতেন।

সমাজসেবা, কল্যাণ ও উন্নয়ন সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা ও জাতীয়তাবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। দক্ষিণ কলিকাতায় তিনি 'দক্ষিণ কলিকাতা সেবাসমিতি' ও 'দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংবাদপত্র পত্রিকার পরিচালনা এবং জাতীয় শিক্ষার কাজে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকার মধ্যেও তিনি সেবামূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মান্দালয়ে কারাজীবনেও তিনি সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের সঙ্গে খোঁজখবর নিতেন, পরামর্শ দিতেন। এই বিষয়েও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। সমাজসেবামূলক কাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র লোককে অর্থ সাহায্য করা নয়। গরিবকে সাহায্য করে তাকে দিয়ে কাজ করানো হল 'organized charity'-র লক্ষ্য। তিনি এই বিষয়ে সমাজসেবী হরিচরণ বাগচীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরিব সাহায্যপ্রার্থীদের মনে জাগানো উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয় তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল।" তবে তারই সঙ্গে বিচার্য হল সাহায্য গ্রহণকারীর কাজ করার মতো সময়, শারীরিক সামর্থ্য ও তার উপযুক্ত কোনও কাজ করার সুযোগ আছে কি না। তাছাড়া, কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। তিনি লেখেন, "আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি। সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্তিত হইবে না।" যদি আশা করা যায় যে তা সম্ভব, তাহলে হতাশ হতে হবে। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের চিরকাল জনসাধারণের দানের (Public Charity) ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। ঐ সমিতির নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে এটি সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের কাজে উৎসাহী কর্মীর অভাব সম্পর্কে তাঁকে জানালে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ঐ নিয়ে নিরাশ ও চিন্তিত না হতে। অধিকাংশ সমিতিরই একই সমস্যা। নিজেদের সেবা ও আগ্রহের মাধ্যমে অপরের সেবা প্রবৃত্তি জাগাতে হবে। গ্রামের মানুষের মনেও অপরের দুঃখবেদনার

প্রতি সহানুভূতি না জাগলে সেবার কাজ করা, বিস্তৃত করা সম্ভব হবে না। সেবাশ্রমের বিস্তৃত বিবরণ তিনি পাঠাতে বলেছিলেন। তা পড়ে তিনি পরামর্শ দিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আর একটি কাজের দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে বলেছিলেন। কলকাতার জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদি মারা গেলে, তার যদি আত্মীয়স্বজন কলকাতায় না থাকে, তাহলে তার সৎকারের কোনও উচিত মতো ব্যবস্থা হয় না। কিন্তু মুসলমানদের Burial Association আছে। মুসলমান কয়েদি মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। হিন্দু কয়েদিদের জন্যে অনুরূপ একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। তিনি তারপর যা বলেন, তাতে তাঁর বিশাল হৃদয় ও চরিত্রের মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র লেখেন, "আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি। সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।"

মুক্তিলাভের পর দেশে ফিরে তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় নিজে সক্রিয় ভূমিকা না নিতে পারলেও ১৯৩২ সালে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে হিন্দু-সৎকার সমিতি স্থাপিত হয়।

সুভাষচন্দ্র নানান দিক থেকেই এক বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের যে দিকটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি মনকে স্পর্শ করে তা হল তাঁর মানবিকতা। হাজার কাজের মাঝে দারুণ সঙ্কট ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও অতি সাধারণ মানুষের আপাত তুচ্ছ সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করা। মান্দালয় জেলে তখন সবেমাত্র এসেছেন। জেলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি কত খারাপ তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই শরীর খারাপ। দেহ ও মনে অবসাদ। তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র বসুকে সম্ভবত প্রথম চিঠিতেই লিখছেন, "কর্পোরেশনের পাম্পিং স্টেশনে অথবা জল সরবরাহের যে কোনও কেন্দ্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারের কাজের জন্য এন্তাজ আলি নামে একটি লোক দরখাস্ত করেছিল। বাঁশের মতো গোলাকৃতি একটি টিন কেসের মধ্যে পুরে সে তার দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্রগুলি আমাকে দিয়েছিল। সেটি আমার অফিসে হয় টেবিলের ওপর নতুবা আমার চেয়ারের বাঁদিকে what-not-এর মধ্যে আছে। টিন কেসটি দেখতে এত অদ্ভুত যে, ভুল হবার নয়। লোকটি আমাকে ওই প্রশংসাপত্রগুলির কথা লিখেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এটি তাকে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ এটি না পেলে সে অন্য কোথাও চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারছে না।" ভাবা যায়? কোথাকার কে এক চাকরিপ্রার্থী এন্তাজ আলির প্রশংসাপত্রগুলি ফেরৎ না পেলে অসুবিধা হবে, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন সুভাষচন্দ্র লিখছেন জেল থেকে প্রথম চিঠিতেই।

মানুষের প্রতি এই গভীর মমতাই তাঁকে বিচলিত করেছিল দেশবন্ধুর স্নেহধন্য দাগী আসামী মাথুরের আশ্রয় সম্বন্ধে। মেজদাকে আবেদন করেছিলেন তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে। তিনি চিন্তায় পড়েছিলেন তাঁর সাহায্যে যে ছেলেটি পড়াশোনা করছিল, তার এখন কী হবে। গ্রাম্য জমিদার মলয়-এর যে কাহিনী তিনি মেজবৌদি বিভাবতী দেবীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন তা খুব কঠিন হৃদয়কে স্পর্শ করে, চক্ষু সজল করে। শুধু মাত্র একটি করুণ কাহিনী বলেই নয়, কাহিনীর বর্ণনায় সুভাষচন্দ্রের

হৃদয়ের উত্তাপ ও এক ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতায়। সুভাষচন্দ্রের ওয়ার্ডে মলয় নামে এক কয়েদি মেথরের কাজ করত। কোনও এক অপরাধে তার সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মুক্তির আদেশ এল। কিন্তু মলয়ের মুখে কোনও আনন্দের ছাপ না দেখে সবাই বিস্মিত হল। অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় সে শুধু বলছে 'কাউন্ডে কাউন্ডে' অর্থাৎ 'ভাল ভাল'। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগের দিন তাকে কাছে বসিয়ে জানা গেল যে চার বছর হয়ে গেল সে স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের কোনও খবর পায়নি। তারা ভাল আছে, এমনকি বেঁচে আছে কি না তাও সে জানে না। তাই তার মন ভয়ে আকুল হচ্ছে। সে একজন গ্রাম্য জমিদার বা রাজা। তারা পূর্বে স্বাধীন ছিল। প্রথমে বর্মী রাজাদের ও পরে ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতা ফিরে পেতে লড়াই করে তারা হেরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। তিন বছর লুকিয়ে থাকার পর তাকে ও তার ভাইকে তাদের বৈমাত্রেয় ভাই ধরিয়ে দেয়। তার ভাই-এর যাবজ্জীবন দীপান্তর ও তার সাত বছরের কারাদণ্ড হয়।

মলয তার শরীরে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন দেখায়। সবগুলিই যুদ্ধের সময়ে পাওয়া। অবিশ্বাস্য কাহিনী। পরে সুভাষচন্দ্র খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে 'গ্রাম্য রাজা' মলয়ের কাহিনীর প্রতিটি বর্ণ সত্য। এরকম একজন মানুষকে মেথর করে রাখা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন সে মেথরের কাজ করতে রাজি হয়েছিল। ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষটি দুঃখের সঙ্গে বলে, "কি করব, জেলের হুকুম! এখানে কি আর মানুষ আছি—এখানে কুকুর হয়ে গেছি। আবার বাইরে গেলে তখন মানুষ হব।" তার করুণ কাহিনী শুনে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, ভবিষ্যতে সে কী করবে? মলয় বলে, সে জানে না। এখন তাদের জমিদারি সেই বৈমাত্রেয় ভাই ভোগ-দখল করছে। ভয় হয়, কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে। যাবার সময় সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেন, তাঁদের কথা বাড়িতে ফিরে গিয়ে মনে থাকবে কি না। গদগদ কণ্ঠে মলয় বলে, "বেঁচে থাকতে আপনাদের স্নেহের কথা ভুলব না—এবং আমার ছেলে ও নাতিদের কাছে আপনাদের গল্প করব।" গল্পটি লেখার পর সুভাষচন্দ্র বিভাবতী দেবীকে প্রশ্ন করেন, "এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়, না উপন্যাসের গল্প বলে মনে হয়?" নিজেই এই উত্তর দিয়ে সুভাষচন্দ্র লেখেন, অনেক সময় সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও অলৌকিক হয়। এও তাই।

২১

মান্দালয়ের কারাজীবন সুভাষচন্দ্রের শরীর ও মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। জেলে থাকার পূর্বের ও মুক্তিলাভের পরের সুভাষচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। জেলের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাঁকে আরও পরিণত করে তুলেছিল। জেলের নির্জনতায় তিনি জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি তলিয়ে বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জেলে থাকাটা তাঁর ভাল লাগে বললে ভণ্ডামি হবে। কোনও ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলের আবহাওয়া যে কোনও মানুষকে বিকৃত ও অমানুষ করে

তোলার উপযোগী। কিন্তু তিনি তাঁর অন্যায় নির্বাসন ও অসহনীয় কারাজীবনকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখেছিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। 'দাগী অপরাধী'দের খুব কাছ থেকে দেখে, তাদের জীবনের দুঃখ-বঞ্চনা, তাদের প্রতি সমাজ ও বিচার ব্যবস্থার অন্যায়ের কথা শুনে ও প্রত্যক্ষ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত হলেও সকলেই প্রকৃত অপরাধী নয়। যদি তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকে, তাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলে ধরা হয়, জেলের পরিবেশ উন্নত করা যায়, তাদের মানসিক অভাব ও শূন্যতা দূর করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তারা সুস্থ সামাজিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে।" অবশেষে তাঁর মুক্তিলাভ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "সম্প্রতি জীবন আমার কাছে একটি রোমান্টিক নাটকে পরিণত হয়েছে।"

নিজের কারাজীবনকে সুভাষচন্দ্র বেশি গৌরবান্বিত করে দেখা পছন্দ করতেন না। শত অসুবিধার মধ্যেও রাজনৈতিক বন্দীর যে এক বড় সান্ত্বনা আছে, যা অন্য বন্দীদের নেই, তা তিনি অকপটভাবে স্বীকার করেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দী জানে যে মুক্তির পব সমাজ তাকে বরণ করে নেবে। বন্ধু-বান্ধব, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়, পরিজনদের তাব প্রতি সহানুভূতি, শুভেচ্ছা আছে। কাজেই কারাবাস নিয়ে আত্মম্ভরিতার কোনও কাবণ নেই। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা এক বিরাট প্রাপ্তি। জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। দুঃখ-যন্ত্রণাই মানুষকে উচ্চতর, উন্নততর সাফল্যলাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে। 'Suffering' ছাড়া মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ করতে পারে না। পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে সে নিজের অসীম শক্তি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে পারে না। জেলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের ওপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।" সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কারাজীবনের দিনগুলি জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে বুঝতে, অনুভূতি ও সহানুভূতির ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এই অভিজ্ঞতা শিল্পী ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তাঁর জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধহয় ভেবে দেখা হয় না।"

মান্দালয়ের কারাজীবন সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমকে গভীরতর, তীব্রতর করে তুলেছিল। তিনি লিখেছিলেন যে, এত কষ্টের মধ্যেও যদি তিনি আনন্দ অনুভব না করতেন তাহলে পাগল হয়ে যেতেন। তিনি তাঁর মেজবৌদিকে লেখেন, "আমি অনুভব করছি আমার জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই, আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?" একই সুর অনুরণিত হয়েছিল যখন তিনি জেলে বন্দী থাকাকালেই উত্তর কলকাতা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদের জন্যে কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনী আবেদনে তিনি বলেছিলেন,

মান্দালয়ে বন্দীর নির্বাসিত জীবনের পূর্বেও তিনি বাংলা, ভারতভূমিকে ভালবাসতেন। কিন্তু ওই বিচ্ছেদের ফলে সোনার বাংলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণ বেশি ভালবাসতে শিখেছেন। "স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকতে পারি।" এই নিবেদন পত্রটি ভোটপ্রার্থীর বাক্-সর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি ছিল না। এর প্রতিটি কথা ছিল সত্য। হৃদয় থেকে উৎসারিত। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তা জানত। তাই এটি প্রকাশ করার অনুমতি তারা দেয়নি। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির পর এটি তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

স্কুল জীবন থেকেই সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে গর্ভধারিণী মা ও মাতৃভূমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্বদেশপ্রেমে এক গভীর অধ্যাত্মচেতনা ছিল। মান্দালয়ে তা আরও পরিস্ফুট হয়। ১৯২৫ সালে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে রাজবন্দীরা দুর্গাপূজা করার জন্যে জেল সুপারের কাছে অনুমতি ও অর্থের জন্যে আবেদন করেন। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজা ছিল 'ধর্মীয় জাতীয় উৎসব'। জেল সুপার মেজর ফিন্ডলে পূজা করার অনুমতি দেন। তিনি ভেবেছিলেন, যেহেতু ভারতীয় জেলে খ্রিস্টান বন্দীরা অনুরূপ সুবিধা পান এই অনুমতির অনুমোদন পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু ফিন্ডলের অনুমতি দান অনুমোদন করা তো দূরের কথা, তিনি এর জন্যে র্ভৎসিত হন। পূজা অবশ্য এর পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। মহাষ্টমীর দিন সুভাষচন্দ্র মনের আনন্দে এই সংবাদ মাকে জানিয়ে লেখেন, "আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন।...মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁর পূজা অর্চনা করা সম্ভব হয়েছে।"

পূজা হয়ে গেলেও সরকারের সঙ্গে সুভাষের নেতৃত্বে বন্দীদের বিরোধ চলতে থাকে। সরকার পুজোর খরচ বহন করতে অস্বীকার করে। সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের দাবি করে বন্দীরা লেখেন যে, আলিপুর জেলে মাত্র কয়েকজন খ্রিস্টান অপরাধী বন্দীকে ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্যে বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হিন্দু রাজবন্দীদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে এক পয়সাও দেওয়া হয় না। এটা কী রকম সুবিচার? তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, "আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র পরধর্মসহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয় এবং বিশ্বাস করে কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা।" বন্দীরা জানিয়ে দেন, ভারতীয়রা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। বন্দীরা কারারুদ্ধ, নিঃসঙ্গ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রয়েছে জনসাধারণ, বন্ধু-হিতৈষীরা। প্রয়োজনে বন্দীরা মৃত্যু বরণ করবেন সানন্দে। তাঁরা জানিয়ে দেন যে, দাবি না মানা হলে তাঁরা অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন চিঠির রচয়িতা সুভাষচন্দ্র এবং জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক। এই চিঠিতে ফল না হওয়ায় বন্দীরা অনশন শুরু করেন।

বন্দীদের অনশনের সংবাদ সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। 'ফরওয়ার্ড'-এ এটি প্রকাশিত হলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দিল্লিতে ভারতীয় আইনসভায় বিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার রাজবন্দীদের দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়। পনেরো দিন অনশনের পর বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করেন।

১৯২৬ সালের শেষ দিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস প্রার্থী রূপে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন বলে আশা করা হলেও শেষপর্যন্ত উদারপন্থী (Liberal) দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি খুবই জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর সহজাত ঔদার্যে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) উদারনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বলার মতো কিছুই নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে এই মনোভাব ও উক্তি বর্তমান রাজনৈতিক জগতে অচিন্তনীয়। ওই সময়েও তা ছিল বিরল। সুভাষচন্দ্র বিপুল ভোটে জিতলেও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমেই আরও খারাপ হয়ে পড়ছিল। ১৯২৬ সালের শীতকালে ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পর তা উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে তাঁকে রেঙ্গুন জেলে পাঠানো হয়। সেখানে এক মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষা করে তাঁকে মুক্তি দেবার সুপারিশ করেন। এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু। তাঁকে ওই বোর্ডের সদস্য করা ছিল বিস্ময়কর। যখন বোর্ডের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্যে সকলে উদগ্রীব সেই সময় রেঙ্গুন জেলের সুপারিন্টেডেন্ট মেজর ফ্লাওয়ার ডিউ-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ হয়। এর ফলে তাঁর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। সুভাষচন্দ্র ফ্লাওয়ার ডিউ-এর উদ্ধত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার ও আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে রেঙ্গুন জেল থেকে অন্য যে কোনও জেলে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিলেন। ফ্লাওয়ার ডিউ-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধের ঘটনাটি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ও আত্মসম্মান বোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কোন ধাতুতে গড়া ছিলেন তা ঘটনাটি থেকে বোঝা যায়। তখন সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্যে নানান দিক থেকে চাপ আসছে। সরকার বাধ্য হয়ে ব্যাপারটি বিবেচনা করছে। এই সময় সুভাষচন্দ্র চিফ জেলার মিঃ সলোমনকে একটি চিরকুট লিখে পাঠান (১৯ মার্চ, ১৯২৭) যে তিনি যেন 'অনুগ্রহ করে' ইংলিশম্যান কাগজের দু'টি সংখ্যা আনাবার ব্যবস্থা করেন এবং প্রাতঃরাশের আগে তাঁর কাছে যাতে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করেন। দু'ঘণ্টার মধ্যে চিরকুটটি তাঁর কাছে ফিরে আসে। তলায় জেল সুপার মেজর ফ্লাওয়ার ডিউ-এর নিজের হাতে লেখা একটি সই করা নোট, সুভাষচন্দ্র যেন চিফ জেলারকে 'হুকুম না করেন'। সুভাষচন্দ্র ফ্লাওয়ার ডিউ-এর এই নোট অত্যন্ত অশোভন এবং অসৌজন্যপূর্ণ বলে মনে করেন। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বর্মার গভর্নরকে দুটি চিঠি লেখেন। তিনি জানান, যে চিফ জেলারকে কোনও হুকুম করেননি তিনি। সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দেন, আই সি এস পরীক্ষায় তিনি ইংরাজি রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। মেজর ফ্লাওয়ার ডিউ জাতিতে ইংরেজ হলেও, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁর চাইতে সুভাষচন্দ্রের অনেক বেশি। কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ রূপে তিনি যখন কাজ করেছেন তখন অনেক উচ্চশিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপীয় তাঁর অধীনে কাজ

করতেন। তাঁদের বেতনও ফ্লাওয়ার ডিউ-এর দ্বিগুণ ছিল। বিবেচনাবোধ তাঁর আছে। তা শেখার দরকার নেই। নিয়মিত সময়ে সংবাদপত্র পাওয়া তাঁর ন্যায্য স্বীকৃত অধিকাব। কিন্তু তা তিনি পাচ্ছেন না। বহুবার বলা ও লেখার পরেও একই অব্যবস্থা চলেছে। ফ্লাওয়ার ডিউকে বলেও কোনও ফল হয়নি। সুভাষচন্দ্র দাবি করেন যে, অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্যে ফ্লাওয়ার ডিউকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার ও দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। দু'দিন পরে আর একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, বিষয়টি 'জটিল' করে ফেলার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু ফ্লাওয়ার ডিউ কী ধরনের ব্যবহার প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে করেছেন তা জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রেঙ্গুন জেলে আসার (ডিসেম্বর ১৯২৬) পর প্রথম পরিচয়েই ফ্লাওয়ার ডিউ তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, সুভাষচন্দ্র যেন বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ না করেন। তাঁর ওই সাবধানবাণীর ভাষা ও তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর। তারপর সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি চিকিৎসার জন্যে কোনও যত্ন নেওয়া দূরের কথা, গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেননি। তাঁর অফিসে দেখা করতে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রকে বসতে পর্যন্ত বলেননি। সপ্তাহের প্রতি সোমবার জেল সুপারের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁকে দেখতে আসার। কিন্তু তিনি ক'দিন তাঁকে দেখতে এসেছেন তার খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে ওই দায়িত্ব তিনি কতটা পালন করেছেন। তিনি আদেশ জারি করেছেন যে, কোনও বন্দী যদি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে, তার শাস্তি হবে। ফ্লাওয়ার ডিউ-এর চরম অভদ্র উদ্ধত ব্যবহারে সুভাষচন্দ্র এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে অবিলম্বে রেঙ্গুন জেল থেকে অন্য যে কেনও জেলে যাতে পাঠানো হয় তার জন্যে দিল্লিতে কর্তৃপক্ষকে বলার জন্যে তিনি মতিলাল নেহরু ও কলকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবাদের ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে ইনসিন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সুভাষচন্দ্র একটি সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত স্পর্শকাতর না হলেই ভাল করতেন। তখন তাঁর মুক্তির প্রশ্নটি জোরাল হয়ে উঠেছিল। ঠিক ওই সময়ে এত বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকরই হয়েছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে এ মাপকাঠিতে দেখা ও বিচার করা সম্ভব নয়। চলিত কথায়—ফ্লাওয়ার ডিউ সিংহের লেজে পা দিয়েছিলেন। তাই সিংহের গর্জন ও তেজের প্রকাশ ছিল অনিবার্য।

ইনসিনের জেল সুপার মেজর ফিন্ডলে পূর্বে মান্দালয় জেলে ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা দেখে সরকারকে একটি কড়া নোট পাঠান। কিন্তু তাতেও সরকার তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে সম্মত হল না। প্রস্তাব করা হল যে, যদি তিনি নিজের খরচে সরাসরি সুইজারল্যান্ডে যেতে সম্মত হন তাহলে তাঁকে মুক্তি দিয়ে রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। শর্তকণ্টকিত ওই প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র অসম্মানজনক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কবে তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হবে, বা কখনও হবে কি না, ওই প্রস্তাবে তার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। বাংলার পুলিশ মহলে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ও ততোধিক ভয় ছিল। প্রশাসনের উচ্চমহল তাঁর মুক্তির ব্যাপারে চাপে পড়ে কিছুটা নরম হলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষের তাতে প্রবল আপত্তি ছিল। আর, এই ব্যাপারে পুলিশের বক্তব্যই

বেশি প্রাধান্য পেত। শরৎচন্দ্র বসুকে সুভাষচন্দ্র লেখেন, “পরলোকগত দেশবন্ধু আমাকে ‘যুবক-বৃদ্ধ’ বলে ডাকতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলে মনে করেছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সব ঘটনারই অশুভ দিকটা বড় করে দেখি। বর্তমান ঘটনার সব চাইতে খারাপ ফল কি হতে পারে, তাও আমি চিন্তা করে দেখেছি, কিন্তু তবুও আমি স্থির করেছি, জন্মভূমি থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসনের চাইতে জেল থেকে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।” আর একটি চিঠিতে তিনি এক সহকর্মী বন্ধুকে লেখেন যে, জেলের প্রাচীরের বাইরে যাওয়ার আশা যতই সুদূর পরাহত হচ্ছে, ততই তাঁর মন শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হয়ে আসছে। “ষোল আনা দিতে হলে অপর দিকে ষোল আনা পাওয়া চাই...এখনও ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্যে আমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।” তার মুক্তি নিয়ে সরকার যে রকম শর্ত দিচ্ছিল ও কিছু কিছু লোক মনে করছিল যে তিনি আরও ভাল শর্তের জন্যে ‘পাটোয়ারি চাল’ দিচ্ছেন, সেই প্রসঙ্গে সুভাষ শরৎচন্দ্রকে লেখেন, “আমি দোকানদার নই, দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি, আমি একটি আদর্শ অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছি।”

শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে আলমোড়া জেলে বদলি করার সিদ্ধান্ত হয়। জাহাজে করে রেঙ্গুন থেকে ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছলে তাঁকে বাংলার গভর্নরের লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই লঞ্চে একটি মেডিকেল বোর্ড তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এই বোর্ডের চার সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও স্যার (ডাঃ) নীলরতন সরকার। পরের দিন সকালে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়। দিনটি ছিল ১৬ মে, ১৯২৭, অথচ মুক্তির আদেশে সই করা ছিল ১১ মে। অর্থাৎ একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের চেষ্টা চলছিল যদি মুক্তির আদেশ বাতিল করানো যায়।

সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেবার পিছনে একটি বড় কারণ ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টা। এঁদের মধ্যে ছিলেন পেথিক-লরেন্স (Pethick-Lawrence), ল্যান্সবেরী (George Lansbury), থার্টল (Thurtle) এবং টি. উইলিয়ামস (T. Williams)। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মুক্তি, তাঁকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন হাউস অফ কমন্সে উত্থাপন করে তাঁরা ভারত সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সচিব ও সহ-সচিবকে বিব্রত ও প্রায় বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। ল্যান্সবেরী তো পার্লামেন্টে অভিযোগ করেছিলেন, “ভারত সরকার এই লোকটিকে হত্যা করার চেষ্টা করছে।” স্পিকার তাঁর এই মন্তব্যটি পার্লামেন্টের বিবরণী (Proceedings) থেকে বাদ দেবার আদেশ দেন। সুভাষচন্দ্রের ‘বিচার’ সম্পর্কে পার্লামেন্টে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া তথ্য যে মিথ্যা তাও ল্যান্সবেরী প্রমাণ করে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে দুঃখ প্রকাশে বাধ্য করেছিলেন। ওই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনীকারদের লেখায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি।

মান্দালয় জেল থেকে লেখা প্রথম চিঠিতেই সুভাষচন্দ্র কোনও এক চাকরিপ্রার্থী এন্তাজ আলির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কর্পোরেশনে তাঁর অফিস থেকে উদ্ধার করে তাকে ফেরত দেবার জন্যে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। যাতে না তার অন্যত্র কাজ পেতে অসুবিধা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কলকাতায় ফিরেই সুভাষচন্দ্র যান শিলং-এ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। শিলং থেকে ক'দিন পরেই তিনি একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠির দু'টি মুখ্য বক্তব্য ছিল। প্রথমটি তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টি, একটি সিল্কের লুঙ্গি। এটি তিনি মান্দালয় জেলে পরতেন। লুঙ্গির এই গুরুত্বের ব্যাপারটি তাঁর চিঠি থেকেই জানা ভাল। তিনি লিখছেন, "কলকাতায় থাকার সময় মান্দালয় থেকে পাঠানো আমার সিল্কের লুঙ্গিটা পেয়েছি। এটা আমার পাওয়ার কথা নয়। কারণ লুঙ্গিটা আমি কয়েদি মউ টিনের জন্যে রেখে এসেছিলাম। এই কয়েদিটি আমার গা-হাত-পা টিপে দিত। আমি এ-বিষয়ে সুপারিন্টেডেন্টের সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে এসেছিলাম যে কয়েদিটি ছাড়া পাওয়ার পরে ওই লুঙ্গিটা যেন পায়। না পেলে গরিব মানুষটি বেশ হতাশ হবে। মান্দালয় ছাড়ার সময় আমি কি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে লুঙ্গিটি আমি মউ টিনের জন্যে রেখে যাচ্ছি? কথা রাখার জন্যে মউ টিনের প্রাপ্য লুঙ্গিটা আমি আবার মান্দালয়ে পাঠিয়ে দেব।" এক কয়েদিকে নিজের ব্যবহার করা লুঙ্গি দেব বলে, কথার খেলাপ যাতে না হয় তার জন্যে ওই লুঙ্গি আবার কলকাতা থেকে মান্দালয়ে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা সুভাষচন্দ্রের মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এই মানবিকতা, কথার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার দুর্লভ গুণ সুভাষচন্দ্রের চরিত্রকে মহিমময় করে তুলেছিল।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সালে ইউরোপ যাত্রা করা পর্যন্ত সময়টি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়েই তিনি সর্বভারতীয় নেতার স্বীকৃতি ও মর্যাদা অর্জন করেন। গান্ধীজিব সঙ্গে তাঁর মতাদর্শ, নীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে মতপার্থক্য তীব্রতর হয়। যুব আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষের সমমর্যাদা, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বলিষ্ঠভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ওই সময়ের চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতার বিশ্লেষণের জন্যে শিলং-এ কেমনভাবে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছিল তা জানা প্রয়োজন। প্রকাশ্য বিবৃতি বা ভাষণের থেকেও এই সময়ে লেখা তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিগুলির মূল্য এই প্রসঙ্গে আরোও বেশি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই স্বরাজ্য দলে ও বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে বিতর্ক ও বিরোধ প্রদেশ কংগ্রেসকে কার্যত দু'টি শিবিরে বিভক্ত করে তুলছিল। যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজির সমর্থন লাভ করেছিলেন। মান্দালয় জেলে থাকাকালেই সুভাষচন্দ্র এই বিরোধ নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন।

জেল থেকে মুক্তিলাভ করে শিলং-এ বিশ্রাম নেবার সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধ যাতে মিটে যায় তার জন্যে তিনি অধীর হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি

করেছিলেন যে, এই বিরোধ ও দলাদলি কংগ্রেসের ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিলং থেকে তিনি লিখেছিলেন, "বৈষম্য দূর করে বিভিন্ন দলকে একতাবদ্ধ করার কাজে আমি সব বকম উদ্যোগ নেব।" ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯২৭) শিলং থেকে প্রচারিত এক আবেদনে তিনি বলেন, 'ক্ষমা করুন ও ভুলে যান' ('Forgive and Forget')। তিনি 'ঘরে শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠা ও কংগ্রেসের বাইরের সব দলের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার আবেদন জানিয়ে বলেন যে, দেশ এক 'নবজাগরণের দ্বারপ্রান্তে'। এখন 'ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান'—এই নীতি অনুসরণ করে সব দলাদলি, সব সাম্প্রদায়িক বিবাদের ঊর্ধ্বে সবাইকে উঠতে হবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসেব অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটেনি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তবুও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ কেন মেটেনি তার দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কোনও কোনও সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মী এবং আধুনিক ঐতিহাসিক এব জন্যে সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবকে (চলিত কথায় 'একগুঁয়েমি' বা 'জিদ') দায়ী করেছেন। গান্ধী-সুভাষ বিরোধ সম্পর্কেও একই সমালোচনা হয়েছে সুভাষচন্দ্রের। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ও 'অনমনীয়তা' বুঝতে হলে তাঁর মানসিক গঠনটি ভালভাবে জানা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র যা সত্য, কল্যাণকর, দেশ এবং সমাজের হিতার্থে প্রয়োজন বোধ করতেন তার জন্যে কোনও আপস বা নীতিহীন বোঝাপড়া পছন্দ করতেন না। তার জন্যে চরম মূল্য দিতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা কবতেন না। আব চবম মূল্য তিনি দিয়েও ছিলেন। গান্ধীজির নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত তিনি যদি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন, তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের প্রভাবমুক্ত না হতেন তাহলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হত না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের জন্যে দেশত্যাগ করতে হত না। সম্ভবত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট হত। কিন্তু কী হলে কী হতে পারত সেটা বড় কথা নয়। মূল কথা হল তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, কারোর জন্যে, কোনও কিছুর জন্যেই নিজের বিবেকেব নির্দেশ অমান্য না করা। বিবেককে বাঁধা না দেওয়া। এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যদি অনমনীয়তা বা জিদের নামান্তর হয় তাহলে অবশ্যই তিনি ওই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কেব কথা উল্লেখ করি।

সুভাষচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাসন্তী দেবী বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে অন্য কারোর পক্ষেই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরের শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয়। বারবার তিনি এই অনুরোধ বাসন্তী দেবীকে জানিয়েছিলেন। বাসন্তী দেবী সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিলেন মাতৃবিগ্রহের মতো। গভীর আবেগে তিনি লিখেছিলেন যে, নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্যে তিনি ওই আবেদন করছেন না। "আত্মবিশ্বাস আমাদের বোধহয় একটু বেশিই আছে।" কিন্তু, "আমাদের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লইয়াই মাতৃমূর্তি রচনা করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান শুরু হইয়াছে। তাই আজ মাকে ডাকিতেছি।" বাসন্ত দেবী এর পরেও কোনও সাড়া না দেওয়ায় সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বাসন্তী দেবীকে জানান যে, দেশের কথা ভেবেই তাঁর অনুরোধ। Big Five—নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচন্দ্র

গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—সকলেই (তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ছাড়া) Professional লোক। নিজের কাজে ব্যস্ত। নেতৃত্ব দেবার মতো লোকের অভাব। কংগ্রেসের ভাণ্ডার শূন্য, এই সঙ্কটের সময় দেশবন্ধু পত্নীর এগিয়ে না আসা গভীব দুঃখের কথা। তারপর সুভাষচন্দ্র যা লেখেন তাতে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওযা যায়। তিনি বলেন, "জীবনে কাহারও কখনও খোসামুদি করি নাই—অপবের মন যুগিয়ে কথা বলার রীতি আমার জানা নাই। আমাদের Leader-এর (দেশবন্ধু) জীবদ্দশায় যখন সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁহার মনের মতো কথা বলেছেন, আমি তখন অপ্রিয় সত্য বলে তাঁহার সহিত ঝগড়া করেছি, আপনাকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য কোনও কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসী আপনাকে চায়. .সকল দল আপনাকে মানবে, আপনাকে খাতির করবে, আপনার কথা রাখবে। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি বলে আপনাকে জানিয়েছি।"

বাসন্তী দেবীকে এইভাবে চিঠি লেখা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। যে চিঠিতে তিনি কার্যত বাসন্তী দেবীকে দেশের সঙ্কটমুহূর্তে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করার জন্যে তীব্র সমালোচনা করেছেন সেই চিঠিতেই আবার লিখেছেন, "সেদিন মা-এর (প্রভাবতী) কাছে শুনিলাম আপনি স্বপ্নে একটা ঔষধ পেয়েছিলেন—আমার অসুখের জন্য—অথচ আপনি আমাকে সেই ঔষধ দেন নাই বা সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুনে আমার খুব রাগ হয়েছে...আপনি জানেন যে, যে কোনও ঔষধ আপনি দিলে আমি সাগ্রহে এবং ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম।" বাসন্তী দেবী সম্ভবত মনে করেছিলেন যে, সুভাষ 'স্বপ্নলব্ধ ঔষধ'-এ বিশ্বাস করবেন না। তাই ওই ওষুধ পাঠাতে তাঁর সঙ্কোচবোধ হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে তিনি স্বপ্নলব্ধ ওষুধে বিশ্বাস করতেন কি না করতেন তা বড় কথা ছিল না। মা পাঠিয়েছেন পুত্রের আরোগ্যের জন্যে—এটাই সবচেয়ে বড় ছিল। এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনও ঠাঁই ছিল না।

শিলং-এর নির্জন ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কয়েক মাস বিশ্রাম নেবার সময় সুভাষচন্দ্রের মনে বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির আনাগোনা চলছিল। ১৬ জুন 'দরিদ্র নারায়ণে'র সেবায় দেশবন্ধুর আত্মনিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন বিরাট ঋণের চাপে জর্জরিত হয়েও নিজের প্র্যাকটিস আবার শুরু করার কথায় কান দেননি। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন টাকার চেয়েও আদর্শ বড়। তিনি অসহযোগিতার আদর্শ বর্জন করেননি। দেশবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে টাকার অভাব মানুষ মেটাতে পারে, কিন্তু মানুষের অভাব টাকায় কখনও মেটানো যায় না। দু'মাস পরে মেজবৌদি বিভাবতী দেবীকে এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লেখেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবটি হৃদয়ে রাখা ভাল। এই ভাবটি থাকলে মানুষ স্বার্থপর বা কৃপণ হয় না। কিন্তু তাঁর নিজের (সুভাষের) দিক থেকে ওই কথাটি বলা খাটে না। তাঁর কাছে প্রতিটি টাকার মূল্য খুব বেশি। "যে টাকাটি আমার নিজের জন্যে ব্যয় করি, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে ঐ টাকা অপরের জন্যে ব্যয় করতে পারলে আমি বেশী সুখী হতুম।" সুভাষচন্দ্র একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সৎ কাজ ও সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেও যে টাকার প্রয়োজন আছে তাও নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন। এই রকম মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে প্রায়ই দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্জীবনে কী রকম পরিবর্তন দেখা

দিত তার আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরি।

সুভাষচন্দ্র শিলং-এ থাকাকালে মেজবৌদি বিভাবতী দেবী ও বাড়ির আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা চলে যাবার পর সুভাষ মেজবৌদিকে লেখেন, "আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুস্কিলে পড়েছিলাম। খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল। দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল...আমি মনে করতুম যে আমি মায়া-মমতার বাহিরে। তাই একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবারে মমতাহীন হতে পারিনি।" পাঁচ বছর পরে সুভাষচন্দ্র যখন একলা অসুস্থ শরীরে মাদ্রাজে ইউরোপে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন তখন তাঁর সঙ্গে এক নিকট বন্ধু দেখা করতে আসছেন শুনে তিনি লিখেছিলেন, "আমার সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসিবে শুনিলে মনটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, মোট কথা কাহারও আসাটা আমি পছন্দ করি না।" এমনকি তাঁর নিজের বড়দা সতীশচন্দ্র মাদ্রাজে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সুভাষচন্দ্র তাঁকেও আসতে বারণ করেছিলেন। আসলে, সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে সবসময়ই একটা অস্থিরতা ছিল। এর মূলে ছিল তাঁর উদগ্র স্বদেশপ্রেম, স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার অস্থিরতা। তিনি নিজেও তাঁর এই অস্থিরতা বা মেজাজ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি চিঠিতে বিভাবতী দেবীকে লিখেছিলেন, "অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না, পাগল আমি নই, তবে যদি মনে করেন তাতে আমার আপত্তি নাই। একটু আধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন? একেবারে স্থির মস্তিষ্ক হওয়াটা কি ভাল!" এই রকমই 'পাগল' ছিলেন দেশবন্ধু। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁর জন্যে কোনও স্মৃতিমন্দির না করে একটি পাথরের ওপর লিখে দিতে : 'বাংলার একজন পাগল এখানে বিশ্রাম করছে।' দেশবন্ধুর ওই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯২৭ সালে বলেছিলেন, 'অনেক সময়ে পাগল লক্ষণ না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। পুরো মাত্রায় sanity পাওয়া যায় সেখানে—যেখানে আছে শুধু dull mediocrity (অনুজ্জ্বল মাঝারিয়ানা)।" দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য, রাজনৈতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্র তাঁরই গুরুর উন্মাদনা নিয়ে শিলং থেকে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে পুনঃপ্রবেশ করেন।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্পাদক হন কিরণশঙ্কর রায়। সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের আসার ফলে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। দেশের সামনে প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি। মানসিক হতাশার কারণে গান্ধীজি ও স্বাস্থ্যের কারণে মতিলাল নেহরু সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকায় মূল দায়িত্ব পড়েছিল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ওপর। তিনি যথাসাধ্য এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাংলাদেশে ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্রতর হওয়ায় সুভাষচন্দ্র খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের আস্থা ফিরিয়ে এনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্যে সচেষ্ট হন। বেঙ্গল প্যাক্টের জন্যে দেশবন্ধুর এবং কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ রূপে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্নে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র উভয়ের প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র তাতে বিচলিত হননি। নতুন পরিস্থিতিতেও সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতি ও ঐক্যরক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হয়নি। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি আবেদন করেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামই মূল প্রশ্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বেশি নমনীয় ও উদার হতে হবে যাতে মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি বিঘ্নিত না হয়। তিনি নির্ভীকভাবে বলেন, "মুসলমানরা গরুর শত্রু নয়। মুসলমানদের বাড়িতে গরুর যথেষ্ট যত্ন হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুর বাড়ির থেকেও। বাংলার মুসলমান কৃষক হিন্দু কৃষকের মতই গরুকে ভালবাসে, কারণ সে জানে দুধ ও চাষবাস তা ছাড়া সম্ভব নয়।" এই ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন প্রাদেশিক হিন্দুসভা আয়োজিত জন সমাবেশে। উদ্যোক্তাদের মনোভাবের সমালোচনা করেছিলেন। একই সঙ্গে নিন্দা করেছিলেন মুসলিম লীগের। তিনি হিন্দুসভাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন গো হত্যার বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না কবতে। তিনি খোলাখুলি বলেন যে, 'আমি জানি এই কথা বলার ফলে আমার বর্তমান জনপ্রিয়তার সম্ভবত ক্ষতি হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আমার জনপ্রিয়তার এতটা মূল্য দিই না যার জন্য সত্যকে বিসর্জন দিতে হবে।" হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে এক সভায় তিনি বলেছিলেন (১২ নভেম্বর, ১৯২৭), "আপনারা হিন্দুর অধিকার মুসলিমদের অধিকারের কথা বলেন। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি পরাধীন জাতির কোনো মানুষের কি কোনো অধিকার আছে?"

খুব স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত অনেকেরই পছন্দ হয়নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সংগঠনগুলি তখন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। মুসলিম লীগ ও অনেক মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হতে থাকায় হিন্দুদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে সুভাষচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। তিনি মুঞ্জের সমালোচনার উত্তরে বলেন যে, জাতীয় জীবনে, সমাজ কল্যাণে, হিন্দু মহাসভার করণীয় অনেক কিছু আছে। ওইসব ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের তিনি প্রশংসা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার প্রবেশ না করাই কাম্য।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠনের প্রচেষ্টা সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। পুণাতে এক ভাষণে (৩ মে, ১৯২৮) তিনি ধর্মোন্মত্ততার প্রতিকারের জন্যে সাংস্কৃতিক সৌহার্দ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আর গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'অর্থনৈতিক চেতনা' জাগ্রত করার ওপর। সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সুস্থ জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্যে জরুরি প্রয়োজন অর্থনৈতিক চেতনার। তিনি বলেন, 'একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে যতটা মিল তার চেয়ে ঢের বেশি মিল একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে। তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত আছে জনসাধারণকে শুধু সেই শিক্ষা দিতে হবে এবং একবার এই কথাটা বুঝতে পারলে তারা আর সাম্প্রদায়িক বিবাদে নিজেদের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি হবে না।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সংহতির সমাধান প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অতি সরলীকরণের প্রবণতা ছিল। পরে এটা আরোও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যেভাবে গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে এক

বিষবৃক্ষের শিকড় উৎপাটনের চেষ্টা করেছিলেন তা তাঁর জীবন ও দর্শনের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। যে সমাধানের কথা তিনি ভেবেছিলেন তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। মুসলমান কৃষকের গরুর প্রতি ভালবাসা সম্বন্ধে তাঁর সাহসী উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এর গফুরকে। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন ও কীর্তি সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাসকে রূপ দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সুসংহত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ অবিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন সার্থক হবার মতো পরিবেশ ও পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হয়নি। ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা সুভাষচন্দ্রের ছিল না। সে সুযোগও তিনি পাননি।

২৩

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নানান সমস্যা, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দলের শক্তি ও জনপ্রিয়তা হ্রাস, প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সংঘর্ষ ও অন্যান্য নানান কারণে জাতীয় আন্দোলন যখন কিছুটা অবসন্ন ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে এই সময় ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন (নভেম্বর ১৯২৭)। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন যে ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ঠিকভাবে কাজ করছে না। ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন আর সম্ভব নয়। সমগ্র বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে নতুন নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সাতজন সদস্যই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। সাইমন কমিশন গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও মতের মানুষ বিক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেস ওই কমিশনের বিরোধিতা করে ঘোষণা করে যে, ভারতীয়দের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্যতা নির্ণয় করার জন্যে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার কোনও যোগ্যতা বা অধিকার ওই কমিশনের নেই। এই রকম এক কমিশন গঠন করে ভারতবাসীকে অপমান করা হয়েছে বলে সকলেই মনে করেন। কংগ্রেস স্থির করে এই কমিশনকে সম্পূর্ণ বর্জন করবে। এমনকি উদারনৈতিক দলও মনে করে যে, কোনও ভারতীয় সাইমন কমিশনে না রেখে এদেশের মানুষকে হেয় করা হয়েছে। স্বদেশের শাসনতন্ত্র রচনায় তাদের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য ভারতে এসে পৌঁছনোর পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। নভেম্বর মাসে এক ঐক্য সম্মেলন হয়। পরের মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলন হয়। এর ফলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের চিন্তাধারার জয় হয়। স্থির হয়, সাইমন কমিশন তাঁরাও বর্জন করবেন। এ মাসেই কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্টদের একটি সুসংবদ্ধ দল প্রথম দেখা দেয়। তাঁরা স্বাধীন সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি মাদ্রাজে ডাঃ এম. এ. আনসারীর পৌরোহিত্যে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারে সাইমন কমিশনকে বর্জন করা হবে। সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান কবা হবে।" 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে এই কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। মাদ্রাজ কংগ্রেসের 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র (Complete Independence) প্রস্তাব গ্রহণ ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের দাবির তুলনায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ছিল অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও জোরাল। সদ্য বিলাত ও মস্কো প্রত্যাগত তরুণ জওহরলাল নেহরু এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে তাঁর ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারেব এক বড় ভূমিকা ছিল। সুভাষচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগ দিতে পাবেননি। এক বিবৃতিতে তিনি এই কংগ্রেসের সাফল্যের জন্যে তাঁর আনন্দ ও অভিনন্দন জানান এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আবেদন জানান। সর্বসম্মতিক্রমে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও অধিবেশন শেষ হবার পরেই গান্ধীজি ঘোষণা করেন যে, ঐ প্রস্তাবটি "তাড়াহুড়ো করে রচনা ও পরিণামের কথা না ভেবেই গ্রহণ করা হয়েছে।" গান্ধীজির এই বক্তব্য ও মনোভাবে সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ তরুণ নেতারা খুশি হননি। পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে এই মতপার্থক্য ফুটে উঠেছিল। লাহোর কংগ্রেসে দলের সাধারণ সম্পাদক রূপে জওহরলাল নেহরু, সাহেব কুরেশী ও সুভাষচন্দ্র বসু নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর ফলে সর্বভারতীয় স্তরে তাঁদেব গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে লাহোর কংগ্রেস সুনির্দিষ্টভাবে বামপন্থী নীতির দিকে গতি ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাইমন কমিশনের সাত সদস্য ভারতে পৌঁছলে দেশজুড়ে 'হরতাল' ডেকে বিক্ষোভ জানান হয়। হরতাল ও 'বয়কট' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। গণ-বিক্ষোভ সবচেয়ে তীব্র ও সফল হয় বাংলাদেশে। এই সাফল্যের কৃতিত্বের সিংহভাগ ছিল সুভাষচন্দ্রের। সাইমন কমিশন পৌঁছবার পূর্ব থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস হরতাল, বিদেশীদ্রব্য বর্জন, জনসভা ও মিছিলের মাধ্যমে জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সুভাষচন্দ্র দিনের পর দিন সাইমন কমিশন-বিরোধী বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, বিদেশী সরকারের আদেশে, বিদেশী সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোনও কমিশনের ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা আছে কি না তা তদন্ত করে দেখার অধিকার নেই। পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশের মানুষের যেমন সুবিধা ও অধিকার আছে আমরা তাই-ই চাই— তার থেকে বিন্দুমাত্র কমও নয়, বেশিও নয়। ভারতবর্ষের মতো এক বিরাট দেশের মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় ইংরাজ শাসনের চাবিকাঠি হল এক মোহ— "ইংরাজরা শ্রেষ্ঠতর জাতি এবং ভারতীয়রা অপদার্থ, ঘৃণ্য, নিম্নস্তরের মানুষ।" এই মোহ মুক্ত হতে হবে। 'হরতাল' ও বিদেশী 'বয়কট' করে প্রমাণ করতে হবে ভারতের মানুষ ব্রিটিশ শাসন চায় না। তারা চায় স্বাধনীতা। সাইমন কমিশন-বিরোধী জন-বিক্ষোভ দমন করার জন্যে ইংরাজ সরকার নির্বিচারে যে নিপীড়ন, নৃশংসতার আশ্রয় নিয়েছিল তাকে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ চরিত্রের 'পশুশক্তির নগ্ন প্রকাশ' বলে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "ইংরাজদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমাদের কাছে সকল মানুষই ভ্রাতৃতুল্য।" কিন্তু তাদের যদি স্বাধীন

জাতি রূপে বাঁচার অধিকার থাকে, ভারতীয়রাও সেই অধিকার দাবি করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লাহোরে সাইমন কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের আক্রমণের ফলে লালা লাজপত রায় গুরুতরভাবে আহত হন। কয়েকদিন পবে তাঁর মৃত্যু হয়। লক্ষ্ণৌতে অনুরূপ আক্রমণের ফলে গোবিন্দবল্লভ পন্থ মাবাত্মকভাবে আহত হন। ঐ আঘাতের ফলে তিনি চিরকালের জন্যে আংশিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে লাজপত রায় তাঁর সকল সম্পত্তি জাতিকে দান করে যান। তাঁর মৃত্যুকে সুভাষচন্দ্র 'সুখের মৃত্যু' বলে অভিহিত করেছিলেন, কেননা ওই ছিল 'মহাপুরুষদের জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণের রীতির এক দৃষ্টান্ত'। যেমন কবেছিলেন দেশবন্ধু। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ও অভিযোগ ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২৮) এই ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করে তিনি লাজপত রায়ের মৃত্যু এবং লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের ওই ঘটনার পব জাতিব আত্মসম্মান রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নেতাদের কাছে আবেদন কবেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাতে সাড়া দেননি। গভীর বেদনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "কংগ্রেসের জয়-পরাজয় নিয়ে তরুণ ভারত মাথা ঘামায় না। তারা চায় দেশকে মুক্ত করতে এবং তার সকল দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের প্রবীণ নেতাদের চাই, আমবা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, আমরা তাঁদের ভালোবাসি—-কিন্তু আমরা এগিয়েও যেতে চাই।" সুভাষচন্দ্রের অভিযোগের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন গান্ধীজি। এ কথা তিনি খোলাখুলি লিখেছিলেন তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে। সুভাষের মতে, যে আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজি ১৯৩০ সালে শুরু করেছিলেন তা দু' বছর আগে শুরু কবলে আরও ভাল হত। ১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র নিজে সবরমতী আশ্রমে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে বলেছিলেন, জনগণ যে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত এবকম কোনও আলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তবে শুধুমাত্র গান্ধীজিকে নয়, সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্যপন্থী নেতাদেরও সমালোচনা করেছিলেন ১৯২৮ সালের গণ-বিক্ষোভের চরিত্র বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যে।

সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পিছনেও ছিল সুভাষচন্দ্রের চিন্তার গভীরতা ও দূরদৃষ্টি। বিলাতী বস্ত্র ও লবণ বয়কট আন্দোলন স্বরাজ অর্জনের সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে, এই বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল করার জন্যে সুভাষ নিরন্তর প্রচার শুরু করেন। বাঙালি নারীদের কাছে তিনি বিশেষ আবেদন জানান যাতে তাঁরা 'শৌখিন বস্ত্রের ফাঁদ'-এ না পড়েন। সংসারে তাঁরা যদি স্বদেশীর শপথে অবিচল থাকেন তাহলে ব্রিটিশ বস্ত্র কেনার সাহস পুরুষদের হবে না। 'দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ' শৌখিন বস্ত্রের প্রলোভন ত্যাগ করে তাঁরা যেন স্বদেশের তৈরি মোটা কাপড় পরিধান করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে 'স্বদেশী' মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল তার পুনরুজ্জীবন সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে গভীর পড়াশোনা ও তথ্য সংগ্রহ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ব্রিটিশ পণ্য বর্জন' (Boycott of British Goods) প্রকাশ করেন (১৯২৯)। বইটি লেখা তিনি শুরু করেছিলেন আগের বছরের ডিসেম্বর মাসে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সামাজিক অন্যায়, বৈষম্য ও লোকাচারভিত্তিক কুসংস্কারের

বিরুদ্ধে জনমত গঠনও প্রয়োজন বলে সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন। লোকাচারের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে সামাজিক কুসংস্কারকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিন সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সুরে বলেছিলেন, "বহু ক্ষেত্রে শাস্ত্রের ওপরও লোকাচারকে স্থান দেওয়া হয়। শাস্ত্র শাশ্বত, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকাচার ও প্রথা বদলায়।" প্রগতিশীল সমাজের স্বার্থে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকাচার ও প্রথার সামঞ্জস্য করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "আমি বুঝতে পারি না যে-দেশের লোক বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন সে দেশের লোক অস্পৃশ্যতার মতো একটি প্রথা কেমন করে সহ্য করে। বর্ণপ্রথার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যত শীঘ্র তা বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল।" তাঁর মতে "সামাজিক গণতন্ত্র ভিন্ন রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। যদি আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র চাই তবে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল্যেই তা কিনতে হবে।"

ধূমপান বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যুবকদের মধ্যে ধূমপানের বিপজ্জনক প্রবণতা এখনি বন্ধ করা প্রয়োজন বলে তিনি যুবকদের কাছে আবেদন করেন। বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি রাজশাহীতে এক ছাত্র সমাবেশে (১০ এপ্রিল, ১৯২৮) বলেন, "তোমরা ধূমপানের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করো। ধূমপান করে ধূমপানকারীর কোনো উপকার হয় না। বরং দেশের কোটি কোটি টাকা ধূমপান খাতে বাইরে চলে যাচ্ছে।" বিদেশী ছায়াছবি আমদানি ও দেখার বিরুদ্ধ আন্দোলনও তিনি বয়কট ও বিদেশী বর্জনের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কলকাতার মনোমোহন থিয়েটারে ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেটের নির্মিত 'দেবদাস' ছবিটি দেখতে গিয়ে তাঁর ভাষণে (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮) সুভাষচন্দ্র বলেন যে, আমেরিকায় এবং ইংলন্ডে বিদেশী ফিল্ম আমদানীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ দেশেও অনুরূপ আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। বাঙালিরা যদি স্থির করে যে তারা কোনও বিদেশী ছবি দেখবে না তাহলে সিনেমা কোম্পানিগুলি দেশী ফিল্ম করতে বাধ্য হবে। বিদেশীদের পকেটে প্রচুর অর্থ যাওয়া বন্ধ হবে। ওই অর্থ দেশেই থাকবে। ছায়াছবি যাতে নৈতিক শৈথিল্য প্রশ্রয় না দেয় তার জন্যে তিনি সেন্সর বোর্ডকে নজর রাখতে বলেন। ভারতীয় ফিল্ম কোম্পানি গঠিত হলে জাতীয় সাহিত্য থেকে ছায়াছবির কাহিনী নির্বাচিত হবে, জনসাধারণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ছায়াছবি দেখে তিনি অনুরূপ আশা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতার 'চিত্রা' সিনেমা হলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০) তিনি বলেন, "আমি কদাচিৎ সিনেমা দেখতে যাই। গত কয়েক বছরে আমি কয়েকবার মাত্র ছবি দেখতে গিয়েছি এবং তাও দেশী ছবি... আমাদের দেশবাসীর কর্তব্য জাতীয় শিল্প রূপে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সাহায্য করা।" ইতিপূর্বে কোনও রাজনৈতিক নেতা বয়কট ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনকে এত ব্যাপক রূপ দেবার চিন্তা করেননি। সাফল্য-ব্যর্থতার নিরিখে নয়, চিন্তার ব্যাপ্তি ও মৌলিকতা দিয়েই সুভাষচন্দ্রের অবদানের মূল্যায়ন করতে হবে।

সাইমন কমিশন নিয়োগের প্রবল সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ভারতের জন্যে সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া

রচনা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কার্যত এটি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে এতই মতপার্থক্য আছে যে তাঁরা সর্বসম্মত কোনও শাসনতন্ত্রের খসড়া করতে ব্যর্থ হবেন। ভারত-সচিবের এই উদ্ধত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের অন্যতম ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এই কমিটি একটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন। এটি 'নেহরু রিপোর্ট' বা 'নেহরু সংবিধান' (Nehru Constitution) নামে পরিচিত হয়। এই রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে 'অধিরাজ্যের মর্যাদা' (Dominion Status) দেওয়া প্রয়োজন। এই ভারতীয় অধিরাজ্যে সব নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও অধিকার থাকবে। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে। ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে খসড়া সংবিধানটি গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক দলগুলির এই মতৈক্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পরেই মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি পুনরুজ্জীবিত করে 'নেহরু সংবিধান' নাকচ করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব এক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে আবার বিরাট অন্তরায় রূপে দেখা দেয়।

নেহরু কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী'র (Separate Electorate) পরিবর্তে 'যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী'র (Joint Electorate) পক্ষে ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ওই তথ্য রিপোর্টের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে আইনসভাগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের মীমাংসাকে নেহরু কমিটির 'বিরাটতম সাফল্য' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই দাবি কার্যত অর্থহীন। কেননা সমগ্র প্রচেষ্টাই অল্পদিনের মধ্যে নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) 'পূর্ণ স্বাধীনতা'কে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু 'নেহরু রিপোর্ট' 'অধিরাজ্যের মর্যাদা' (Dominion Status) প্রাপ্তিকে লক্ষ্য বলে স্থির করে। এটি সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক আপস বা পশ্চাদপসরণ ছিল। সুভাষচন্দ্র এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন ও লিখিতভাবে তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু রিপোর্টে তিনি সই করেছিলেন। কমিটির রিপোর্টের ভূমিকায় তাই লেখা হয়েছিল যে, কমিটির অল্প কয়েকজন সদস্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নেননি। তাঁরা শাসনতন্ত্রের ভিত রূপে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে চাপ দিয়েছেন। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি রিপোর্টে সই করেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি যদি প্রতিবাদী মন্তব্যলিপি পেশ করতাম, তাহলে নানা প্রশ্নে আরও কয়েকটি প্রতিবাদী মন্তব্যলিপি আসত। সেক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা একযোগে একটি মাত্র রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারতেন না। এর ফল হত মারাত্মক।" সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যে সুস্পষ্ট যে, তিনি ঐক্যের স্বার্থে নমনীয় হতে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু মূল নীতি ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে সম্মত ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তিরিশের দশকের

পূর্বেই দেখা দিতে শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে তা বাড়তে থাকে। গান্ধীজি ও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা এর জন্যে সুভাষচন্দ্রের ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁদের অধিকাংশেরই আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর শক্তির উৎস ছিল যুব ও ছাত্র সমাজ, অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রগতিশীল নেতারা।

কংগ্রেসের মধ্যে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রশ্নে প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে মতপার্থক্য কত গভীর হয়ে উঠছিল তার সুস্পষ্ট লক্ষণ 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ইন্ডিয়া'র (Independence League of India) প্রতিষ্ঠায় (নভেম্বর ১৯২৮) দেখা দিয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু। এই দুই প্রগতিশীল তরুণ তখন অনেক কাছাকাছি হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের আসন্ন কলকাতা অধিবেশনের আগে কোনও রকম বিভেদ সৃষ্টি না করে নিজেদের বক্তব্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা ছিল সুভাষ ও জওহরলালের উদ্দেশ্য। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের বাংলা শাখা'র ইস্তাহারে অদূর ভবিষ্যতে অশনিপাতের ইঙ্গিত ছিল। ইস্তাহারের সূচনাতেই বলা হয়: "ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নূতন নেতৃত্বের প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা এমন একটি স্তরে পৌঁছিয়াছি যখন পুরানো নীতি ও কর্মসূচী আর যথেষ্ট নয়...যাহারা পূর্ণ ও অবাধ স্বাধীনতা চায় তাহাদের এখন দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিদায় লইতে হবে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগামীদের একটি দলে সংঘবদ্ধ হইয়া জাতির সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

'দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের' মধ্যে সর্বাগ্রে কে ছিলেন তা অনুমান করা কঠিন ছিল না। 'রক্ষণশীল' প্রবীণ ও 'প্রগতিশীল" নবীনের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই প্রকাশ্য এবং তীব্রতর হয়ে উঠছিল। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

২৪

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মতিলাল নেহরু। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ইতিপূর্বে এত লোকসমাগম, এত বিশাল আয়োজনও হয়নি ও এমন উদ্দীপনা কখনও দেখা যায়নি। আর একটি কারণে কলকাতা অধিবেশন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেটি হল সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও ওই বাহিনীর ভূমিকা। সুভাষচন্দ্র নিজে ছিলেন বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি. ও. সি)। আধা-সামরিক কায়দায় বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়। সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা। বাহিনীতে বাইসাইকেল ডিভিশন, মোটর সাইকেল ডিভিশন, অশ্বারোহী ডিভিশন, সামরিক বাদ্য (Band) ডিভিশন, সাঙ্কেতিক বার্তা (Code Messages) ডিভিশন ছিল। পৃথক নারী বাহিনী ছিল। সকলেই আধা-সামরিক ইউনিফর্ম পরতেন। সুভাষচন্দ্র নিজে সামরিক পোষাকে একটি বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে চেপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি মতিলাল নেহরুকে হাওড়া স্টেশন থেকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে আনা হয়। গাড়িটি ২৮টি সাদা ঘোড়া টেনেছিল। বাহিনীর অফিসাররা সামরিক রীতিতে 'ক্যাপ্টেন' 'মেজর' প্রভৃতি

পদমর্যাদায় পরিচিত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর 'ক্যাপ্টেন' ছিলেন লতিকা ঘোষ। অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিটি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও অভ্যর্থনা করার দায়িত্বভার ছিল সুভাষচন্দ্রের নিজের, তিনি তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহযোগিতায় সব কিছু দেখাশোনা করেন। তাঁর কর্তব্যজ্ঞান ও নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে বহু কাহিনী শোনা যায়। যেমন, বিভাবতী বসু প্রবেশপত্র না আনায় তাঁকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সুভাষচন্দ্রকে এটা জানানোর পরেও প্রবেশপত্র না আনা পর্যন্ত তাঁর মেজবৌদি প্রবেশ করতে পারেননি।

১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের এক গভীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল। যে কোনও জাতির স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সামরিক শক্তির গুরুত্ব কতখানি তা সুভাষচন্দ্র মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পূর্ণ ভারতীয়করণ (Indianization) ছিল তাঁর স্বপ্ন। শুধুই স্বপ্ন নয়— রাজনৈতিক লক্ষ্য। কিন্তু বিদেশী শাসকরা তা কখনই চায়নি। সামরিক বাহিনীর নিচুস্তরে ভারতীয়দের নেওয়া ছাড়া, উচ্চপদে যোগ্যতা থাকলেও ভারতীয়রা উন্নীত ও নিযুক্ত হত না। এই রকম কোনও প্রস্তাব বা দাবি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই নিয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও সুভাষচন্দ্রই প্রথম এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, প্রতিকারেব জন্যে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও তার সর্বাধিনায়ক (G.O.C) সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতের আজাদ হিন্দ বাহিনী ও 'নেতাজির' জন্ম এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামী কার্যকলাপের পূর্বাভাস ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এই পরিস্থিতিতে "ভারতবর্ষকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হলে অবশ্যই এক নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে, এমন এক মানসিকতা যা বলবে যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।" কিন্তু যে মানসিক প্রস্তুতির কথা তিনি বলেছিলেন তা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। অহিংস শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আদর্শে বিশ্বাসী গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের কাছে সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, তার সংগঠন, ভূমিকা কংগ্রেস আদর্শ ও নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। গান্ধীজি নাকি সুভাষের অধিনায়কত্বে গঠিত ও পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেখে মৃদুহাস্যে 'সেলার্স সার্কাস' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীও হয়েছিল। প্রদর্শনীর সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও সম্পাদক ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার।

কলকাতা কংগ্রেসে প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে প্রত্যাশিত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ভেতরের ঐ বিরোধকে 'অপেক্ষাকৃত প্রবীণ' ও 'বামপন্থীদের দল'-এর মধ্যে আদর্শগত মতভেদ বলে বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজির প্রস্তাবে বলা হয় যে, ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যদি নেহরু কমিটি রচিত শাসনতন্ত্রকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়

তাহলে কংগ্রেস তা মেনে নেবে। তা না হলে কর দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে এবং ঐ ধরণের আর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেইমত দেশবাসীকে নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলবে। গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তিনি প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সংশোধনী প্রস্তাবটি আনতে হচ্ছে বলে তিনি দুঃখিত। কিন্তু "এই ঘটনা এক মতভেদের স্পষ্ট লক্ষণ, কংগ্রেসের ভেতরে প্রাচীন এবং নবীন চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক মতভেদ।" জোরাল ভাষায় তিনি বলেন যে, নবীনরা চান প্রবীণরা 'সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলুন'। তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনারা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারেন যে, এই সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের যুক্তিসঙ্গত কোনও সম্ভাবনা আছে ? পণ্ডিত মতিলাল তাঁর ভাষণে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, এমন বিশ্বাস তাঁর নেই। তবে কেন আমরা এই বারো মাসের জন্য পতাকা (স্বাধীনতার) অবনমিত করব ?...দাসমনোবৃত্তিকে জয় কবতে হলে আমাদের স্বদেশবাসীদেব পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অটল থাকতে উৎসাহিত করেই তা হবে।" সংশোধনী প্রস্তাবটিকে সমর্থনেব আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি, প্রশংসা এবং ভক্তি এক জিনিস, আর নীতির প্রতি শ্রদ্ধা অন্য জিনিস। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং তরুণ সামাজকে নতুন চেতনায় অনুপ্রাণিত করুন।" তার প্রত্যুত্তরে গান্ধীজি বলেন, নবীন বাংলা (Young Bengal) এক মস্তবড় ভুল করছে কারণ, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা এক অন্তঃসারশূন্য বাগ্‌বৈশিষ্ট্য মাত্র। "আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে।" এই প্রতিশ্রুতি তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সময়েও দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবটি ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে পরাজিত হয়। ভোটের জয়-পরাজয়ে কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রবীণ-নবীনের মতাদর্শের সংঘাত তীব্রতর হয়েছিল মাত্র। প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন গান্ধীজির তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের অদম্য শক্তি, উৎসাহ, সাংগঠনিক ক্ষমতা, তরুণদের উদ্দীপ্ত করার মতো আকর্ষণী ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে স্নেহ করতেন। কিন্তু তারই সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সুভাষকে সম্পূর্ণ অনুগত রাখার কোনও সম্ভাবনা নেই। সুভাষ নিজের মত ও পথ স্থির করেছেন। তিনি তাঁর নিজের পথেই চলবেন। কিন্তু গান্ধীজির অনুযোগ ছিল, সুভাষ (এবং সেই সময়ে জওহরলালও) গঠনমূলক কাজ ও চিন্তার পরিবর্তে যুব সমাজকে শুধুমাত্র বক্তৃতা, মিছিল ও চমকপ্রদ প্রদর্শনীতে মুগ্ধ করছেন। গান্ধীজির এই সমালোচনা সঠিক ও তথ্যভিত্তিক ছিল না। বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯২৮-১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস রাজনীতির মূলস্রোতের বাইরে এতরকম কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন, তাঁর চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র কত বহুমুখী ছিল তা জানলে বিস্মিত হতে হয়। সুভাষচন্দ্রের ধ্যান-ধারণায় রাজনীতি ও সামাজিক পুনর্গঠন অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমগ্র জাতির মধ্যে জাগ্রত করার জন্যে নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবক শ্রমিক, কৃষক— সর্বস্তরের, সকল মানুষের কল্যাণ, অন্যায়-বৈষম্যের দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সংহতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই দেশ ও জাতিকে গড়ে তুলতে পারে, প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে। সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের এই

আদর্শ ও লক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় সিঞ্চিত ছিল।

কলকাতা কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে সুভাষচন্দ্র শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলন, যুব-ছাত্র আন্দোলন, নারী জাগরণ ও নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ১৯২৬-১৯২৮ সালে ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বহু শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। সমাজবাদী মনোভাব জনগণের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সাম্যবাদী গণ-আন্দোলনের শক্তি উপলব্ধি করতে থাকেন। ১৯২৭ সালে খড়গপুরে রেলওয়ে ধর্মঘটের পরের বছর লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কর্মীরা ধর্মঘট করে। চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া পাটকলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। শ্রমিক অসন্তোষ ও বিপ্লবী তৎপরতার বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে সরকার ১৯২৮ সালে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (Public Safety Bill) পাস করে। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা দেশে ব্যাপকভাবে শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়। বহু বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, পি. সি. জোশী, এস. এ. ডাঙ্গে, মিরাজকার প্রমুখ ভারতীয় এবং জন ব্রাডলে ও ফিলিপ স্প্র্যাট নামে দু'জন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট। এঁদের মীরাট জেলে রাখা হয়। এঁদের বিচার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (Meerut Conspiracy Case) নামে পরিচিতি লাভ করে। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের গিরনি কামগর ইউনিয়নগুলির (Girni Kamgarh Union—Red Flag) উদ্যোগে ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ওই অঞ্চলে সাধারণ ধর্মঘট হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের পাটকলগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ওই সময়ে আরও অনেক শিল্প ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট ডাকার বিরুদ্ধে নানা রকম বাধানিষেধ আরোপ করে 'ট্রেড ডিস্‌পিউটস অ্যাক্ট' (Trade Disputes Act) নামে একটি আইন পাস করা হয়। ১৯৩৩ সালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ ধর্মঘট করতে হবে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে কমিউনিস্টরা বেশি সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেবার চেষ্টা করতে থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনের শামিল হয়ে দলের শক্তি ও প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হওয়া।

সুভাষচন্দ্র শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জামশেদপুরে টাটা আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কসে শ্রমিক ধর্মঘট কয়েক মাস ধরে চলেছিল। এই ধর্মঘট যখন প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে তখন শ্রমিকদের চাপে তিনি এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি পায় ও শেষপর্যন্ত একটি সম্মানজনক মীমাংসা হয়। শ্রমিক আন্দোলনে এটা ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। জামশেদপুরের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, পুঁজিপতিরা পছন্দ করুন আর নাই করুন শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত শক্তি অর্জন করছে। তাকে আর তুচ্ছজ্ঞান করা চলবে না। জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা মানুষের শুভেচ্ছা পেয়েছে তার কারণ, 'ভারতীয়করণ'। কিন্তু কোম্পানীকেও যথার্থ জাতীয় মনোভাবের পরিচয়

দিতে হবে। লিলুয়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটেও সুভাষচন্দ্র জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ধর্মঘটরত শ্রমিকদের সাহায্য করতে। 'ফরওয়ার্ড'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (১ মে, ১৯২৮) তিনি বলেন যে, জাতীয় উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের অভিন্ন সম্পর্ক থাকা দরকার। কলকাতার মেথরদের বেতনবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট পুলিশের সাহায্যে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেওয়ার তিনি তীব্র নিন্দা করেছিলেন। মেথরদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিকার না হওয়ার জন্যেই এই ধর্মঘট হয়েছিল বলে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তার প্রতিফলন হয়েছিল 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ইন্ডিয়া'র বাংলা শাখার ইস্তাহারে (২ অক্টোবর, ১৯২৬)। এতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পত্তির সমবণ্টন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্যে সমান সুযোগের ওপর জোর দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত শিল্প-নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল : বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহ দান ; মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ : শিল্পের পরিচালনা, কর্মচারী নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের বিষয়ে শ্রমিকদের মতামতকে গুরুত্বদান ; শিল্পে বিবাদ ও ধর্মঘট, লক-আউট প্রভৃতি যাতে না হয় তার জন্যে নিরপেক্ষ সালিশী বোর্ড গঠন ; কারখানার শ্রমিকদের জন্যে আট ঘণ্টার কর্মদিবস নির্দিষ্ট করা ; রাষ্ট্র-বেকার ভাতা ও বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করা ; শ্রমিকদের জন্যে অসুস্থতা ও দুর্ঘটনা বীমা ; প্রসূতি কল্যাণ ; শিশুদের জন্যে ক্রেশ ; শ্রমিকদের বাসগৃহ, পর্যাপ্ত ছুটি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইস্তাহারে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে একই রকম ভূমিপ্রথা, সমহারে কর ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বাতিল করা এবং ক্ষতিপূরণের সাহায্যে জমিদারি প্রথার বিলোপের প্রস্তাব করা হয়।

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচী, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন একদিকে যেমন কংগ্রেসের প্রবীণ রক্ষণশীল নেতাদের মনোমত হয়নি, তেমনি কমিউনিস্টদেরও সমর্থন পায়নি। গান্ধীপন্থীরা মনে করতেন রাজনীতির সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন, চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সমস্যা এক করে ফেললে শ্রমিকদের ক্ষতিই হবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা মনে করতেন যে, শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে আনতে হবে। তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না। শ্রমিক, মালিক ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু চরমপন্থী কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রাম, শিল্প শ্রমিকদের শক্তিশালী সংগঠন ও দীর্ঘ ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায় করায় বিশ্বাস করতেন। গান্ধীপন্থী ও সুভাষপন্থী—উভয় পক্ষকেই উগ্র বামপন্থী কমিউনিস্টরা পছন্দ করতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সুভাষচন্দ্র ও স্বরাজ্যপন্থীদের আরও বেশি বিরোধী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য অমলেন্দু ঘোষের 'ভারতে কম্যুনিজম (১৯২০-১৯৮৬)' গ্রন্থে আছে। মুজফ্‌ফর আহমেদের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাকি সুভাষচন্দ্রকে একটি গোপন পত্র পাঠিয়েছিলেন। 'সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকায় মুজফ্‌ফর আহমেদ ওই

চিঠি সুভাষেব সহপাঠী বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তেব হাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওই পত্র সুভাষচন্দ্র গ্রহণ না কবায মুজফ্‌ফব আহমেদ নিজেই তাঁর কাছে যান। সুভায তখন তাঁকে বলেন, যাঁবা তাঁকে চিঠি লিখতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন।

সাইমন কমিশন-বিবোধী আন্দোলনে ও জাতীয কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিস্টরা প্রবেশ কবলেও মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টাবন্যাশনালের ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষে জাতীযতাবাদী সংস্কাবপন্থী বুর্জোযাদেব (যেমন স্বরাজ্যপন্থীদের) বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওযা হয। 'শ্রমজীবীদেব শত্রু 'সংস্কাববাদী' গান্ধীপন্থী ও স্বরাজ্যপন্থীদের 'মুখোশ খুলে দেবাব' জন্যে কমিউনিস্টদেব নির্দেশ দেওযা হয। 'Draft Plan of Action of the Communist Party of India' (ডিসেম্বর, ১৯৩০) নামে 'ডকুমেন্টে' (Document) সোজাসুজি বলা হয যে, ভাবতবর্ষে বিপ্লবেব সবচেয়ে বড় শত্রু হল, কংগ্রেস সম্বন্ধে ভাবতীয জনসাধাবণেব এক বৃহৎ অংশেব 'মোহ'। বিশেষ করে, কংগ্রেসেব মধ্যে বামপন্থীবা গণ-সংগ্রামকে নিযন্ত্রণ বা দমিয়ে বাখাব সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে ও কবছে। ভাবতবর্ষে বিপ্লবেব পথে সবচেযে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক (The most harmful and dangerous obstacle to victoty of the Indian revolution) হল কংগ্রেসেব মধ্যে জওহবলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বামপন্থীবা। এঁদেব 'মুখোস খোলাই' হবে কমিউনিস্ট পার্টিব প্রধান কাজ। এই 'বামপন্থী' জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদেব বিরুদ্ধে 'নির্মম' (ruthless) যুদ্ধ চালিয়ে বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক ও কৃষকদেব কমিউনিস্ট পার্টিব পতাকাতলে আনতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতি ও মনোভাবেব ফলে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অল ইন্ডিযা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এর প্রতিফলন হয়। সুভাষচন্দ্র এর জন্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত হন। AITUC-র কলকাতা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে (৪ জুলাই, ১৯৩১) শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ সম্পর্কে তিনি সোজাসুজি বলেন, বিদেশী কোনও সংস্থা বা "মস্কোর হুকুমের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। ভারতকে উদ্ভাবন করতে হবে তার নিজস্ব পদ্ধতির, তার নিজের পবিবেশ, নিজের প্রয়োজনের মতো করে তৈরি করতে হবে নিজেকে।" রেলকর্মী, চা-বাগানের শ্রমিক, পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের কর্মীদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরির দাবি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। এর জন্যে শক্তিশালী আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা বলেন। পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা শ্রমজীবীদের বিভ্রান্ত করে তুলছে বলে তিনি 'দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী' ও কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করেন। এই দুই দলের মাঝে তিনি নিজেকে তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে, এই দল পুরোদস্তুর সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। এই সমাজতন্ত্র হবে ভারতের নিজস্ব ধরণের— "তার মধ্যে এমন নতুন কিছু, অভিনব কিছু থাকবে, সারা বিশ্ব যার দ্বারা লাভবান হবে।" এর এক সপ্তাহ পরে শ্রমিক সংগঠনে 'মস্কোজাত বিপদের সম্ভাবনা' সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি খোলাখুলি বলেন, "মস্কোর আঁচল ধরে চলতে" ভারতীয় শ্রমিকরা রাজি নন।" কমিউনিস্টরা নিরন্তরভাবে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, শ্রমিক ইউনিয়নে যাঁরা তাঁদের দলভুক্ত নন তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। "মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা ভারতে সুস্থ শ্রমিক ইউনিয়নের বিকাশের পথে

গুরুতর বিপদস্বরূপ।" তিনি অভিযোগ করেন যে, এস. ভি. দেশপাণ্ডের মতো কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতারা চান যে 'জাতীয় কংগ্রেস নিপাত যাক', 'গান্ধী নিপাত যাক' এই আওয়াজে তাঁরাও (সুভাষচন্দ্ররা) গলা মেলান। তিনি কমিউনিস্টদের সোজাসুজি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তা হবে না। "আমাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই নিজেদের প্রকৃত আনুগত্য গোপন করার, ছদ্ম-পরিচয়ে নিজেদের জাহির করার।...আমরা যারা কংগ্রেসকর্মী তারা কংগ্রেসকর্মীই থাকব।" শেষপর্যন্ত যাতে কংগ্রেস ও সারা ভারত শ্রমিক ইউনিয়নের সুসম্পর্ক থাকে তার জন্যে তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের এত খোলাখুলি বিবৃতি ও 'মস্কোর আঁচল ধরে না চলা'র ঘোষণা কমিউনিস্টদের আরও বেশি জাতীয় কংগ্রেস ও সুভাষবিরোধী করে তুলেছিল। এর ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছিল, কমিউনিস্টরা যে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন তা অনেক পরে তাঁরা স্বীকাব করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে জানতে ও বুঝতে কমিউনিস্টরা বড় ভুল করেছিলেন। সে ইতিহাস কয়েক বছর পরের ঘটনা।

২৫

সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনে ছাত্ররা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজন বোধ থেকে ছাত্র-আন্দোলনের জন্ম হয়। প্রথম নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল। এই আন্দোলন খুব দ্রুত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশেও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনেও ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৭-১৯২৮ সালে ছাত্র আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়ে পড়ে। যুব-সমাজেও এক অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয়। এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের। বাংলার জেলায় জেলায় এবং বাংলার বাইরে বহু যুব-ছাত্র সম্মেলন হয়। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল মহারাষ্ট্র, আমেদাবাদ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলন। লাহোর কংগ্রেসের সময় লাহোর শহরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পৌরোহিত্যে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন মালব্যজি। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য ছিলেন।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্র-যুব শক্তিকে জাগ্রত করা। দেশের তরুণদের চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বাত্মক দেশ গড়ার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে তিনি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পাবনা জেলার হিমাইতপুরের আশ্রমে দেখা করেছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের কাছে সুভাষচন্দ্রের পিতা-মাতা দীক্ষিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, সাধু, সন্ন্যাসী, ধর্মজগতের মানুষ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের শৈশব থেকেই গভীর আগ্রহ ছিল। ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একবার অনুকূলচন্দ্রের এক ভক্তের বাগবাজারের গৃহে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ থাকায় দেখা করা সম্ভব হয়নি। হিমাইতপুরের আশ্রমে অনুকূল ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত

জানান। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেশ ও সমাজের নানান সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। সুশীলচন্দ্র বসুর 'মানসতীর্থ পরিক্রমা' গ্রন্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে। দেশ ও মানুষ গড়া, বিবাহ-সংস্কার, আদর্শ শিক্ষা, পরিবার-পরিজন সহ আশ্রম-জীবনযাপন ইত্যাদি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল। অনুকূলচন্দ্রের 'সৎসঙ্গ' আশ্রম দেখে সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আব একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু একান্তে কোনও কথা বলার সুযোগ হয়নি।

পূর্ববঙ্গে নিজেব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, তিনি কেমনভাবে সুদূব গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছিলেন তার চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করি। ঘটনাটি সাবিত্রীপ্রসন্নেব স্মৃতিচারণে আছে। একবার সুভাষ ও তাঁব কিছু সহকর্মী এক দুঃসহ গ্রীষ্মের দিনে পদ্মানদীর খেয়াঘাটে হাজির হন নদী পার হতে। আকাশে তখন ঘন কালো মেঘ। সে দিকে তাকিয়ে মাঝি সুভাষচন্দ্রকে বললে, "বাবু, আমাব মনে হয় একটু অপেক্ষা করাই ভাল।" সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন, "কেন ? তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?" মাঝি বলল, "না, বাবু। আমি নিজের জন্যে ভয় পাই না। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু আপনারা যাত্রী। আপনাদের জন্যেই আমায় সাবধান হতে হবে।" নৌকা পাড়ি দিল বিশাল দুরন্ত পদ্মার বুকে। কথায় কথায় সুভাষ জানতে পারলেন, মাঝি পদ্মার জলে তার এক পুত্রকে হারিয়েছে। শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মুখে ফুটল বিষাদের ছায়া। একটু পরে তিনি মাঝিকে একটি গান ধরতে বললেন। মহা উৎসাহে গান ধরল মাঝি। গানের মূল কথা : 'নদীর তল পেতে হলে গভীরে ঝাঁপ দিতে হবে। আর, ঝাঁপ দিতে যদি ভয় না হয় তাহলে ঝড়ের ভয় কিসের ? নদী যখন বাঁধ ভাঙে তখন বাঁধভাঙা জল দুকূল ছাপিয়ে যায়। দূরের যাত্রী ! গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে হলে তোমাকে মাঝে মাঝে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতেই হবে।' মাঝির ভরাট গলার ভাটিয়ালি শুনে সুভাষ সহযাত্রীদের বললেন, 'তোমরা কেউ শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পার ?' সবাই চুপ করে রইল। তখন সুভাষ নিজেই শুরু করলেন গান :

কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে,
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে,
তোর হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে।

হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁর মনে এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের অমর কবিতাটি 'Kali The Mother' (মৃত্যুরূপা মাতা)-এর কয়েকটি ছত্র :

করালি ! করাল তোর নাম. মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

গ্রামে পৌঁছে সুভাষচন্দ্র রাত কাটিয়েছিলেন এক দরিদ্র মুসলমান কংগ্রেস কর্মীর গৃহে। কোনও বিত্তবান নেতার আতিথেয়তা গ্রহণ করেননি। গ্রামের সব মানুষ মুগ্ধ

বিস্ময়ে দেখেছিল সৌম্যদর্শন, মৃদুভাষী, পরিশীলিত, গভীর দরদী মনের এক মানুষকে।

ছাত্র-যুব আন্দোলনের পাঁচটি দিকের ওপর সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন : রাজনৈতিক ; সামাজিক ; অর্থনৈতিক ; শারীরিক ; সাংস্কৃতিক। এই সবকটি ক্ষেত্রে দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করা এবং আত্মশক্তি ও আত্মপ্রকাশকে প্রেরণাদান হবে যুব-ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য। প্রয়োজনে নির্মম ধ্বংস ও তারপর নতুন সৃষ্টিই হবে ছাত্রজীবনের আদর্শ। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভূমিকা এবং ক্রমেই ওই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় অনেকে সন্তুষ্ট হননি। তাঁদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, সবার আগে প্রয়োজন শৃঙ্খলা। আর, তার জন্যে চাই সামরিক শিক্ষা। প্রয়োজন, নিজের দল (কংগ্রেস) সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, স্বদেশের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'ইউনিফর্ম' বা 'উর্দি' পরা নিয়ে প্রবীণ গান্ধীবাদীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "কটি বস্ত্র (স্পষ্টতই গান্ধী পোষাক) এই আনুগত্য অথবা শৃঙ্খলা আনতে পারে না। এই কারণেই আমি জোর দিয়ে বলছি যে, গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।" এই রকম কঠোর প্রকাশ্য সমালোচনা স্বয়ং গান্ধীজি ও তাঁর ভক্তদের ক্ষুব্ধ করেছিল। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে সুভাষের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, তাঁর সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ, আকর্ষণ, শ্রদ্ধা অনেককেই বিচলিত করে তুলছিল। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন, সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে ও উদ্দীপ্ত বক্তৃতার প্রভাবে ছাত্র ও যুবকরা বিপথগামী হবে, কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি এই সময় আরও প্রকাশ্য হয়। এর প্রভাব ছাত্র সংগঠনেও পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ মাঝে মাঝেই কুৎসিত রূপ নেয়। এর পিছনে ছিল কিছু নেতাদের প্ররোচনা। কোনও কোনও পত্র-পত্রিকা এবং রাজনৈতিক নেতারা এর জন্যে সুভাষচন্দ্রকে দোষারোপ করেন। সুভাষচন্দ্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেন যে, ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল ও বিবাদ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিবাদের ফল। যেহেতু প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করছেন তাই তাঁর বিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছেন। কিন্তু এতে তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না। ছাত্র আন্দোলন ও ঐক্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক জগতের এসব কৌশলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। ছাত্রদের এবং ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর মনোভাব ও সহানুভূতি আগে যেমন ছিল, চিরকালই তা থাকবে।

সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেসে যে দুঃখজনক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সুভাষচন্দ্র গভীর বেদনা বোধ করতেন। তিক্ত বিবাদের মধ্যেও সুভাষচন্দ্র কীভাবে তাঁর চিত্তের ঔদার্য হারাননি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণে। বীরভূম কংগ্রেসের বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তারাশঙ্কর সুভাষচন্দ্রের অনুগত এক নেতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন শুনে সুভাষচন্দ্র তারাশঙ্করকে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে অনুরোধ করেন। দেখা হলে সুভাষচন্দ্র তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কেন সাক্ষী দেবেন ?" উত্তরে তারাশঙ্কর বলেন, "আমরা যারা কংগ্রেসকর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না।...তাই সত্য বলতে সাক্ষী

দেব আমি।" বলেই, তারাশঙ্কর ভাবলেন সুভাষ উষ্ণ হয়ে উঠবেন। মুহূর্তের জন্যে সুভাষচন্দ্রের সুন্দর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, টকটকে রঙ লাল হয়ে গেল। পর মুহূর্তে প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল। বললেন, "নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সব সাধনাই পশু হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই।" পরে তারাশঙ্করের মুখে সব ঘটনা শুনে তিনি তাঁর অনুগত স্থানীয় নেতার আচরণের জন্যে দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করে বলেন, "এঁরা আমাকে ছোট করেছেন, কলঙ্কভাগী কবেছেন।" তারাশঙ্কর এরপর নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।" তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী' উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

সব নিন্দা-সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের প্রতি যুব-ছাত্র সমাজেব শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনুগত্য এতটুকু কমেনি। বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাগ্রত যুব সমাজ ও যুব শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁকে দেখার জন্যে, প্রণাম করার জন্যে, তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে হইচই পড়ে যেত। মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীতে ছাত্র সম্মেলনে (১ ডিসেম্বর, ১৯২৯) সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "তোমাদেব কেউ কেউ আমাকে হয়তো বাস্তবসম্পর্কবিহীন দিবা-স্বপ্নে মশগুল বলে ভাববে। যদি সেই কারণে আমাকে বর্জন কর তবে আমি অসহায়। এই অপরাধ আমাকে মেনে নিতে হবে এবং প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিতে হবে যে বাস্তবিকই আমি দিবাস্বপ্নবিলাসী। আমি কোন্ স্বপ্নে বিভোর একের পর এক তা তোমাদের কাছে উদঘাটিত করেছি..এই স্বপ্নগুলি হতেই আমার জীবনের প্রেরণা ও শক্তি আহরণ করে থাকি। এই স্বপ্ন বর্জিত হলে আমার জীবন অর্থহীন মাধুর্যহীন হয়ে আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠতো, শুধু তাই নয়, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও শূন্যগর্ভ দর্শনরূপে পর্যবসিত হত।... স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমার অতি প্রিয় স্বপ্ন।" এই স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে তিনি তরুণ-তরুণীদের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং যে সাড়া তিনি পেয়েছিলেন তা ইতিপূর্বে ও পরে অন্য কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রনেতা পাননি। সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের ভারত লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীরও স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার তথা ভারতীয় নারীর অসাধারণ অবদান শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব থেকেই। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে মেয়েদের যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হয়। বাংলার নারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে আসতে শুরু করেন। নারী জাগরণ ব্যাপকতর হয়। সাইমন কমিশন-বিরোধী বয়কট আন্দোলন এবং ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র মেয়েদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে 'নারী ডিভিসন'-এর উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ, অরু সেন প্রমুখরা মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজে এগিয়ে আসেন। লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে বহু ছাত্রী ও সাধারণ নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেন। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরুকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে রাজপথে বেরিয়েছিল তাতে মার্চ করেছিলেন বহু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নারী। প্রকাশ্য রাস্তায় নারীদের ওইভাবে শোভাযাত্রায় যোগদান করা

ছিল এক দুঃসাহসিক ঘটনা। বাংলার নারী সেদিন দেখিয়েছিলেন যে, ঘরের কাজ ও বাইরের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ একই সঙ্গে তাঁরা করতে পারেন। সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতার কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 'ছাত্রীসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢাকাতে লীলা নাগ এর আগেই (১৯২৩) গড়ে তুলেছিলেন দীপালি সঙ্ঘ। এঁরাই শুরু করেন মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি এবং 'জয়শ্রী' পত্রিকা। এই সংগঠনের সদস্যারা বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গেও ক্রমে ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন। অনিল রায় ১৯২৪ সালে 'শ্রীসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করার পর স্বাধীনতাকামী নারীরা এই বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। লীলা নাগ (রায়) ও অনিল রায় উভয়েই সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে ওঠেন।

খড়্গ বাহাদুব নামে এক নেপালী যুবক একজন বিপন্না নারীর সম্মান বাঁচাতে গিয়ে এক দুর্বৃত্তকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁর এই শাস্তি বাংলায় তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সভা-সমিতিতে তাঁর সাহস ও বীরোচিত কাজের প্রশংসা করা হয়। কারামুক্ত হলে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সুভাষচন্দ্র বাংলার যুবকদের খড়্গ বাহাদুরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান করেন। কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত খড়্গ বাহাদুর অভিনন্দন সভায় (৭ এপ্রিল, ১৯২৯) সুভাষচন্দ্র বলেন যে, বীরত্বের সম্মান না জানাতে শিখলে কোনও জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না। সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য করে সুভাষচন্দ্র বলেন, মেয়েদের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্যে অলঙ্কার রূপে তাঁদের সবসময় ছোরা রাখতে হবে। নারীশক্তির বোধন না হলে দেশের মুক্তি হবে না। অসংখ্য জনসভায় সুভাষচন্দ্রের ভাষণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীমুক্তি, নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষের সমমর্যাদার ওপর গুরুত্বদান। সর্বপ্রকার কৃত্রিম বৈষম্যের অবলুপ্তি, পুরুষের দাসত্ব থেকে নারীর মুক্তি না হলে জাতির প্রকৃত মুক্তিলাভ অসম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গড়ে তুলে ঘরে ঘরে স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতার বাণী প্রচার করতে হবে। বাংলার নারী বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক জেরাল্ডাইন ফরবস্ (Geraldine Forbes) বলেছেন যে তাঁদের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ছিলেন নারী অধিকারের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, তাঁদের উৎসাহ অনুপ্রেরণার জীবন্ত মূর্তি। তাঁর মতে নারীবাদের (feminism), অর্থাৎ নারীর অধিকার, তার নিজের জীবনগঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের যে আন্তরিকতা ছিল, যে ভূমিকা ছিল তা যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও আমূল সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু সমাজের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, হিন্দুরা মাতৃমূর্তির মাধ্যমে আরাধনা করে বলে গর্ব করে। কিন্তু ক'জন হিন্দু 'বুকে হাত দিয়ে' বলতে পারে তারা মাতৃজাতিকে সত্যিই সম্মান করে, তাদের সম্মান রক্ষা করে? যদি তা করতো তাহলে সমাজে এত নারী-লাঞ্ছনা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটতো না। ছাত্রদের তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমরা হয়তো ইংরেজদের ঘৃণা কর। কিন্তু ইংরেজরা যেমন তাদের নারীজাতিকে সম্মান করতে জানে, তা তোমাদের তাদের কাছে শিক্ষা করা উচিত।" সমাজে পরিবর্তন আনায়, নারীকে সম্মান ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করায় ছাত্রদের দায়িত্ব আছে।

বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে। স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের (অর্থাৎ অবিবাহিত থাকার) অধিকার দিতে হবে, তাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হবে। ব্যায়াম শিক্ষার, লাঠি ও ছোরা খেলার শিক্ষা দিতে হবে। সাবলম্বী হবার মতো অর্থকরী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ছাত্র-যুবক সমাজকে সতর্ক করে বলেন যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করার জন্যে কারাবাস বা অন্য নির্যাতন হয়তো সহ্য করতে হবে। কিন্তু এর জন্যে সকলের সহানুভূতি ও ভালবাসা পাওয়া যায়। যাঁরা সমাজ বিপ্লবের জন্যে চেষ্টা করেন তাঁদের বিপদ অনেক বেশি। ঘরে, বাইরে, নিজের আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই করতে হয়। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয় দিন-রাত। অথচ সমাজের সহানুভূতি কোনওদিন তাঁরা পান না।

কোনও রাজনৈতিক নেতা নির্মম নিষ্ঠুর সত্য এত গভীরভাবে উপলব্ধি করে নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন কি না, এমন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা অন্য কোনও নেতার ছিল কি না তা সন্দেহ। সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কর্মসূচী সুভাষচন্দ্র স্থির করেছিলেন প্রায় সাত দশক আগে (এবং তা কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন), তা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও ভারতে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; রাস্তা ও কুয়া ব্যবহারে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার ; মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশাধিকার ; আন্তঃবর্ণ ভোজন ; আন্তঃবর্ণ বিবাহ ; পর্দা-প্রথার অবসান ; নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ; পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহের নিম্নতম বয়ঃসীমা বেঁধে দেওয়া ; পণপ্রথা নিষিদ্ধ করা ; পেশাদার পুরোহিত ছাড়াই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ দান। সুভাষচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন। রক্তের সংমিশ্রণের ফলে জাতি পুনর্জীবন লাভ করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও মানব-বিজ্ঞানীদের (Anthropologists) অভিমতের ভিত্তিতে তিনি বর্ণসংকরের ভয় অমূলক বলে মনে করতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, সুভাষচন্দ্র তাঁর সমাজ বিপ্লব ও সামাজিক গণতন্ত্রের কর্মসূচী কার্যকর করার জন্যে কতটুকু সক্রিয় হয়েছিলেন ? ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী সুভাষচন্দ্রের এটাও ছিল এক অলীক আশা মাত্র। এর উত্তর প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৯৩৩ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই গান্ধী-সুভাষ মতভেদ কংগ্রেসের মধ্যে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট সৃষ্টি করে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে সুভাষচন্দ্রের নিজের জীবনে ও বিশ্বের ইতিহাসে এক নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। সামাজিক বিপ্লব ওই পরিস্থিতিতে আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনায় নেতাজি সুভাষ দেখিয়েছিলেন যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা। বীরাঙ্গনা ভারতীয় নারীর আদর্শ তাঁর কাছে শুধুই স্বপ্ন ছিল না। এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন ঘটলে তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক আদর্শ ও কর্মসূচী তিনি কতখানি রূপায়িত করতে সক্ষম হতেন সেটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কর্মবহুল, চাঞ্চল্যকর ঘটনাবহুল অধ্যায়। নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মেলনে (১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮) সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কর্মীদের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, ভাবতীযদের কাছে এখন Marxism, Socialism, Bolshevism প্রভৃতি কোনো 'ism'ই নয়— একমাত্র Nationalismই গ্রহণযোগ্য। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে আদর্শ-নিষ্ঠার অভাবের জন্যে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজকে দায়ী করেন। বেকার যুবকদেব চাকরির সন্ধান করার বদলে ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশের কথা বলে নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন মাড়োয়ারিদের সাফল্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি পল্লী সংস্কাব, উন্নযন ও স্ব-নির্ভরতা, বন্যা-দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে গবেষণা ও তাঁর প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দেশকে উজ্জীবিত করার জন্যে আহ্বান জানান। ১৯২৯ সালের সূচনায় তিনি কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতির পর্যালোচনা কবে প্রস্তাব কবেন যে, আগামী দু'মাসের মধ্যে নতুন পাঁচ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য করতে হবে, দু' লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি শহরে এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ কবতে হবে।

সুভাষচন্দ্র যা বিশ্বাস করতেন, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করতেন তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে কোনও দ্বিধা কবতেন না। এর প্রতিক্রিয়া কী হবে, তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি না হ্রাস পাবে, নিজেব বাজনৈতিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তা কবতেন না। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, প্রয়োজন-ভিত্তিক আপস, 'আবহাওয়া' বুঝে নিজের নীতি ও কর্মসূচী সংশোধন করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেব প্রশ্নে, মুসলমানদের কর্পোরেশনে চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রভাবশালী প্রবীণ নেতাদের প্রকাশ্য বিরোধিতায়, সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটি বারবার ফুটে উঠেছিল। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার প্রশ্নটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে হিন্দীকে স্বীকার করার ব্যাপারে বাংলা দেশে ও দক্ষিণ ভারতে যে প্রবল আপত্তি আছে তা কারও অজানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার পক্ষে জোরাল যুক্তি দিয়েছিলেন। হিন্দির প্রচারের ফলে মাতৃভাষার উচ্ছেদের আশঙ্কাকে তিনি 'অমূলক' মনে করে বাঙালি যুবকদের হিন্দী শিখতে বলেছিলেন। প্রাদেশিক বা মাতৃভাষার চর্চার গুরুত্বের ওপর জোর দিলেও, সুভাষচন্দ্র নির্ভীকভাবে বলেছিলেন, "অদূর ভবিষ্যতে হিন্দী স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষা হবে" (৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৮)। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বাংলার চিন্তা ও সাধনার কথা অন্যান্য রাজ্যেব মানুষকে জানানো প্রয়োজন। তার জন্যে হিন্দীভাষা জানা একান্তই প্রয়োজন। এরকম সাহসী বক্তব্য সমসাময়িক কালে কোনও অ-হিন্দীভাষী নেতার পক্ষে বলা দুরূহ ছিল। সুভাষচন্দ্রের মতো একজন নেতার পক্ষেই তা সম্ভব ছিল।

গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কী ছিল তা কিছুটা জটিল ও বিতর্কিত বিষয। বিপ্লবী কর্মতৎপরতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ সম্পর্কে সরকার ও গোযেন্দা বিভাগেব বরাবরই গভীর সন্দেহ ছিল। বিনা বিচারে তাঁকে মান্দালয় জেলে দীর্ঘকাল বন্দী করার পিছনে ছিল এই সন্দেহ ও আতঙ্ক। এর জন্যে গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ আনতে এবং রিপোর্ট দিতেও দ্বিধা করেনি। ১৯২৮ সাল থেকে বিপ্লবী তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হবাব পরই তাব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' দলের কয়েকজন সদস্যের কাকোরীর কাছে একটি ট্রেনে ডাকাতির চেষ্টা (৯ আগস্ট, ১৯২৫)। কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়েন ও তাঁদের বিচার 'কাকোবী ষড়যন্ত্রের মামলা' নামে খ্যাত হয়। বিচারে রামপ্রসাদ, বিসমিল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোশনলাল ও আসফাক্-উল্লার ফাঁসির আদেশ হয়। কযেকজনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। উত্তর ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' বিপ্লবী দলটিকে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামে পুনর্গঠিত করেন। এই দলের ভগৎ সিং সন্ডার্স নামে এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেন (১৭ নভেম্বর, ১৯২৮)। কয়েকমাস পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লিতে আইনসভা কক্ষে দু'টি বোমা বিস্ফোরণ করেন (৮ এপ্রিল, ১৯২৯)। ওই সময় আইনসভায় দমনমূলক 'ট্রেডস্ ডিসপিউট বিল' সম্বন্ধে বিতর্ক হচ্ছিল। তাঁরা দু'জনে পালাবার কোনও চেষ্টা কবেননি, কেননা ওঁরা চাননি নিরীহ লোকেদের ওপর কোনও অত্যাচার, নির্যাতন হয়।

দিল্লির আইনসভা কক্ষে বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ লাহোর ও সাহারানপুরে দু'টি বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে। বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা 'লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা' (১৯২৯) নামে খ্যাত হয়। এই বিচার চলাকালেই অভিযুক্ত বিপ্লবীরা জেলের দুঃসহ অবস্থা ও বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন। অন্য সব বন্দী অনশন ত্যাগ করলেও যতীন দাস আমৃত্যু অনশন করে ৬৪ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)। একই সময়ে বরিশালে সতীন্দ্রনাথ সেন অনশন শুরু করেন। দীর্ঘ অনশনের পর সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। তাঁর অনশনও ব্যাপক উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশ কালই কারান্তরালে কেটেছিল। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড এবং অনেকের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। যতীন দাসের অনশন ও মৃত্যু এবং ভগৎ সিং ও তাঁর সহ-বিপ্লবীদের ফাঁসি সারা দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে মর্মাহত হন। এর প্রতিফলন গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী মতাদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য মনোভাবের উল্লেখ প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন মান্দালয়ে বন্দী রাখার পর যখন মুক্তির প্রশ্নটি সরকারের বিবেচনাধীন তখন পুলিশ বিভাগই প্রবল আপত্তি জানায়। বিলেতে হাউস অফ কমন্স-এ লর্ড উইন্টারটন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের বিপক্ষে যুক্তি দেখান যে, বন্দীরা বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যার ষড়যন্ত্রে দোষী। এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জানান যে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ হল তাঁরা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন। নিজে মুক্ত হবার পর সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে জোরাল আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এঁদের মধ্যে বিপ্লবী বন্দীরাও ছিলেন। রাজবন্দীদের মুক্তি সমস্যাকে তিনি 'জাতীয় পরাধীনতার প্রতীকী সমস্যা মাত্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। রাজশাহী শহরে এক বিশাল জনসমাবেশে তিনি বলেন যে, মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৭) বিপ্লবী কাজকর্মের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর একটি জনসভায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আত্মশক্তির বিকাশের প্রয়োজন প্রসঙ্গে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্জুনের ক্লৈব্যের উল্লেখ করে বলেন, "ক্লৈব্য এসে আমাদের দেশকে আজ আক্রমণ করেছে। এমনি ক্লৈব্য একদিন কুরুক্ষেত্র-সমরের পূর্বে অর্জুনকেও আক্রমণ করেছিল। এই ক্লৈব্যের জন্যই অর্জুনের মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। দেশের অনেক লোকের মনে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সংশয় জাগে, তার কারণ অর্জুনের ক্লৈব্য।" প্রায় সাংকেতিক ভাষায় হলেও সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণের ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট।

'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ও সমর্থক ছিলেন। বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স (Bengal Volunteers)-এর হেমচন্দ্র ঘোষ ও জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, চট্টগ্রামের সূর্য সেন (মাস্টারদা) প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স'-এর (সংক্ষেপে বি. ডি. নামে পরিচিত) আসল লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও তরুণ বিপ্লবীদের অনেকেই ঐ সময় যোগ দিচ্ছিলেন। ভগৎ সিং ও সূর্য সেনও কংগ্রেসের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্যে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০) নেতা মাস্টারদা ও তাঁর বেশ কয়েকজন সহ-বিপ্লবী কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অনন্ত সিং ও আরও কয়েকজন অভিযুক্ত বিপ্লবীর পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে সরকারি ও পুলিশ মহলে সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যে, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র দুই ভাই-ই বিপ্লব-আন্দোলনের সমর্থক ও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের গোপন যোগাযোগ আছে।

শহীদ যতীন দাসের কারাগারে অনশনে মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পেয়েছিল তিনি কত গভীরভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা করতেন। যতীন দাস ১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে কাজ করেছিলেন। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কলকাতা তরুণ সমিতি, দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটি এবং কয়েক বছর পরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতেও 'মেজর' যতীন দাস সক্রিয় ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন। লাহোর জেলে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা অনশন শুরু করলে যতীন্দ্রনাথ প্রথমে

অনশন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "অনশন ধর্মঘট কাকে বলে তা আমি জানি। তোমাদের সে সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি যদি অনশন ধর্মঘট শুরু করি তবে শেষ পর্যন্ত তা চালিয়ে যাব।" যতীন দাস মৃত্যুবরণ করে তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ শিক্ষা দিয়ে গেছেন কর্ম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে জয় করা যায়। মৃত্যুর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ বলে যান বাঙালি রীতিতে তাঁর শেষ কাজ যেন করা না হয়। কারণ, "আমি বাঙালি নই। আমি একজন ভারতীয়।" যতীন্দ্রনাথের মৃতদেহ ট্রেনে করে কলকাতায় আনা হয়। সুভাষচন্দ্র ও কিছু স্বেচ্ছাসেবক সারা রাত শবাধারের পাশে প্রহরায় ছিলেন। পরের দিন সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতারা খালি পায়ে সহস্র সহস্র মানুষের শোক মিছিলের নেতৃত্ব দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর এত বড় শোক মিছিল আর কলকাতা মহানগরীতে হয়নি।

যতীন দাসের আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে গান্ধীজি নীবব ছিলেন। এই নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। বহু মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজির নীরবতার কারণ ছিল, তিনি বিপ্লবী সংগঠনগুলিব কর্মতৎপরতা এবং লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন সমর্থন করেননি। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র বারবার তারবার্তা পাঠিয়ে গান্ধীজিকে একটি বাণী পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি কোনও বাণী পাঠাননি। তিনি যতীন দাসের মৃত্যুকে 'ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা' (Diabolical Suicide) বলে মনে করেছিলেন। জানি না, গান্ধীজি সত্যিই ওইরকম কথা বলেছিলেন কি না। সাবিত্রীপ্রসন্ন 'diabolical' শব্দটির অনুবাদ করেছেন 'ইচ্ছাকৃত'। কিন্তু এই ইংরাজি শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ হল 'শয়তানসুলভ'। কথাটি খুবই খারাপ, নিন্দনীয়। গান্ধীজি বাক্য ব্যবহারে সাধারণত খুবই সংযমী ও বিচক্ষণ ছিলেন। যাই হোক, তিনি যে যতীন্দ্রনাথের আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্তের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না এটা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবীদের নীতি ও রাজনৈতিক পথ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন সময়ের মন্তব্যের মধ্যে একটা স্ব-বিরোধ দেখা দিত। তিনি গোপীনাথ সাহা, যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে নীরব ছিলেন। একটিও প্রশংসাসূচক কথা বলেননি। কিন্তু ভগৎ সিং-এর ফাঁসির পর তিনি তাঁর সাহস ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করেছিলেন। একাধিকবার বিভিন্ন পটভূমিতে গান্ধীজি 'ক্ষাত্রধর্ম', কাপুরুষতার চেয়ে অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শের জন্যে যুদ্ধে প্রাণবিসর্জনের কথা বলেছেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেই তাঁর নানা সময়ে নানা অর্থবহ মন্তব্য আছে। বিপ্লব আন্দোলন যখন ব্যাপক হয়ে উঠেছে সেই সময় গান্ধীজির কিছু কিছু বক্তব্য পুলিশ ও সরকার-সমর্থক সংবাদপত্রকে বিভ্রান্ত করেছিল। যেমন, 'স্টেটস্‌ম্যান' মন্তব্য করে (২৮ আগস্ট, ১৯৩০) যে, কংগ্রেসের কার্যকলাপ আর বিপ্লবীদের অপরাধমূক কাজের মধ্যে সঠিক তফাৎ বোধগম্য হচ্ছে না। গান্ধীজি প্রবল উৎসাহে অহিংস পথের কথা প্রচার করছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন সব কথাবার্তাও বলছেন যা মাথা গরম যুবকদের ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে সংক্ষিপ্ত সহজতর পথ (short-cut) নিতে উৎসাহিত করছে।

সুভাষচন্দ্রের ১৯২৯-১৯৩২ সালের বক্তৃতা ও কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করলেও বিপ্লবীদের নীতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক আপাত স্ব-বিরোধ

লক্ষ্য করা যায়। একাধিকবার প্রকাশ্য বিবৃতি ও ভাষণে তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কাজের প্রতি তাঁর যে সমর্থন নেই তা ব্যক্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মাত্র ক'দিন আগে যতীন দাসের মৃত্যু ও শোকযাত্রা কলকাতার ও সারা দেশের মানুষকে বিহ্বল ও উত্তেজিত করেছিল। বক্তৃতার শুরুতেই সুভাষচন্দ্র তার উল্লেখ করে যতীন্দ্রনাথের জীবন 'দধীচির তপস্যাসিদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। নিজের অস্থিপুঞ্জ দিয়ে যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে গেছেন বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কিন্তু একই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "জানি না দেশে এখনো এমন লোক আছেন কি না যারা মনে করেন যে আড়াইখানা বোমা ও দেড়খানা পিস্তলের দ্বারা তাঁরা ভারত উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু ভারতের উদ্ধার সাধন অত সহজ নয়। আড়াইখানা বোমা ও দেড়খানা পিস্তলের দ্বারা Terrorism করা যায়। কিন্তু করা যায় না Revolution। Terrorism ও Revolution এক কথা নয়। Terrorism মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে; কিন্তু Revolution সম্ভব হবে শুধু সেই দিন, যেদিন সমগ্র জাতি জাগবে।" বিপ্লব অস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে, কিংবা বিনা অস্ত্রেও হতে পারে। পৃথিবীতে রক্তপাতহীন বিপ্লবের দৃষ্টান্ত আছে। নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করে তিনি বলেন, Terrorism (সন্ত্রাসবাদ)-এর যুগ চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন গণ-সংগঠন (mass organization)। যেখানে অত্যাচার, যেখানে কায়েমী স্বার্থের (vested interest) প্রতিকূলতা— সেখানেই আন্দোলন শুরু করতে হবে। "হয়তো কখনো সমাজের উচ্চবর্ণদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে হবে; হয়তো কখনো ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গরীব চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন চালাতে হবে; হয়তো কখনো রাষ্ট্রীয় দাবি আদায় করবার জন্যে আইন অমান্য বা খাজনা বন্ধ করতে হবে... যেদিন জাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারব সেইদিনই আমরা আমাদের সহযোগিতা ও সহায়তা প্রত্যাহার করে বন্দুক-কামান-বিশিষ্ট আমলাতন্ত্রকে বিনা অস্ত্রেই আমাদের পদানত করতে পারব।"

সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণটি বিপ্লব আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। খুব স্পষ্টতই তিনি ব্যক্তিসন্ত্রাসকে সমর্থন করছিলেন না। এর সার্থকতা আর নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আদর্শ ও পথকে তিনি অনেক বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সরকারি খাজনা বন্ধ আন্দোলন (যেমন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পশ্চিম ভারতের বারদৌলিতে কৃষকরা করেছিলেন) গান্ধীজির সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ এবং শক্তিশালী জনমত ও সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব বলে তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল। গান্ধীজির নীতি ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর সংশয় থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ আস্থা হারাননি, হতাশ হননি। আরও অপেক্ষা করে আন্দোলনের অগ্রগতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। পঞ্জাবে ছাত্র সম্মেলনে (১৯ অক্টোবর, ১৯২৯) তিনি পাঞ্জাবী ছাত্রদের বলেন, "স্বাধীনতার সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সময় এসে গেছে।" অন্যরা সঙ্গে আসুক না আসুক, হাজার হাজার মানুষ এই সেনাদলে যোগ দেবে। এই

সেনাদলের যুদ্ধনীতি কী হবে সে বিষয়ে তিনি খুব সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তবে তাঁর মনে যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। শেষপর্যন্ত যদি এইসব উপায়ে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত না হয় তাহলে তিনি দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের কোনও বিকল্প পথ নেই বলে স্থির করে ফেলেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়সীমা বলতে তাঁর মনে হয়েছিল আসন্ন ইউরোপীয় যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক দশক পূর্বেই তিনি বুঝেছিলেন ওই যুদ্ধ অনিবার্য। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তখনই হবে প্রকৃষ্ট সময়— এই অভিমত তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি-সন্ত্রাস এই পরিস্থিতিতে ফলপ্রসূ হওয়ার বদলে ক্ষতিকর হবে বলে তিনি মনে কবছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেম, প্রবল স্বাধীনতাস্পৃহা, দুর্জয় সাহস ও আত্মবলিদানের সঙ্কল্পকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সে কথা প্রকাশ্যে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করতে তাঁর কোনও ভয ছিল না।

বিনয-বাদল-দীনেশেব রাইটার্স বিল্ডিং-এ আক্রমণের ঘটনার (৮ ডিসেম্বর, ১৯৩০) সময়ে সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় সুস্পষ্ট হয়েছিল কতখানি শ্রদ্ধা তিনি করতেন দুঃসাহসী মৃত্যুভয়শূন্য বিপ্লবী তরুণদের। ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের ছাত্র বিনয় বসু পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করে আত্মগোপন করেন। কয়েক মাস পরে বিনয় ও তাঁর দুই বিপ্লবী বন্ধু বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার বাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে কারাগার মহাপরিদর্শক (I.G. of Prisons) সিম্পসনকে হত্যা করেন। আর একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার তাঁদের গুলিতে আহত হন। পালানো অসম্ভব বুঝে তিনজনই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাদলের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। বিনয় কয়েকদিন পরে হাসপাতালে মারা যান। দীনেশ সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁর বিচার ও ফাঁসি হয়। এই ঘটনা 'অলিন্দ যুদ্ধ' নাম খ্যাত হয়ে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তখন সুভাষচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালের মেয়র পদের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র ৩৭-৪৬ ভোটের ব্যবধানে উদারনৈতিক দলের প্রার্থী বি. কে. বসুর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় সদস্য, কিছু নির্দল, উদারনৈতিক দল ও কিছু মুসলমান এবং কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কাউন্সিলাররা জোটবদ্ধ হয়ে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র জেলে থাকাকালেই কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। ১০ ডিসেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র সুভাষচন্দ্র রাইটার্স আক্রমণের ঘটনাটিকে 'বেদনাদায়ক' বলে অভিহিত করে বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করছে কংগ্রেস কর্মসূচী ও কংগ্রেস নেতারা দেশের তরুণদের পুরোপুরি প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তরুণদের শুধুমাত্র 'বিপথগামী যুবক' বলে চিহ্নিত করলে হবে না। কেন এমন ঘটল তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রধান কারণটি হল, ভারত স্বাধীনতা চায় এবং তা অবিলম্বে চায়। প্রয়োজনে কংগ্রেসের পথ ছাড়াও "যে-কোনও মূল্যে ও যে-কোনও পন্থায়" তারা স্বাধীনতা পেতে চায়। কংগ্রেস 'অহিংসায় অঙ্গীকারবদ্ধ'। কিন্তু গান্ধীজি থেকে শুরু করে সাধারণ কংগ্রেস কর্মী তাঁদের কর্মসূচীর মাধ্যমে সকলকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, অহিংসার পথে স্বাধীনতা অচিরে আসবে। তাঁর ভাষণের পরিশেষে সুভাষচন্দ্র বলেন যে,

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও সহজতম পথ হল অহিংসার পথ। কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত "যুবকদের নিন্দা করে বা বিপথগামী অভিহিত করে প্রস্তাব পাস করেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব না বলে আমরা আশা করি।" মেয়র রূপে সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও ইঙ্গিত কী ছিল তা অনুমান করা কঠিন ছিল না। মেয়র হওয়ার পূর্বে নির্বাচিত হওয়ার সময় এবং মেয়র পদে থাকাকালেও সুভাষচন্দ্রকে পুলিশি নির্যাতন ও কারাগারের দুঃসহ জীবন সহ্য করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র কোনওদিনই প্রকৃত গান্ধীপন্থী অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তাদের এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল তা বলা সঠিক হবে না।

হিজলী জেলে বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর গুলি চালনা (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) ও চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের (৩০ আগস্ট, ১৯৩১) বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তীব্র প্রতিবাদ সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছিল। হিজলী বন্দীনিবাসে সশস্ত্র প্রহরীদের নির্যাতন ও অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বিরোধ চরমে উঠলে পুলিশের গুলি চালনা ও নৃশংস আক্রমণের ফলে বিপ্লবী বন্দী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন। বহু বন্দী আহত হন। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হিজলীতে গিয়ে শহীদদের শবদেহ কলকাতায় এনে দাহ করার ব্যবস্থা করেন। ঘটনার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। শহীদদের বীরের মৃত্যু সমগ্র দেশ চিরকাল মনে রাখবে বলে তিনি জনসভায় মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার আসানুল্লাকে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য হত্যা করলে পুলিশ পরের দিন শহরে গুণ্ডাদের ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে অবাধ লুঠ, মারপিট ও মানুষের ওপর অত্যাচার উপভোগ করেছিল। এই ঘটনার নিন্দা করে সুভাষচন্দ্র তদন্তের দাবি করেছিলেন। বহুদিন পরে কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সব রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সর্বভারতীয় আন্দোলন চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্ভাব্য বোঝাপড়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা-আপসের কথা শুরু হয়েছিল। গান্ধীজি ও কংগ্রেসের নেতারা তাতে সাড়া দেবার কথা চিন্তা করছিলেন। সুভাষচন্দ্র তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "আমরা যেন ভুলে না যাই শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃতদেহ ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে শায়িত রয়েছে।"

২৭

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের (১৯২৮) অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল বাংলার ছাত্র-যুব সমাজে গান্ধীজির জনপ্রিয়তা হ্রাস। তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আদর্শগত বিরোধ প্রকাশ্যেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য ও বস্ত্র-বয়কট এবং বস্ত্রযজ্ঞ (অর্থাৎ বিদেশী কাপড় পোড়ানো) অব্যাহত ছিল। সুভাষচন্দ্র

এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী। সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মসূচী ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেও গান্ধীজির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার চিন্তাও করেননি। তা সত্ত্বেও কলকাতার অত্যুৎসাহী ছাত্র-যুব সমাজ গান্ধীজির উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৯২৯ সালের ৪ মার্চ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় গান্ধীজি বক্তৃতা দিতে আসেন। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল সভায় গান্ধীজির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হতে পারে, তাই সভার শুরুতেই তিনি আবেদন জানান, সকলে যেন গান্ধীজির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। অনেকদিন পরে তিনি এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে সকলে শুনতে চান। বিদেশী বস্ত্রযজ্ঞের পবিত্র বহ্নিশিখা গান্ধীজি আজ প্রজ্বলিত করছেন। তার গুরুত্ব বাঙালি যেন উপলব্ধি করে। এই সভায় ও সভার পরে পুলিশি হামলা হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ শান্ত থাকায় বড়রকমের দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর পর বস্ত্র বয়কট ও বস্ত্রযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। সরকারি দমন নীতি, ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন, ছাত্র-যুব-নারী জাগরণ স্বাধীনতার স্পৃহা ও জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। ভারতীয় শ্রমিক মহলকে শান্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মিঃ হুইটলিকে চেয়ারম্যান করে শ্রমিকদের অবস্থা ও তার উন্নতির সম্ভাব্য ধারা সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্যে একটি কমিশন গঠন করা হয় (Whitley Commission on Indian Labour)। সাইমন কমিশনের মতো উদ্দেশ্যমূলক এই কমিশন বয়কট করার জন্যে সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানান।

সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত রাখতে সুভাষচন্দ্র নিরলসভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। 'ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জন' ও 'বস্ত্রযজ্ঞ' তাঁর কাছে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক ছিল। তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতিকে স্তিমিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। ব্রিটিশ কূটবুদ্ধির ফলে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের মনেও আপস-মীমাংসার একটি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। ছাত্র-যুবক সমাজকে, বিশেষ করে বাংলার যুবশক্তিকে, তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রতিটি ভাষণে এই সুরটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রের ডাকে ছাত্র-যুবক সমাজে যে প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বিচলিত বোধ করছিলেন। যৌবনের স্বভাবোচিত উচ্ছ্বাসের প্রকাশও ঘটেছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে। তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে বলে, "আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা হচ্ছে। শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আইন-শৃঙ্খলা মানার কথা বলা হলে আমি তাতে কর্ণপাত করব না। তরুণ সমাজের অ্যাডভেঞ্চার প্রবণতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।"

মান্দালয় থেকে ফিরে রাজনৈতিক আন্দোলনে পুনঃপ্রবেশের পর থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে এক ঝড় উঠতে শুরু করেছিল। ক্রমেই তাঁর মন অসহিষ্ণু, বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল মুক্তি সংগ্রাম যত দুর্বার ও আপসহীন হওয়া দরকার তা ঠিক হয়ে উঠছে না। যে সক্রিয় মানসিকতা, গতিশীল কর্মসূচী দেশের অগ্রগতি, আমূল পরিবর্তন ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন তার

অভাব লক্ষ্য করে তিনি বিচলিত বোধ করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজির ভারতের সার্বিক পুরুজ্জীবন ও জাতি গঠনের আদর্শ রূপায়ণের পথ থেকে সরে গেছে বলে তাঁর অভিমতেব উল্লেখ পূর্বেই করেছি। নিজের জীবনে শ্রীঅরবিন্দের অসীম প্রভাব সত্ত্বেও তিনি 'পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারা'র সমালোচনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তেমনি, গান্ধীজির 'সববমতী চিন্তাধারা'ও তিনি দেশের সার্বিক প্রগতির পথে অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন। ১৯১৫ সালে আমেদাবাদে সবরমতী নদীর তীরে গান্ধীজি এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আশ্রমে স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হত। আশ্রম জীবনে গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও প্রতিফলিত হত। সুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমের উল্লেখ করে বলেন, "সবরমতী হতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, আধুনিক যা-কিছু সব মন্দ। অধিক পরিমাণ কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অশুভজনক। অভাব ও জীবিকা নির্বাহের মান বাড়ানো উচিত নয়, আমাদের আবার গো-যানেব যুগে ফিবে যেতে হবে এবং আধ্যত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামচর্চা ও সামরিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে হবে।" সুভাষচন্দ্রের এই সমালোচনা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, গান্ধীজির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতই শুধু নয় তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গেও তাঁর (সুভাষের) দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক মতপার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে তিরিশের দশকের শেষের দিকে গান্ধী-সুভাষ ঐতিহাসিক বিতর্ক ও বিরোধের রূপ নিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মুখ্য অভিযোগ ছিল ওই আশ্রমের চিন্তাধারা দেশের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি করছে যে, "শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ নেই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান, অনেক সংঘর্ষ থাকলেও ঐরূপ যোগ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, "এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ভুলে গেছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য দ্বারাই মাত্র বর্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব...চাবদিক হতে আমরা যে-রূপ ভাবে বিপদ জালে জড়িত, তাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্বলতা মাত্র। এই চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করছি।" সুভাষচন্দ্র নিজে কৈশোর কাল থেকেই সাধু-সন্তদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক সময়ে গুরুর সন্ধান করেছিলেন। দেশপ্রেম, সমাজকল্যাণ ও অধ্যাত্মচিন্তার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। ভারতের যোগী-ঋষিদের সাধনা, তাঁদের আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও আশ্রমজীবন তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল—একটিই। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ। তার জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পাখিটির মতো, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ। এর জন্যে চাই কর্মযোগ, নিরন্তর সংগ্রাম। অন্তরের এই গভীর উপলব্ধি, নিজের অটল বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে তাঁর কোনও দ্বিধা, সঙ্কোচ ছিল না। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, ভারতকে স্বাধীন, শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে যোগী-ঋষিদের পন্থায় চললে হবে না। "এই সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি আপনাদের মনে আমি কোনোরূপে আঘাত করে থাকি তাহলে আমাকে মার্জনা

করবেন।" তিনি বলেন, সবরমতী বা পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারার মূলে যে দার্শনিক ভিত্তি আছে তাব সমালোচনা তিনি করছেন না। উভয় চিন্তাধারার বাস্তবতার দিক থেকেই তিনি সমালোচনা করছেন। "আমরা এখন ভারতবর্ষে চাই প্রবল কর্মবাদ...আমাদের একদিকে যেমন 'বৈদিক যুগে ফিরে যাও' চিৎকারে বাধা দিতে হবে, তেমনি অপর দিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশূন্য পরিবর্তনের বিরোধিতাও করতে হবে।" এই বিশ্বাস ও লক্ষ্যই সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের অনেক কাছে টেনে নিযে গিয়েছিল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু স্মরণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে সুভাষচন্দ্রকে সঠিকভাবে বুঝতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। সুভাষচন্দ্র যাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা কবতেন, যাঁদের আদর্শ ও কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যাঁদের জীবন, সাধনা ও অবদানকে মহৎ বলে স্বীকার করতেন, তাঁদেরই তিনি সম্ভবত বেশি সমালোচকেব দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। নিজের পিতা-মাতা থেকে শুরু করে কালক্রমে দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই এই কথাটি কমবেশি প্রযোজ্য। ববীন্দ্রনাথকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র সঙ্গীত ছিল তাঁর জীবনের শক্তি ও অনুপ্রেরণাব অন্যতম প্রধান উৎস। তাঁর জীবনের সঙ্কটকালে, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁব মনে আসত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের কিছু কিছু দিক সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশে তিনি দ্বিধা করেননি। যেমন, মান্দালয় জেল থেকে শরৎচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে (১ আগস্ট, ১৯২৫) 'নারায়ণ' পত্রিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাংলার প্রাচীন ও জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান সম্পর্কীয় বক্তব্যের প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রানুসারীদের জীবনে ও সাহিত্যে যে শূন্যগর্ভ, অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়, এবং যে আন্তর্জাতিকতাবাদ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূল সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম, চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তাকেও অনাবৃত করে দেখাতে চেয়েছিলেন।" সুভাষচন্দ্রের এই রবীন্দ্র-বিচারে ভুল হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে তাঁর জাতীয়তাবাদ বা বোধের কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ—যা মানুষে-মানুষে দেশে-দেশে বিভেদ সৃষ্টি করে, মনকে সঙ্কীর্ণ করে তোলে তার বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ কম সচেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তরুণ সুভাষের মনে তখন দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে 'Nationalism'-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। Internationalism (আন্তর্জাতিকতাবাদ) তাঁর কাছে গৌণ ছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকবাদ সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আরও গভীরভাবে বুঝেছিলেন। কিন্তু মান্দালয় জেলের পরিবেশে ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর যা অনুভূতি হয়েছিল সে কথা সুভাষচন্দ্র অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। বক্তব্যের দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সময়ই এর জন্যে তাঁকে লোকে ভুল বুঝেছিলেন।

কলকাতার সিটি কলেজ ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করার দাবি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা

দিয়েছিল সেই প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য মতভেদ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিটি কলেজে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করার দাবি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেছিলেন এই রকম দাবি সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করে ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ বিঘ্নিত করবে। সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিতর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয় ছিল। সহিষ্ণুতার প্রশ্ন ওঠায় সুভাষচন্দ্র বলেন, "সহিষ্ণুতার অর্থ এই নয় যে, নিজধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। আমার মতে ছাত্রদের পুজো করতে না দিয়ে ব্রাহ্মরাই বেশি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন।" এই বিতর্ক সেদিন কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এরকম প্রকাশ্য সমালোচনায় অনেকেই বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। কালক্রমে ঐ বিতর্কের কথা লোকে বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু যা স্মরণীয় হয়ে আছে তা হল রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও, নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। ওই বিতর্ক তাঁদের সম্পর্কে কোনও ছায়াপাত করেনি। সিটি কলেজের ঘটনা যখন চরমে উঠেছে, কলেজের সামনে সত্যাগ্রহী ছাত্ররা গ্রেপ্তার হয়েছে, তখন সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্য বিবৃতিতে তার নিন্দা করেছেন (২০ জুলাই, ১৯২৮)। আবার তারপরের দিনই আর একটি ভাষণে তিনি বলছেন, "রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় জীবনের অফুরন্ত কর্মশক্তি ও ব্যক্তির জীবনে সেই শক্তির প্রসার ভাষা পেয়েছে।" অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশের স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতাকে প্রশ্ন করাব অসারতার কথা বলেছেন। পঞ্জাবে ছাত্র সম্মেলনে সগর্বে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কেমন ভাবে পঞ্জাবের ইতিহাস থেকে পঞ্জাবের বীরদের কাহিনী ভিত্তি করে, মহান সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। মহত্ত্বের অকুণ্ঠ স্বীকার, প্রবীণদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অটুট রেখেও নীতি ও কর্তব্যের প্রয়োজনে প্রকাশ্য বিরোধিতা বা ভিন্নমত ব্যক্ত করার নৈতিক সাহস এবং শক্তি সুভাষচন্দ্রের ছিল। এমন চরিত্রবল প্রকৃতই বিরল।

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁব অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই দিকটি ফুটে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রের জীবনে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারার 'নিষ্ক্রিয়তা'র সমালোচনার অল্প কিছু কাল পূর্বেই তিনি তিলকের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এক ভাষণে বলেছিলেন, তিলক ও অরবিন্দ উভয়েই জাতীয়ভাবের প্রতীক। দু'জনেই আমাদের নমস্য। কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দকে সুভাষচন্দ্র যত সহজে বুঝেছিলেন ঋষি, মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছে তুলনামূলকভাবে দুর্জ্ঞেয় ছিলেন। এই নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও দিলীপকুমার রায়ের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র বিনিময় ও আলোচনা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সুভাষচন্দ্রকে গভীর স্নেহ করতেন। তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিলীপকুমার সুভাষের লেখা চিঠিগুলি তাঁকে পড়ে শোনাতেন। অরবিন্দ গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিমতও ব্যক্ত করতেন। পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্বন্ধে সুভাষের মন্তব্যে তিনি অখুশি হয়েছিলেন। একমাত্র যুক্তিবাদ ও কর্মবাদের ওপর সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস প্রসঙ্গে অরবিন্দ দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, "তোমার হতাশ বন্ধুটি

চান সবাই তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করে চলুক। কেন তা হবে? রাজনীতিকের এই স্বপ্ন কখনই তো সার্থক হয় না…তিনি তোমাকে তিরস্কার করেছেন অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে যুক্তিবিচারকে জলাঞ্জলি দিয়েছ বলে। কিন্তু যুক্তিসহ বিশ্বাস ছাড়া তাঁর মতবাদই বা কী? তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী তুমি চল, তাঁর বিশ্বাসমত তিনি চলেন এ তো স্বাভাবিকই, কিন্তু তাঁর মত যে তোমার মতের চেয়ে তাড়াতাড়ি সত্যে পৌঁছতে পারবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই…কোন্ যুক্তি, কোন্ বিচার বলে দেবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা?…রহস্যময় এই পৃথিবীর আপাতবিরোধের মাঝখানে বিশ্বাসটাকে উড়িয়ে দেবার কোনো কারণ নেই।"

বিশ্বাস-যুক্তি, যোগবল-আত্মশক্তি, জীবনের রহস্য সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব নিয়ে মতপার্থক্যের মধ্যে যে মাধুর্যময় বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল সুভাষচন্দ্রের প্রতি অরবিন্দের গভীর স্নেহাশিস ও শুভ-কামনা। আর তেমনি, অকৃত্রিম অরবিন্দের প্রতি সুভাষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও তাঁর শুভাশিস পাওয়ার আকুলতা। সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে অরবিন্দ তাঁর কল্যাণকামনায় নিজর যোগশক্তি ব্যবহার করেছিলেন, দিলীপকুমার তাঁর বন্ধু সুভাষকে শ্রীঅরবিন্দের একটি আশীর্বাদী ফুল পাঠিয়েছিলেন। এই ফুল ও অরবিন্দের আশীর্বাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে লিখেছিলেন, "আমি জানি না তোমার (দিলীপকুমারের) যোগবল গ্রহণ করার মতো সরলতা আমার কাছে কি না—হয়তো তা নেই। কিন্তু তা না থাকলেও আমার মনে হয়, যাঁরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, বা মনের অসীম শক্তিতে যাঁদের আস্থা নেই তাঁরাও তো 'উইলফোর্স'-এর কথা অস্বীকার করতে পারেন না। এই যে মানসিক শক্তি—তাব যে নামই দেওয়া হোক না কেন—তারা কাজ করবেই, গ্রহীতা যদি যোগ্য পাত্র না-ও হয় তবু ঐ ইচ্ছা ব্যর্থ হবে না। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।"

দিলীপকুমার রায়কে এই চিঠি (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন মাদ্রাজের 'পেনিটেনশ্যারি' (চিকিৎসার জন্যে কারাগার-বিশেষ) থেকে। তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বহুদিনের। কিন্তু এত কাছে এসেও তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন, "সত্যি মাদ্রাজ পণ্ডিচেরীর কত কাছে—কিন্তু মধ্যিখানের দেয়ালগুলিই বাধা—পৃথিবীর নানা ব্যবধান এই কারণেই।" যুক্তি ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আর একটি চিঠির উল্লেখ করি। কয়েক মাস পরে (৫ মার্চ, ১৯৩৩) দিলীপকুমারকে তিনি লিখেছিলেন, "তুমি জান সম্প্রতি (প্রায় ৪/৫ বছর যাবৎ) আমি মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করি। এর আগে সাধারণ বিচারবাদী যুক্তিতে আমি মনে করতাম মন্ত্র একটা প্রতীক মাত্র, শুধু মনঃসংযোগে সহায়তা করে। কিন্তু তান্ত্রিক দর্শন পড়ে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে কতকগুলি মন্ত্রের সত্যই শক্তি আছে—এক এক মানসিক অবস্থার পক্ষে এক একটা বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োজন। তারপর থেকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার মানসিক অবস্থাটা ঠিক কি রকম, কোন ধরনের মন্ত্র আমার পক্ষে কার্যকর হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পেরে উঠিনি, কারণ আমার মানসিক অবস্থা অনবরত পাল্টায়—কখনও আমি শৈব, কখনও শাক্ত, আবার কখনও বা বৈষ্ণব। আমার মনে হয় এই কারণেই গুরুর প্রয়োজন—কারণ যিনি যোগ্য গুরু তিনি আমাদের সম্বন্ধে, আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি বুঝতে পারেন। তিনি হয়তো তৎক্ষণাৎ

বলে দিতে পারেন কার পক্ষে কোন মন্ত্র উপযোগী, কার পক্ষে কোন পন্থা শ্রেষ্ঠ।"

কঠোর যুক্তিবাদী সুভাষচন্দ্রও যুক্তি ও বিশ্বাসের চিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। এই দুয়ের মধ্যে কোনও দুর্ভেদ্য দেয়াল তিনি পাননি, যেমন পাননি আরও অনেক যুক্তিবাদী মানুষ। নিজের মানসিক অবস্থা অনবরত পাল্টায়—এই স্বীকারোক্তি সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তাধারার এক বড় দিক উন্মোচন করে। তাঁর অন্তর ও বহির্জীবন উভয়ই নিস্তরঙ্গ দিঘির মতো ছিল না। মহাসমুদ্রের মতো তরঙ্গময় ছিল তাঁর জীবন।

২৮

শিলং থেকে একটি চিঠিতে (১৬ জুন, ১৯২৯) বাসন্তী দেবীকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "ঝড়ের মতো চলেছি—কোথায় চলেছি, শুভের দিকে না অশুভের পশ্চাতে—তা বোঝা দরকার। তা ছাড়া আত্মপরীক্ষাও করা দরকার এবং বেশি অবসব না পেলে আত্মপরীক্ষা করা যায় না।" কিছুদিন পর আর একটি চিঠিতে আত্মসমীক্ষাব সুরে তিনি লেখেন, "আমি শৈশব হতেই স্বভাবত বড় লাজুক—এখনও তাই—সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও। লোকে মনে করে আমি অহঙ্কারী। আমি যাই হই না কেন অহঙ্কারী নই—কারণ আমি জানি যে অহঙ্কাব করাব মতো আমার কিছুই নেই। আমি যেখানে নিজেকে ধরা দিই—সেখানে ভাল করেই ধরা দিই।" সত্যিই সুভাষচন্দ্রের জীবনে ঝড়ের গতি আসছিল। সেই ঝড়ের গতি ক্রমেই বাড়ছিল। তাঁকে 'অহঙ্কারী' বলে কিছু মানুষ সমালোচনা করা শুরু করছিলেন। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে একাগ্রতা ও অনমনীয়তাকে ভুল বোঝা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই তাঁকে বোঝার কোনও অসুবিধা ছিল না। তাঁর বক্তব্য ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল খুবই স্বচ্ছ। এতটা স্বচ্ছতা রাজনীতিতে হয়তো কাম্য ছিল না। তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়েছিল। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে সুভাষচন্দ্র বসু 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র' হয়ে উঠতেন না। আরও একজন বড় নেতা হয়ে উঠতেন মাত্র।

সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের মনে হচ্ছিল গান্ধীজি যেন আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করছেন। বাংলার আইনসভায় কংগ্রেস দলের সদস্যদের ভোটে বারবার মন্ত্রিসভার পতন হওয়ায় পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দেওযা হয়। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেস দল আরও বেশি সংখ্যক সদস্য নিয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হল। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। নতুন পরিস্থিতিতে আইন-পরিষদে কংগ্রেস দল সরকারকে আরও বিব্রত, বিপর্যস্ত করার সুযোগ পেল। কিন্তু গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি হঠাৎ কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না দিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের আইনসভা থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। এর প্রতিবাদ করে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। জওহরলালও পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্রের বোধগম্য হয়নি হঠাৎ কী এমন ঘটল যার জন্যে গান্ধীজি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মতিলাল নেহরুর আচরণে। মতিলালই বাংলার কংগ্রেসীদের

সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন নির্বাচনে লড়াই করার। কিন্তু গান্ধীজির প্রভাবে তিনি তাঁর পূর্ব মত সম্পূর্ণ পাল্টে ফেললেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও অল্পদিনের মধ্যেই গান্ধীজিব পক্ষে চলে যান। এর ফলে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। কংগ্রেস বাজনীতিতে এই অভিজ্ঞতা সুভাষচন্দ্রের পরেও একাধিকবার ঘটেছিল। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পুনরাবৃত্তি হয় ডিসেম্বরের শেষে লাহোরের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে।

সুভাষচন্দ্র তা সত্ত্বেও গান্ধীজি ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিরোধিতা চাননি। মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদেব অনুরোধে ও আশ্বাসে তিনি তাঁর পদত্যাগ প্রত্যাহাব কবে নেন। এব কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি এক বিবৃতিতে (২২ নভেম্বর, ১৯২৯) জানান, শ্রীনিবাস আযেঙ্গাব, জওহবলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র নিজে যখন ওযার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত হন তখন তাঁবা "স্বাধীনতাওয়ালা" নামে পরিচিত হন। তাঁদেব স্বাধীনভাবে নিজেদেব বক্তব্য বলাব অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজি যখন বললেন যে, মন্ত্রিসভাব মতো কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত তখন তাঁদের পক্ষে পদত্যাগ করাই সঙ্গত মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু বলা হয়েছে যে ওয়ার্কিং কমিটিতে ভিন্নমত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা আছে তাই পদত্যাগী সদস্যবা পদত্যাগ প্রত্যাহার করছেন। যতদিন বাক্যে ও কর্মে তাঁকে (সুভাষকে) স্বাধীনতা দেওয়া হবে ততদিন তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকবেন। এই ঘটনাটি প্রায এক দশক পরে কংগ্রেস সংগঠনে গান্ধী-সুভাষ বিরোধ ও তার পবিণতিব পূর্বাভাস দিয়েছিল।

১৯২৯ সালে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কলকাতার কাছে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সংবাদে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষে 'আপত্তিকর সংবাদ প্রচারের' অভিযোগে 'ফরোয়ার্ড'-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় ওই পত্রিকাকে দেড়লক্ষ টাকা ক্ষতিপূবণ দেবার নির্দেশ। এই মামলা ও বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী কাগজটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু ওই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ক্ষতিপূরণ এড়াবার জন্যে রাতারাতি 'ফরোয়ার্ড'-এর পরিবর্তে দৈনিক 'লিবার্টি' (Liberty) পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 'লিবার্টি'-র সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সত্যরঞ্জন বক্সী।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্বপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ছাত্রদের সুভাষচন্দ্র যেভাবে আহ্বান জানাচ্ছিলেন তা লক্ষণীয় ছিল। তিনি মনে মনে উপলব্ধি করছিলেন যে ছাত্র-যুবকরাই তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত নেতাদের ওপর তাঁর আস্থা ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মূল সুর ছিল দীর্ঘদিনের পুরনো প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে। ছাত্রসমাজ কিছু ভ্রান্ত আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এবং তার ফলে উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি যেসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিলেন তা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। যেমন, তিনি বলেন, "আমরা প্রায়ই শুনে থাকি—'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—অধ্যয়নই ছাত্র জীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়ে ছাত্রদের দেশসেবার কার্য হতে নিরস্ত রাখবার চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। অধ্যয়ন কখনই তপস্যা হতে পারে না।" সুভাষচন্দ্র বলেন, এর ফলে স্বর্ণপদক পাওয়া যেতে পারে, বড় চাকরি পাওয়া যেতে

পারে, কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না। 'গ্রন্থকীট'দের পুঁথির বাইরে কোনও অস্তিত্ব নেই, পরীক্ষার প্রাঙ্গণেই তাদের জীবন কাটে। এইসব 'ভাল ছেলে'দের সঙ্গে "বকাটে রবার্ট ক্লাইভ"-এর তুলনা কবলেই বোঝা যাবে এইসব 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' ছেলেরা কেমন করে সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে ইংরেজ-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। 'বকাটে ক্লাইভ' শেষ জীবনে রবার্ট ক্লাইভ হয়েছিলেন। যে অত্যাচার ও মনুষ্যত্বের অপমানের প্রতিবোধ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয়, লাঞ্ছিত হয় সে-ই মনুষ্যত্বের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যেসব Gold medalist ছাত্র বেরচ্ছে, সেরকম হাজার ছাত্র একত্র করলেও একজন খড়্গ বাহাদুর তৈরি হবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, এখন সংঘবদ্ধ স্বাধীনতাব সৈনিক শ্রেণী গড়ে তোলার সময এসেছে। সুভাষচন্দ্রেব এই অগ্নিগর্ভ আহ্বানেব উৎসে যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ছিল তা তাঁব পাবনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণেই (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ পেয়েছিল। যুবশক্তির সাধনার স্বরূপ ব্যক্ত করে তাঁব ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি স্বামীজির বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত করেন

"পূজা তাঁব সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

'নেতাজি' ভারতের মুক্তির জন্যে তাঁর চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগ দেবার আহ্বান করে বলেছিলেন, "Give me blood, I will give you freedom" এই ডাক ও প্রতিশ্রুতি কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু বহু পূর্বেই দিয়েছিলেন।

ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন, বিপ্লবী তৎপরতা, ব্যাপক বিক্ষোভ, অসন্তোষ, জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্জনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে ঘোষণা, ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তুলেছিল। স্যার জন সাইমন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে (Ramsay Macdonald) পরামর্শ দেন যে, ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের পথ ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে প্রতিনিধি-স্থানীয় ভারতীয় নেতাদের একটি আলোচনা সভায় আহ্বান করা উচিত। ব্রিটিশ সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করে। ভাইসরয় লর্ড আরউইন (Lord Irwin) ঘোষণা করেন (৩১ অক্টোবর, ১৯২৯) যে, শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে ইংলন্ডে একটি গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহুত হবে। গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের ঘোষণায় ভারতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ তরুণ নেতারা ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ও ইংরাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি দূর করে, প্রাথমিক কথাবার্তার জন্যে ভাইসরয় আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে এক সাক্ষাৎ আলোচনার প্রস্তাব করেন। গান্ধীজি ওই প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন আগেই, গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকার হয়। এই বৈঠকে গান্ধীজি দাবি করেন যে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে ভারতবর্ষকে অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) দিতে

হবে। কিন্তু ওই রকম কোনও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে আরউইন অসম্মত হলে গান্ধী-আরউইন বৈঠক বিফল হয়। কংগ্রেস নেতারা হতাশা বোধ করেন। কিন্তু এই প্রথম ভারতবর্ষের একজন ভাইসরয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজির সঙ্গে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে সামনা-সামনি কথা বলতে সম্মত হয়েছেন, এর জন্যে তাঁরা আত্মপ্রসাদ বোধ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের নবীন বামপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয। এর প্রকাশ ঘটে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে।

ভাইসরয় আরউইন গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে প্রথম যে ঘোষণা করেন তাকে সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই খুব সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল আসলে এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি ফাঁদ মাত্র। প্রথমে মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতারা ও গান্ধীজি নিজে আরউইনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতিতে সই দেন। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও আরও কয়েকজন এর বিরোধিতা কবে পৃথক এক ইস্তাহার প্রচার করার মনস্থ করেন। কিন্তু জওহরলালকে গান্ধীজি বোঝান যে, তাঁর পক্ষে এরকম একটা পৃথক বিবৃতিতে সই দেওয়া সমীচীন হবে না। কেননা জওহরলাল আগামী লাহোর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি। জওহরলাল গান্ধীজির কথায় তাঁর মত পরিবর্তন করেন। এইরকম ঘটনা ইতিপূর্বে ও পবে একাধিকবার ঘটেছিল। জওহরলাল নিজেই তাঁর 'আত্মজীবনী'তে (An Autobiography) স্বীকার করেছেন যে, নিজের বিবেক ও যুক্তির বিরোধী হলেও, তিনি শেষপর্যন্ত কখনও গান্ধীজির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেননি। এটা গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব, সম্মোহনী শক্তির প্রভাব, না অন্য কিছু তা তিনি নিজেই সঠিক ব্যাখ্যা করতে অক্ষম ছিলেন। জওহরলাল এইভাবে হঠাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করায় সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বাসন্তী দেবীকে এক চিঠিতে (৫ নভেম্বর, ১৯২৯) লেখেন, "জওহরলাল এবার মহাত্মার পাল্লায পড়ে Independence ত্যাগ করলেন।" মাসখানেক পরে (৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯) বাসন্তী দেবীকে আর একটি চিঠিতে তিনি জানান যে, বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যেও তাঁকে অপদস্থ, বিধ্বস্ত করার চেষ্টা চলছে। এর পিছনে মতিলাল নেহরুর সমর্থন আছে বলে তাঁর ধারণা। তিনি আরও জানান, "আমাদের এই বিপদের সময় ডাঃ রায়ের (বিধানচন্দ্র রায়) কাছে আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছি না। নির্মলবাবু (নির্মলচন্দ্র চন্দ্র) অনেকটা করছেন।"

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের অবদান আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। Big Five বা 'পঞ্চ প্রধানে'র অন্যতম নির্মলচন্দ্র চন্দ্র কোনও প্রচার ও পদের প্রত্যাশা না কবে যেভাবে নিজের বিপুল পসার ও পারিবারিক বিত্ত সত্ত্বেও সব কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে দান করে নিজে প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গোপাললাল সান্যাল নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের হৃদয়বত্তা ও দেশপ্রেমের একটি চিত্তস্পর্শী ঘটনার কথা লিখেছেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি এসেছিলেন কলকাতায়। তখনও বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনে তেমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়নি। গান্ধীজি এসেছিলেন বাংলার মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে এবং তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্যে টাকা তুলতে। কলকাতায় জনসভা ডাকা হয়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সভাপতি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

স্বেচ্ছাসেবকরা সভায় বাক্স হাতে ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করছে। কিন্তু সামান্য কিছু পয়সা আর কয়েকটি মাত্র টাকা ছাড়া তেমন কিছু ওঠেনি। গান্ধীজির ভাষণের পর নির্মলচন্দ্র উঠলেন বক্তৃতা দিতে। তিনি সম্ভবত ইতিমধ্যে জানতে পেরেছিলেন যে নামমাত্র অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। লজ্জায় রাঙা হয়ে (নির্মলচন্দ্র খুবই ফরসা ছিলেন) তিনি প্রথমে গান্ধীজির প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর ঘোষণা করলেন তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্যে তাঁর 'সামান্য দান—পঞ্চাশ হাজার টাকা।' এখনকার মূল্যে ৫০০০০ কত তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজি, মতিলাল, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের সব বড় বড় নেতাদের নিকট সম্পর্ক ছিল। প্রায় সকলেই তাঁর বাড়িতে আসতেন, আতিথ্য গ্রহণ করতেন। সুভাষচন্দ্রকে তিনি গভীর স্নেহ করতেন। তাঁর সাহস ও অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহাকে শ্রদ্ধা করতেন। নির্মলচন্দ্র তিরিশের দশকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে যান, যদিও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর সমর্থন অটুট ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষ যখন জার্মানী ও দূর প্রাচ্য থেকে ভাষণ দিতেন নির্মলচন্দ্র তা রেডিও কানের কাছে নিয়ে এসে শুনতেন। সব কথা যাতে ভালভাবে শোনা যায় তার জন্যে কানে 'স্টেথিসকোপ' লাগাতেন। নির্মলচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তখন যুবক, ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়। তাঁর কাছে নির্মলচন্দ্রের সুভাষ-প্রীতির এই গল্প শুনেছি।

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে একটি কৌতুকপূর্ণ কিন্তু হৃদয়গ্রাহী গল্পের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কন্যা অপর্ণা দেবীর কাছে শুনে হেনা চৌধুরী তাঁর 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' গ্রন্থে লিখেছেন। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র তখন একসঙ্গে কারাগারে। অপর্ণা দেবী ও তাঁর ছোট বোন কল্যাণী তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীর মেয়েরাও দেশের সেবায় তাঁদের ভারী ভারী সোনার গয়না দান করছিলেন। পিতা দেশবন্ধুকে দেখানোর জন্যে দুই বোন যতখানি সম্ভব ওই গয়নাগুলি পরে জেলে দেখা করতে যেতেন। জেলের মধ্যে দুই সালঙ্করা বোনকে দেখে সুভাষচন্দ্র খুব কৌতুক বোধ করতেন। শেষপর্যন্ত একদিন বলেই ফেললেন, "কি ব্যাপার, আপনারা দুই বোন গায়ে যে একেবারে ব্যাঙ্ক চাপিয়ে এসেছেন ?" অপর্ণা দেবী সঙ্গে সঙ্গে সরস জবাব দিলেন, "কি করি, এ ছাড়া তো ব্যাঙ্ককে আর ভেতরে আনবার উপায় ছিল না।"

গান্ধীজির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি আঁচ করেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বামপন্থী সহযোগীরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অবিচল থাকবেন। তাঁরা 'Dominion Status'-এর লক্ষ্যকে কিছুতেই মেনে নেবেন না। তা ছাড়া ভাইসরয় আরউইনের সঙ্গে কথাবার্তাতে বুঝেছিলেন যে, ওইটুকু প্রতিশ্রুতিও ব্রিটিশ সরকার দিতে প্রস্তুত নয়। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচার ও সম্ভাব্য চরম দণ্ডের আশঙ্কা, যুব-ছাত্র সমাজে বিক্ষোভ এবং চাঞ্চল্য, শ্রমিক অসন্তোষ—সব কিছু মিলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছে। সুতরাং একটা কিছু পদক্ষেপ না নিলে লাহোর কংগ্রেসে গভীর সঙ্কটের

সৃষ্টি হবে। তিনি কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) ঘোষণা করেছিলেন যে, এক বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে তিনি নিজে একজন 'ইন্ডিপেনডেন্সওয়ালা' হয়ে যাবেন! সেই সময়সীমা পার হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি ছিল। সম্ভাব্য জটিল পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে গান্ধীজি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি নেন।

সকলে প্রত্যাশা করেছিল যে, বল্লভভাই প্যাটেল লাহোর কংগ্রেসের জন্যে সভাপতি নির্বাচিত হবেন। বারদৌলিতে কৃষক আন্দোলনের সার্থক নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সারা দেশের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে 'সর্দার' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি কংগ্রেস সভাপতি পদে জওহরলাল নেহরুকে পছন্দ করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে জওহরলাল ছিলেন যুবশক্তির প্রতীক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও জওহরলালকে চেয়েছিলেন কেননা, তাঁর মতে, মুসলমানদের কাছে জওহরলালের বেশি গ্রহণযোগ্যতা আছে। অনেকে মনে করেছিলেন, জওহরলালের নির্বাচন বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির স্বীকৃতি। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে এই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান মুখপাত্র মনে করা হত।

লাহোর কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছিল। গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল, ব্যবস্থাপক সভাগুলি থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুসরণের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর একটি প্রস্তাবে ভাইসরয় আরউইনের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার (কিছুদিন আগে ঘটেছিল) নিন্দা ও তিনি দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' সম্পর্কে আন্দোলন শুরু করার (৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৯-এর পর) পূর্ব সিদ্ধান্ত স্মরণ রেখে লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ওই লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সংগ্রাম শুরু করবে। নির্ধারিত স্থানে ও নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। এই প্রস্তাবটি গান্ধীজি নিজে উত্থাপন করেন। গান্ধীজির এই প্রস্তাবের ওপর সুভাষচন্দ্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস যেসব সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তা কার্যকর করতেই যদি কংগ্রেসীরা সচেষ্ট হন তাহলে তাঁদের আর কী করণীয় থাকবে? সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে, জাতীয় কংগ্রেসকে একদিকে স্বাধীনতা লাভের পক্ষে নিরন্তর প্রচার এবং দেশে একটি 'প্রতি-সরকার' বা parallel government গঠন করতে হবে এবং তারই সঙ্গে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে হবে। এই আন্দোলনে যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও অন্য সব নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। যখন যেখানে সম্ভব হরতাল ও ধর্মঘট করতে হবে। গভীর আবেগে সুভাষচন্দ্র বলেন, "এই দেশের মানুষের খাঁটি শুভেচ্ছার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতি-সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমরা কীভাবে পৌঁছাব তা আমি বুঝছি না···আমি চরমপন্থী, আমার নীতি হল: 'হয় সবটা চাই, নয়তো কিছুই চাই না।' আমি যদি দখল করার নীতি অনুসরণ করতে বলি, তবে আমি সবই দখল করতে চাইব। এখন আমরা বয়কটের কথা বলছি, তাই সম্পূর্ণ বয়কট চাই।" গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে সুভাষ বলেন, গান্ধীজির মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু 'বর্তমান পরিস্থিতিতে' কথাটির অর্থ কী? দু'টি যুদ্ধরত বা দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের

প্রতিনিধিদের মধ্যেই 'গোলটেবিল' বৈঠক হতে পারে। কিন্তু যে বৈঠকে ইউরোপীয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স, দেশীয় রাজন্যবর্গ, ব্রিটিশ অনুগত বন্ধুরাও বসবে তা আবার 'গোলটেবিল' হয় কী করে? কোনও অবস্থাতেই কংগ্রেসের ওই রকম বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত নয়। পরিশেষে সুভাষচন্দ্র বলেন, "মহাত্মা গান্ধী আপনাদের সামনে যে লক্ষ্য (পূর্ণ স্বাধীনতা) উপস্থিত করেছেন তার জন্যে আমি আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংশোধনী উপস্থাপনের আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্যবস্তু লাভ করা।"

গান্ধীজি সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্রকে বাংলার এক বড় বা মহান কর্মী (great worker ın Bengal) বলে উল্লেখ করেন। তাঁর প্রস্তাবটিও ভাল (a good one) বলেন। কিন্তু যেখানে এক হাজারটি গ্রামেও এখনও কংগ্রেস পতাকা ওড়ে না সেখানে প্রতি-সরকার গঠনের সম্ভাবনা কোথায় বলে তিনি প্রশ্ন করেন। "এটা সাহস বা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয় এবং আপনারা শুধু প্রস্তাব পাস করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। মনে রাখবেন আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করছি না...।" গান্ধীজি বাগ্মী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর শব্দ চয়ন, শ্রোতাদের অভিভূত করার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। সাত ঘণ্টা বিতর্কের পর সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

গান্ধী-সুভাষের মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্য বিরোধে কার যুক্তি ও বক্তব্য অধিকতর বাস্তবোচিত ছিল এই বিশ্লেষণ আরও পবে করা হবে। কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি রূপে জওহরলালের ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ, হতাশ ও মর্মাহত হয়েছিলেন। সুভাষ বলেছেন, "স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রধান্য ঘটবে এবং সভাপতি শুধু সাক্ষিগোপাল থাকবেন।" কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই সুভাষ তাঁর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন, "লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মার সত্যিই বিরাট একটা সাফল্য হল। বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট মুখপাত্রদের অন্যতম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি তাঁর দলে টেনে নিলেন এবং অন্যান্য সবাইকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হল। ...যখনই কোনও বিরোধিতা দেখা গেছে তিনি সর্বদাই কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ অথবা আমৃত্যু অনশনের ভয় দেখিয়ে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।" গান্ধীজি সম্বন্ধে এই মন্তব্য অবশ্য রূঢ় মনে হতে পারে। কিন্তু রাজনীতির এই হল ধর্ম। মহাত্মাজীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। পরের বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে গান্ধীজি তাঁর সব বিরোধীদের বাদ দিয়েছিলেন। এ নামের তালিকায় সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তা বলা বাহুল্য।

২৯

সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও গান্ধীজি দেশের আবহাওয়া বুঝতে ভুল করেননি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাসীদের সাংগঠনিক ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। একমাত্র বিকল্প, এক অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা। ১৯২৯ সালের মধ্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের ত্রি-রঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। শুরু হল, সুভাষচন্দ্রের

ভাষায় 'ঝটিকাক্ষুব্ধ ১৯৩০'। স্থির হল আগামী ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হবে। গান্ধীজি রচিত নির্দেশ গেল সব কংগ্রেস কর্মীদের কাছে—ওই দিনটিতে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে প্রত্যেককে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সবদিক থেকে দেশের যে অবক্ষয় ও বিপর্যয় ঘটেছে তা আর মেনে চলা "ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ"। সম্পূর্ণ অহিংস নীতিতে বিশ্বাস রেখে এই আন্দোলন করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত মত ও পথই তিনি কার্যত মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু তা যে নয় সেটি তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর রক্ষণশীল বিত্তশালী সমর্থকদের, যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীজি ব্যাখ্যা করলেন যে, স্বাধীনতার যা মর্ম তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র অর্থ দাঁড়াল গান্ধীজির ভাষায় 'পূর্ণ স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতার মর্ম' (substance of independence)। ভারতীয় পুঁজিপতিদের ও তাঁর অন্য সব রক্ষণশীল (দক্ষিণপন্থী) অনুগামীদের আশ্বস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রাখলেন। স্বাধীনতার মর্ম বলে তিনি যে 'এগার দফা দাবি'র কথা তুললেন সেগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার কোনওটিতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ছিল না। এ সত্ত্বেও নতুন বছর শুরু হল প্রবল প্রত্যাশা, উত্তেজনা এবং অধীর আগ্রহের মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণ ও নেতৃত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন গান্ধীজির ওপর।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি 'পূর্ণ স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হয়। ওই দিন লক্ষ লক্ষ স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে। 'শপথ' বা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাধীনতাকে ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার (inalienable right) রূপে ঘোষণা করা হয়। আসন্ন সংগ্রামের জন্যে উন্মাদনা ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে সারা দেশ অপেক্ষা করে রইল গান্ধীজির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে গান্ধী-বিরোধী বলে চিহ্নিত সব নেতাদের বিশেষ করে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও তাঁকে বাদ দেওয়ায় সুভাষচন্দ্র খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি খোলাখুলি বলেন, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনে প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করা হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল সঠিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। প্রথম থেকেই তিনি তাঁদের প্রতি 'যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন'। অধিবেশনে গান্ধীজিকে দিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত নামের তালিকা পেশ করিয়ে অন্যায়ভাবে তাঁর প্রভাবের সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। জওহরলাল একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকরা তাঁর (জওহরলালের) রুলিং-এর অপেক্ষা না করেই সভা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। জওহরলালের এই বক্তব্যের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন যে, এই অভিযোগ ঠিক নয়। সুভাষচন্দ্র কিছুটা ক্ষোভ ও তিক্ততার সঙ্গে ওই প্রসঙ্গে বলেন, "যখন আমরা দেখলাম যে ওয়ার্কিং কমিটি বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনও আশা নেই, তখন আমাদের বেরিয়ে হয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।" লাহোর কংগ্রেসের ওই ঘটনার পর স্বভাবতই আশঙ্কা হয়েছিল যে, গান্ধীপন্থী ও সুভাষপন্থীদের মতভেদ জাতীয়

আন্দোলনের ঐক্য বিঘ্নিত করবে। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা একটি পৃথক দল গঠন করবেন। কিন্তু ওই আশঙ্কা অমূলক ছিল। সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে জানান, "মতভেদ হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই মতভেদ কার্যক্ষেত্রে নয়।" গান্ধীজির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেও স্বাধীনতার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সেখানে দলাদলির স্থান নেই।

গান্ধীজি তখনও কোথায়, কীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন সে বিষয়ে মনস্থির করেননি। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তখনই বাংলা দেশে আইন অমান্যের কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। এর অন্যতম ছিল পূর্ববঙ্গে যশোহর জেলার বন্দবিলাতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের চেষ্টার বিরুদ্ধে গত ছ'মাস ধরে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল তাকে সক্রিয়ভাবে প্রদেশ কংগ্রেসের সমর্থন করা। এক সাধারণ কংগ্রেস কর্মী বিজয়চন্দ্র রায় ইউনিয়ন বোর্ড গড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই বিরোধিতার অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান ছিল সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর ওপর করের বোঝা চাপানো। সুভাষচন্দ্র নিজে ইতিপূর্বেই বন্দবিলায় গিয়ে তদন্ত করে বুঝেছিলেন যে ওই সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গত। তিনি সারা দেশের মানুষকে অর্থ ও কর্মী পাঠিয়ে বন্দবিলার আইন অমান্য আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে আবেদন করেন। তিনি বলেন, মেদিনীপুরে ইতিপূর্বেই অনুরূপ আন্দোলন সফল হয়েছে। এখন বন্দবিলার গ্রামবাসীর নির্ভীক দৃষ্টান্ত অন্যান্য জেলায় অনুসৃত হোক। গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার করতে তিনি আরও কিছু কর্মসূচী প্রস্তাব করেন। যেমন, প্রতিটি গ্রামের কংগ্রেস কমিটি একটি করে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করবে। এই বাহিনীর কাজ হবে পুলিশ ও চৌকিদারদের ওপর গ্রামবাসীকে যেন নির্ভর না করতে হয়; আদালতে না গিয়ে গ্রামের বিরোধ কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে সালিসীর দ্বারা মীমাংসা করা; ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী শিল্পদ্যোগ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির আত্মনির্ভরশীলতাকে সাহায্য করা। আর একটি কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে তিনি হাওড়ার ক্ষীরেরতলা ময়দানে এক জনসভায় (১১ জানুয়ারি ১৯৩০) আবেদন জানান। সেটি ছিল · "গভর্নমেন্ট যদি কোনও বাড়িতে লবণ তৈরি করতে না দেয়, তা আইন অমান্য করবার একটা ভাল সুযোগ করে দেবে।" তিনি বলেন, "বাড়িতে লবণ তৈরির যে নিষেধাত্মক আইন এদেশে প্রচলিত আছে, পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা নেই। যত শীঘ্র সম্ভব এর বিলোপ-সাধন করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে।"

গান্ধীজি ঐতিহাসিক আইন অমান্য আন্দোলন (লবণ আইন অমান্য আন্দোলন নামেও খ্যাত) শুরু করার ঘোষণার (২ মার্চ, ১৯৩০) প্রায় দু' মাস আগে সুভাষচন্দ্র লবণ আইন ভঙ্গের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন। লবণ আইনের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোনও কথা বলা হয়নি তা নয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতো এত স্পষ্টভাবে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্যের সম্ভাবনার কথা কেউ বলেননি। বিস্ময় ও দুঃখের কারণ হল, অসহযোগ আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বৃহদায়তন গ্রন্থগুলিতেও সুভাষচন্দ্রের এই চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর প্রায় কোনও উল্লেখই নেই। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজির সিদ্ধান্তের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কোনও বিকল্প কর্মসূচী বা পরোক্ষভাবেও

গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা তাঁর চিন্তায় ছিল না। যেখানে পরিস্থিতি অনুকূল সেখানেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কর্মসূচী কংগ্রেস অধিবেশনেই গৃহীত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব ছিল, যেখানে এই আন্দোলন ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গেছে সেখানে কালক্ষেপ না করে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। দু' মাস পবে গান্ধীজি যখন তাঁর কর্মসূচী ঘোষণা করেন তখন সুভাষচন্দ্র তাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

ভাবতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরকারেব পক্ষে ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছিল। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা, কর্মক্ষমতা এবং প্রভাব সম্পর্কে যাই মূল্যায়ন করুন না কেন, বাংলার প্রশাসন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ বুঝেছিল যে, সুভাষচন্দ্রকে কাবারুদ্ধ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে বে-আইনী সমাবেশ ও দেশদ্রোহের (sedition) অভিযোগে সুভাষচন্দ্র ও আরও কযেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই মামলা চলাকালেই সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল, যে কোনও সময তাঁব কারাদণ্ড হতে পারে। তিনি এর জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন। ওই মামলাব বায বেবল ২৩ জানুযারি, ১৯২০। সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েকজনেব এক বছরেব সশ্রম কারাদণ্ড হল। জন্মদিনের একটি চমৎকার 'উপহার' তিনি সবকাবেব কাছ থেকে পেলেন। 'মহামান্য' ভারতীয় বিচারপতি তাঁর রায়ে বললেন, "এবকম উঁচু সংস্কৃতিবান্ (highly cultured) ব্যক্তিরা এই আইনের এক্তিযারে পড়েছেন তা খুব দুঃখজনক। কিন্তু যেহেতু তাঁরা দেশের সরকারের সম্পর্কে বিদ্বেষ ও শত্রুতাব মনোভাব সৃষ্টি করছেন, তাঁদের এক বছরের কারাদণ্ড হল যোগ্য শাস্তি।" কারারুদ্ধ হবার পূর্বেই সুভাষচন্দ্র জনসাধারণকে আহ্বান জানান সর্বতোভাবে কংগ্রেসেব পিছনে দাঁড়াতে। শ্রমিকদের প্রতি তিনি 'জাতীয় ইতিহাসের এক বিঘ্নসঙ্কুল' সময়ে ইউনিয়নের মধ্যে দলাদলি ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে অনুরোধ জানান। কলকাতা কর্পোরেশনেব কাউন্সিলার রূপেও তিনি পদত্যাগ করেন। অনেক বিশিষ্টজনের অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, এক বছর কারাবাসের সময় তাঁর পক্ষে কর্পোবেশনেব কোনও কাজে সহায়তা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং পদত্যাগ না করলে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি অবিচার করা হবে। সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ডের সংবাদ পেয়ে গান্ধীজি এক বার্তা পাঠান। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের নির্ভীকভাবে দেশসেবার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্তির জন্যে তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বাংলা বহু দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে পারে, কিন্তু বাংলার সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ কখনও ক্ষয় হয় না! অভিনন্দনসূচক বার্তায় গান্ধীজি কেন বাংলার দলাদলির উল্লেখ করেছিলেন তা বোধগম্য নয়। আর একটি উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। গান্ধীজি যখন কোনও প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করতেন, তাঁর প্রশংসা বা সমালোচনা করতেন, অধিকাংশ সময়েই সুভাষচন্দ্রকে 'বাংলার নেতা' বলে অভিহিত করতেন। এখনও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের লেখায় সুভাষচন্দ্রকে 'বাঙালি' বা 'বাংলার নেতা' বলে উল্লেখ করার প্রবণতা লক্ষণীয়। তিরিশের দশকের সূচনাতেই কিন্তু সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় নেতার স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। গান্ধীজি ওই স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করছিলেন কি না এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

১৯৩০ সালের ২ মার্চ গান্ধীজি ভাইসরয় আরউইনকে এক পত্র মারফৎ জানালেন

যে, লবণ উৎপাদনের ওপর যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে তা প্রত্যাহৃত না হলে তিনি গুজরাটের সমুদ্রতীরের ডাণ্ডি নামে একটি ছোট গ্রামে লবণ আইন অমান্য করবেন। আরউইন গান্ধীজির প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হলে আসন্ন সংঘর্ষের মীমাংসার আশা দূর হয়। ১২ মার্চ (১৯৩০) গান্ধীজি ডান্ডি অভিমুখে তাঁর ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করেন। সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডির দূরত্ব প্রায় দু'শ মাইল। এই দীর্ঘপথ প্রায় পঁচিশ দিন ধরে যখন গান্ধীজি ও তাঁর শত শত অনুগামী সত্যাগ্রহীরা ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন সেই সময় দেশে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরকম দৃশ্য এর আগে দেশবাসী কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। ৬ এপ্রিল গান্ধীজি ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, করদান বন্ধ করা, ধর্মঘট, গণ-বিক্ষোভ প্রভৃতি আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরপ্রদেশে করদান বন্ধের আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। হাজার হাজার নারী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ইতিপূর্বে কোনও আন্দোলনে এত বেশি সংখ্যায় মেয়েরা যোগ দেননি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন গণ-সমর্থন লাভ করে। এর মূলে ছিলেন খান আবদুল গফ্ফর খান। গান্ধীজি-প্রদর্শিত পথ ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী এই মহান নেতা 'সীমান্ত গান্ধী' (Frontier Gandhi) রূপে খ্যাত হয়ে সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি খোদা-ই-খিদমৎগার (ঈশ্বরের সেবক) নামে এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল গঠন করেন। এই বাহিনীর সদস্যরা সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন লাল রঙের কুর্তা পরত বলে সংগঠনটি 'লাল কুর্তা' (Red Shirts) নামে পরিচিত হয়। ১৯৩১ সালে এই দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন যখন শুরু হল সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো। আইন অমান্য আন্দোলন ও তার কর্মসূচীকে তিনি গান্ধীজির নেতৃত্বের "শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হিসেবে চিরকাল গণ্য হবে" বলে অভিনন্দিত করেছেন। সুভাষচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, গান্ধীজির কর্মসূচী থেকে এই সত্যই প্রতীয়মান হয়েছিল, "সঙ্কটমুহূর্তে তিনি কী রকম উচ্চস্তরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন।" গান্ধীজির আবেদন দেশে 'জাদুর মতো' কাজ করেছিল। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গোঁড়া ও অভিজাত পরিবারের মেয়েরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হাজার হাজার মেয়েরা কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজির অবদানের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাবার সময় সুভাষচন্দ্র নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে দলে দলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের আকৃষ্ট করার মূলে তাঁর অবদানও কম ছিল না। কলকাতা কংগ্রেসেই তা দেখা গিয়েছিল। লবণ আইন অমান্যের কথাও তিনি দু' মাস আগেই বলেছিলেন, যদিও যেভাবে এই কর্মসূচীকে রূপায়িত করার কথা ভেবেছিলেন তার তুলনা নেই। কিন্তু নিজের কৃতিত্বের সামান্যতম উল্লেখ না করে তিনি সব কিছুর কৃতিত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজিকে। সুভাষচন্দ্রের এই আত্মপ্রচার বিমুখতা ও রাজনৈতিক বিরোধীদের অবদান স্বীকৃতিতে উদার মনোভাব তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থের বিদেশী সমলোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গণ-সমর্থন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অভূতপূর্ব নির্যাতন, দমনমূলক নীতি, হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে বন্দী করেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। ৫ মে গান্ধীজিকে বন্দী করেও নয়। এরই সঙ্গে বিপ্লবীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০), বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটজনক করে তোলে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেন, শুধুমাত্র নিপীড়ন ও দমনমূলক ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না। চৌরিচৌরার ঘটনার পরে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁর প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। গান্ধীজি তা বিস্মৃত হননি। তাই এবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্বস্ত করে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিংসাত্মক শক্তিগুলিকে সংযত রাখার জন্যে সবরকম চেষ্টা করা হবে। কিন্তু একবার আন্দোলন শুরু হলে একজন আইন অমান্যকারী সুস্থ ও জীবিত থাকতে এই আন্দোলন আর বন্ধ হবে না। সরকার উপলব্ধি করেছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনকে তথা স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে কূট কৌশলের চিন্তাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৯৩০ সালের ৭ জুন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টের সুপারিশগুলি এতই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে, কোনও ভারতীয় রাজনৈতিক দলের কাছেই তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে পুণার যারবেদা জেলে বন্দী গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মীমাংসার সূত্রের জন্যে কথাবার্তা শুরু করল। কিন্তু ঐকমত্যে পৌঁছনো সম্ভব হল না। তখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ছাড়াই লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে (১২ নভেম্বর ১৯৩০-১৯ জানুয়ারি ১৯৩১)। দীর্ঘ আলোচনার পর বৈঠকে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চল ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ-শাসিত (Princely States) রাজ্যগুলির সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federal Union) গঠন করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে কোনও মতৈক্য হয়নি। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ বি. আর আমবেদকার এবং মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন। শেষপর্যন্ত এই বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তার সমাপ্তি ভাষণে ভারতীয় জনগণকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। তাঁরা বুঝেছিলেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব হবে না।

শুরু হয় পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসকে যোগদানে সম্মত করানোর প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতারাও পরিস্থিতি বিচার করে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ও ভাইসরয় আরউইন সুযোগ বুঝে গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে উদ্যোগী হন। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এর পরিণতি রূপে গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয় আরউইনের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা হয় এবং ১৯৩১ সালের ৫

মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি (Gandhi-Irwin Pact) স্বাক্ষরিত হয়। স্থির হয়, কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করবে এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে। বৈঠকে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার স্বার্থে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন কার্যসূচী স্থগিত রাখা হবে। ব্রিটিশ সরকার অর্থনীতি ও শিল্পের উন্নয়নে ভারতীয় শিল্পদ্যোগে উৎসাহদান করবে। করাচিতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৩১) গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ব্রিটিশ বাজনৈতিক ভাষ্যকাররা ও সরকারি মহল গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে উচ্ছ্বসিতভাবে স্বাগত জানান। এই চুক্তিকে কংগ্রেসের এক বিরাট সাফল্য রূপে প্রচার করা হয়। এই প্রথম একজন ভাইসরয় সব আড়ম্বর, পদমর্যাদার আত্মম্ভরিতা বর্জন করে সমানে-সমান মনোভাব নিয়ে এক ভারতীয় নেতার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসেছেন, এটাকে একটা বিরাট ঘটনা রূপে দেখানো হয়। পরবর্তীকালেব ও আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকও ওই ঘটনা প্রবাহকে মূলত এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী আইন অমান্য আন্দোলনের এই পরিণতি ও গান্ধীজির আপস নীতিতে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা যথাযথভাবে উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৩০

আইন অমান্য আন্দোলন, বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে জেলগুলিতে বন্দীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রতিদিনই দলে দলে নতুন রাজনৈতিক বন্দী আসার ফলে কারাগারগুলিতে স্থান সঙ্কুলানের চরম সমস্যা দেখা দেয়। প্রায়ই জেলের প্রহরীরা ধৈর্যচ্যুত হয়ে বন্দীদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ করতে থাকে। একদিন (২২ এপ্রিল, ১৯৩০) অবস্থা চরমে ওঠে। নবাগত কিছু বিপ্লবী বন্দীদের ওপর আলিপুর জেলের প্রহরীরা বর্বর আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য বিশেষ শ্রেণীর বন্দীরা (Special class prisoners) এর প্রতিবাদে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তুলে চিৎকার শুরু করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর প্রহরীবাহিনী সমেত Special Yard-এ এসে তাঁদের ওপরও নৃশংসভাবে আক্রমণ করে। যতীন্দ্রমোহনকে জোর করে তাঁর সেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের ওপর আক্রমণ ছিল আরও নির্মম। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে যান। সারা দেহে তিনি আঘাত পান ও তাঁর প্রবল জ্বর হয়। সত্যরঞ্জন বক্সী ও অন্য কয়েকজন সহবন্দী সুভাষচন্দ্রকে কোনওক্রমে তুলে নিয়ে তাঁর সেলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডাকার জন্যে বলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কোনও কান দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার কথা রটে যায়। এমনকি গুজব রটে যে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন মারা গেছেন। জেল গেটের বাইরে জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে সঠিক খবর জানার জন্যে। সৌভাগ্যবশত সুভাষচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতা সুভাষচন্দ্রের মনে ব্রিটিশ শাসনের চণ্ডরূপ সম্বন্ধে কী ধারণার সৃষ্টি করেছিল তা অনুমেয়। যথারীতি জেল কর্তৃপক্ষ নির্লজ্জের মতো সমস্ত ঘটনাটি অস্বীকার করে এক বিবৃতি দিয়েছিল। গান্ধীজি, জওহরলাল প্রমুখ নেতারাও একাধিক কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিন্তু সভাষচন্দ্রের মতো এত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

তাঁদের বা অন্য কোনও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাকে জেলের মধ্যে সহ্য করতে হয়েছিল বলে জানা যায় না। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত, সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও বিপ্লবীদের ওপর অবশ্য অনেক অমানবিক অত্যাচার হয়েছিল। অনেকে জেলের মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১৯৩০ সালের ২২ আগস্ট সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি তখনও কারাগারে। তাঁর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছিল। এক মাস পরে সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করেন ও পরের দিন (২৩ সেপ্টেম্বর) মেয়ররূপে বিপুল উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের সভায় মেয়ররূপে তাঁর ভাষণে প্রথমেই তিনি স্মরণ করেন দেশবন্ধুর প্রতি তাঁব অসীম ঋণ। তাঁর যদি কোনও গুণ আদৌ থাকে তা হল, তিনি (সুভাষচন্দ্র) "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এক বিশ্বস্ত এবং উৎসাহী অনুগামী।" কর্পোরেশনের সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি যে কর্মসূচীর উল্লেখ করেন তা মূলত ইতিপূর্বে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে যা কার্যকর করতে চেষ্টা করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ বিপ্লবের যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তা হিংসকই হোক বা অহিংসকই হোক। "ব্রিটিশদের সঙ্গে আমাদের অপরিহার্য কোনও বিবাদ আছে বলে আমি মনে করি না। পৃথিবীটা আমাদের উভয়ের স্থান দেওয়ার মতো যথেষ্ট বড়। আমরা স্বাধীন মানুষ এবং বন্ধুর মতো বাঁচতে চাই।" পরিশেষে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "আমরা সেই দিনটি আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছি, যে দিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র আসবে শান্তি।"

তাঁর ভাষণেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রবণতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য থেকে কোনও মতেই সরে যেতে তিনি সম্মত ছিলেন না। তিনি বলেন, তাঁর 'রাজনৈতিক অধৈর্যের' কথা কেউ কেউ তুলেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ ঠিক নয়। 'রাজনৈতিক অধৈর্য' নামক অসুখে তিনি কখনও ভুগেছেন বলে নিজে জানেন না। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অধৈর্য (impatient) হবার সমালোচনা বা অভিযোগ গান্ধীজি থেকে শুরু করে অনেক বিশিষ্ট নেতা এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরাও করেছেন। সত্যিই কিছু নীতি ও প্রশ্নে ধৈর্যের ও নমনীয়তার (flexibility) অভাব তাঁর মধ্যে ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তারই সঙ্গে বিচার্য হল, 'অধৈর্য' হওয়া মানেই একটি দোষ বা দুর্বলতা বোঝায় কি না। বাংলা অভিধানে 'অধৈর্য' কথাটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে রয়েছে— 'ব্যাকুল', 'অস্থির', 'কাতর', 'অধীর'। মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এইসব অর্থেই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে 'অধৈর্য' হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যখনই স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বার গতি ও শক্তি অর্জন করার মুখে তখনই গান্ধীজি তার রাশ টেনে ধরছেন। তিনি গণশক্তি ও বিক্ষোভকে জাগ্রত করলেও সঙ্কটমুহূর্তে আপস নীতি গ্রহণ করছেন। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের গান্ধীজির ওই নীতির প্রতিবাদ করার মতো সাহস ও নৈতিক বল নেই। এর ব্যতিক্রম জওহরলালও হতে পারেননি, যদিও এক সময় তাঁকে ও সুভাষচন্দ্রকে নবীন 'বামপন্থী'দের মুখপত্র ও নেতা রূপে চিহ্নিত করা

হয়েছিল।

বাংলার বিপ্লবী ও তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে গান্ধীজির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কতটা ক্ষোভের সৃষ্টি করছিল তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। ১৯৩০ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র রোজনামচা লিখেছিলেন। ক'দিন ধরেই রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতিহাস, দেশেব শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছিল। একদিন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েকজন 'তার্কিক' যুবকের গান্ধীজিকে নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা তর্কের পর নৃপেনবাবু বুঝতে পারলেন যে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। তরুণ বিপ্লবীরা তাঁকে প্রায় 'চরমপত্র' দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, আজকের কোনও নেতা যদি না তাঁর অনুগামীদের কথায় কান দেন তাহলে তিনি নেতৃত্ব হারাতে বাধ্য। নৃপেনবাবুও যদি তা না বোঝেন ও তাঁর মত (অবশ্যই গান্ধীজি সম্পর্কে) পরিবর্তন না করেন তাহলে তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন। এর পর আর নৃপেনবাবু ওই বিষযে আলোচনা কবেননি। এই আপাত ছোট্ট ঘটনাটি ইঙ্গিতবাহী ছিল।

গান্ধী-আবউইন চুক্তিতে সুভাষচন্দ্র খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, যেসব 'ধনী অভিজাতরা' ও আপস-মীমাংসায় উৎসুক রাজনীতিবিদরা গান্ধীজিকে ঘিবে ছিলেন তাঁরাই গান্ধীজিকে আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। ভাইসরয় আবউইনকে সুভাষচন্দ্র একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গির রাজনীতিক বলে মনে কবতেন। তাঁব মধ্যে এক স্বাভাবিক ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল বলে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী-আবউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্তগুলি তাঁর কাছে অভাবনীয় ছিল। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল তার সম্বন্ধে চুক্তিতে কার্যত কোনও উল্লেখ করা হয়নি। আসন্ন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যে শর্তে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল তাতে কংগ্রেসেব জিত হয়েছে এমন কোনও ইঙ্গিত ছিল না। সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন কোনও কংগ্রেস নেতা ছিলেন না যিনি গান্ধীজিকে প্রভাবিত করতে পারেন। একমাত্র মতিলাল নেহরু হয়তো পারতেন, কিন্তু তিনি তখন গুরুতরভাবে অসুস্থ। সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ণ এবং হতাশ হয়েছিলেন জওহরলালের ভূমিকায়। জওহরলাল একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি ওই চুক্তির কতকগুলি শর্ত অনুমোদন করেন না, কিন্তু একজন 'আজ্ঞাবহ সৈনিক' হিসেবে তিনি তা মেনে নিয়েছেন। কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে জওহরলালের বিবৃতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, জওহরলাল শুধু "একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক নন, বরং তার বেশি কিছু, দেশবাসীর এই রকমই ধারণা ছিল"।

গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্রের সমালোচনা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে বুদ্ধিমান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বুঝেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় আসতে হলে সবচেয়ে বড় ভরসা হল গান্ধীজি, কেননা, তাঁদের মতে "ভারতের ইংরাজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ" ('...the best policeman the Britisher had in India')। এই অভিমত প্রথমে ব্যক্ত করেছিলেন এলেন উইলকিনসন (Ellen Wilkinson)। তিনি ইন্ডিয়া লীগের প্রতিনিধি দলের

একজন সদস্য হিসেবে ভারত ভ্রমণে এসে (১৯৩২) ওই মন্তব্য করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস (Michael Edwardes) তাঁর 'Last Years of British India' গ্রন্থে লিখেছেন, গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করা। গান্ধীজিকে তিনি 'a neutralizer of rebellion' বলে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজি সম্বন্ধে এই অভিমত প্রশংসাসূচকই ছিল। তিনি যে প্রকৃতই অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের মধ্যেও শান্তি অব্যাহত রাখার প্রয়াসী ছিলেন, কখনই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা ভাবেননি এটা তাঁদের কাছে গান্ধীজির মহত্ত্বের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশে-বিদেশে বহু ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ মানুষ তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু সমকালীন পটভূমি ও পরিস্থিতিতে, যখন ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছে, তখন জনসাধারণের কাছে ও সুভাষচন্দ্রের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাছে গান্ধীজির ওই ভূমিকা সমর্থন করা এবং মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মতো 'বামপন্থী'দের (কথাটি বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুপযুক্ত ও অপপ্রয়োগ মনে হতে পারে) দৃষ্টিতে গান্ধীজির ওই ভূমিকা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল। জওহরলালের মতো আরো অনেকেই গান্ধীজির সিদ্ধান্তে অখুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার সাহস তাঁদের ছিল না। সুভাষচন্দ্রের ছিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির কয়েকদিন পরেই করাচিতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৩১) এই চুক্তি অনুমোদিত হয়। সুভাষচন্দ্র বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বুঝেছিলেন, করাচি কংগ্রেসে বিরোধিতা করে কোনও লাভ হবে না। ওই চুক্তির অনুমোদন অবধারিত। সুতরাং অধিবেশনে মতভেদ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে আর একটি কারণ ছিল। সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার পরও বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর বক্তৃতা-সফর অব্যাহত রেখেছিলেন। এই রকম এক সফরে মালদায় প্রবেশ করার সময় তাঁকে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানায় যে তাঁর মালদায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্য করার চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর এক সপ্তাহের কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভ করার পরই তিনি জানতে পারেন যে, আসন্ন স্বাধীনতা দিবস (২৬ জানুয়ারি, ১৯৩১) পালন উপলক্ষে কলকাতার ময়দানে কংগ্রেসের পরিকল্পিত একটি শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশ মেনে নেবার পাত্র সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। নির্দিষ্ট দিনটিতে কলকাতার মেয়ররূপে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের কার্যালয় থেকে ময়দানের মনুমেন্ট (বর্তমানে শহীদ মিনার) অভিমুখে এক শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। আক্রমণে ঘোড়সওয়ার পুলিশও যোগ দিয়েছিল। উন্মত্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশ আহত মেয়রকে লালবাজার লক-আপে বিনা চিকিৎসা, বিনা আহারে রেখে দেয়। পরের দিন আদালতে বে-আইনী সমাবেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জননিরাপত্তা বিঘ্ন করার অপরাধে তাঁর ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়। সুভাষচন্দ্র ওই বিচারের প্রহসনে কোনও অংশ নেননি। তিনি শুধু বলেন, লালবাজারের অবস্থা যে কোনও সভ্য সরকারের পক্ষে এক কলঙ্ক। লালবাজার লক-আপে, অন্যান্য জেলে ও মান্দালয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে সুভাষচন্দ্র

বন্দীদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের অবসান এবং জেলগুলির শোচনীয় অবস্থার জরুরি সংস্কার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন সুযোগ পেলেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হবেন। সে সুযোগ তিনি কখনও পাননি। আজও সেই জঘন্য মানসিকতা ও পরিবেশের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তানুসারে অহিংস আন্দোলনের জন্যে কারারুদ্ধ সব রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ (৮ই মার্চ) করেই বোম্বাই গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমগ্র পরিস্থিতি ও আসন্ন করাচি অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা করা সঙ্গত মনে করেন। বোম্বাই যাত্রার পূর্বে তিনি ঘোষণা করেন, "জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভের কথা বলব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা নেই।" গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলার পর তিনি ঠিক করবেন দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনের জন্যে কী পন্থা গ্রহণ করা উচিত। তাঁর সঙ্গে গান্ধীজির দীর্ঘ আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্র খোলাখুলি জানান যে, যতদিন গান্ধীজি স্বাধীনতার পক্ষে থাকবেন ততদিন তাঁরা তাঁকে সমর্থন জানাবেন। কিন্তু যখনই তিনি ওই লক্ষ্য থেকে সরে যাবেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের কর্তব্য হবে। আলোচনার পর গান্ধীজি আশ্বাস দেন যে, আসন্ন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমিত করার জন্যে তিনি করাচি কংগ্রেসে প্রস্তাব করবেন ; লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা ইতিপূর্বেই হয়েছে তার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও নির্দেশই প্রতিনিধিদলের প্রতি থাকবে না ; গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে যেসব রাজবন্দীর মুক্তির কথা বাদ পড়েছে তাঁদের মুক্তির জন্যে তিনি যথাসাধ্য উদ্যোগ নেবেন।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির আশ্বাসে মোটামুটি সন্তুষ্ট হন। এর পর বোম্বাই থেকে গান্ধীজি দিল্লি রওনা হলে একই ট্রেনে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যান। যাত্রাপথে গান্ধীজি যে রকম সংবর্ধনা পান তা দেখে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, গান্ধীজির জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি এত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, শ্রদ্ধা পাননি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর সকলেরই ধারণা হয়েছিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে না। কিন্তু দিল্লিতে পৌঁছেই তাঁরা শুনলেন, সরকার অভিযুক্তদের ফাঁসি দেবে বলে স্থির করেছে। গান্ধীজিকে আবার অনুরোধ করা হল তিনি যেন এই তিন বিপ্লবীর প্রাণ রক্ষার জন্যে ভাইসরয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করেন, গান্ধীজি যেন বলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ভেঙ্গে দেবেন। গান্ধীজি কিন্তু বিপ্লবী বন্দীদের জন্যে এতদূর যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তবুও সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন, মহাত্মাজি তাঁর 'যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন'। আরউইনও কোনও প্রতিশ্রুতি না দিলেও ফাঁসি স্থগিত রেখে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন বলেছিলেন। এর ফলে এই আশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ফাঁসির দণ্ডাদেশ শেষপর্যন্ত মকুব হয়ে যাবে। অন্যান্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদেরও ফাঁসি হবে না। কিন্তু সব আশা নস্যাৎ করে কলকাতা থেকে করাচি যাবার পথে সুভাষচন্দ্র ও অন্যরা চরম দুঃসংবাদ পেলেন— ভগৎ সিং ও তাঁর সহবিপ্লবীদের ২৩ মার্চ ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ সারা দেশে গভীর শোক,

বেদনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অল্প কয়েক মাস পূর্বেই যতীন দাস শহীদ হয়েছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া তখনও দেশের সর্বত্র প্রবল ছিল। করাচিতেই নিখিল ভারত নওজোয়ান সভায় (২৮ মার্চ, ১৯৩১) সুভাষচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় যতীন্দ্রনাথ দাসের শবানুগমন কেমন করে 'বিজয় অভিযানের রূপ নিয়েছিল', তা স্মরণ করে বলেন, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের জন্যে শোকের কারণ নেই। "মুক্তিলাভের পূর্বে ভারতকে আরও অনেক সন্তানহারা হতে হবে।" দুঃখের বিষয় হল আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের জীবন রক্ষা করতে আমরা ব্যর্থ।

এক নিদারুণ শোকাবহ পরিবেশে করাচিতে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়। গান্ধীজি করাচিতে পৌঁছলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। বহু যুবকের মনে হয়েছিল গান্ধীজি 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন'। এই সন্দেহ যে অমূলক তা সুভাষচন্দ্রও স্বীকার করেছেন। কিন্তু আলোচনা ভেঙ্গে দেওয়ার এবং গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করার ভয় না দেখানোয়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছিলেন ফাঁসির আদেশ কার্যকর হলেও তেমন কোনও সঙ্কট দেখা দেবে না।

করাচি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল, ভগৎ সিং-এর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে অধিবেশনে ঝড় উঠতে পারে; গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রবল বিরোধিতা হতে পারে। কিন্তু ওই রকম প্রকাশ্য বিরোধিতার (যা প্রায় বিদ্রোহের মতো হত এবং কংগ্রেসকে দ্বিধা-বিভক্ত করত) নেতৃত্ব দেবার সাহস ও শক্তি এবং সমস্ত বিরোধীদের একত্র করে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন লাভের ক্ষমতা একমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই ছিল। কিন্তু তিনি সব দিক ধীর মস্তিষ্কে বিচার-বিবেচনা করে বুঝেছিলেন ওই রকম পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের যা রাজনৈতিক চরিত্র এবং গান্ধীজির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছিল তাতে বিরোধীদের প্রস্তাব পাস হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। নতুন করে দেশজুড়ে গণ-আন্দোলন করার মতো সংগঠন, জনসমর্থন, লোকবল, অর্থবল ইত্যাদিও ছিল না। গান্ধীজির ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল, কী বিপুল তাঁর প্রভাব, সুভাষচন্দ্র তা ট্রেন-যাত্রার সময় নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং চুক্তি অনুমোদনের বিরোধিতার ফল হবে কংগ্রেস তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেসের দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ করা। এতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরই সুবিধে হত। তাই সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করেননি। তবে কংগ্রেসের বামপন্থী দল একটি বিবৃতিতে গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি তাঁদের বিরোধিতার উল্লেখ করে জানান যে, অনৈক্য সৃষ্টি না করার জন্যে তাঁর এই প্রস্তাব অধিবেশনে উত্থাপন করবেন না। কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে এই বিবৃতি সুভাষচন্দ্র দিলে চুক্তির সমর্থকরা দারুণ উল্লাস প্রকাশ করেন। তেমনি, সুভাষচন্দ্রের 'অত্যুৎসাহী' সমর্থকরা হতাশ হন।

করাচি অধিবেশনে গান্ধীজির মনোভাব অনেকটা নরম ছিল। তবুও সম্ভাব্য বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আশঙ্কায় কংগ্রেস কর্মকর্তারা (বর্তমান পরিভাষায় 'হাই কমান্ড') এক চমকপ্রদ কৌশলের আশ্রয় নেন। শহীদ ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার কিষেণ সিং-কে অধিবেশনে আমন্ত্রণ করে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থনে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুমোদন, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত ছাড়াও, আর একটি কারণে করাচি কংগ্রেসের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই কংগ্রেসে ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষার জন্যে কংগ্রেস সংগ্রাম করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ধর্ম-বর্ণের সকল বৈষম্যের অবসান, 'বেগার' প্রথার অবলুপ্তি, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, করের ভার হ্রাস এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার সঙ্কল্প করাচি কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলিতে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার শক্তিবৃদ্ধির প্রতিফলন হয়েছিল। করাচি অধিবেশনে গান্ধীজির জনপ্রিয়তার কথা সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। প্রতিদিন ভোরবেলায় মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় যে ভিড় হত তা ছিল অভূতপূর্ব। এর চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ প্রচার আর সম্ভব ছিল না বলে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনা সভার মাধ্যমে জনগণের কাছে তাঁর কথা ও আবেদন পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের কয়েক বছরে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনে ও নীতিনির্ধারণে পূর্বের তুলনায় গান্ধীজির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বেশ কিছুটা হ্রাস পেলেও, প্রার্থনা সভাগুলি প্রমাণ করতো তাঁর প্রভাব দেশবাসীর মনে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। এটাই ছিল গান্ধীজির শক্তির প্রধান উৎস। কংগ্রেস ত্যাগ করার পরে ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার সময়েও একাধিকবার সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির এই অনন্য ক্ষমতার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে এক অভিনব উৎসব পালিত হয়েছিল— 'জাতীয় পতাকা উৎসব'। ওই দিন কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে মাদ্রাজের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বুলুভাই শম্ভোমূর্তি এই উৎসবের সভাপতি ছিলেন। উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল মূলত ছাত্ররা। উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস ছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রায় দু'শ ছেলে ও মেয়ে সারিবদ্ধ ভাবে জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যান্ড ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় একটি দেশাত্মবোধক গান করে যার প্রথম ক'লাইন ছিল :

যারা যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছে ভরি, মায়ের পূজার ডালা
অস্থি-সমিধে হোমানল জ্বালি ভোলে কলঙ্ক জ্বালা,
প্রাণ বলি দিতে পূজার বেদীতে যারা সদা আগুয়ান
ত্রিবর্ণ ধ্বজা তাদেরি গর্ব ভারতের সম্মান।

এই গানটি লিখেছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং তাতে গানটির সুর দিয়েছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। যাঁরা গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন (সুরসাগর) হিমাংশু দত্ত, অনিল বাগচী, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, অনাদি দস্তিদার, আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ, সুধীরা দাশগুপ্ত, অঞ্জলি সেন, কমলা ভট্টাচার্য, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, হরিদাস গোস্বামী, বিপিনবিহারী বসু প্রমুখ। বিপিন বসু হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত বড় বড় কংগ্রেস সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। জেলেতেও তিনি 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে রাজবন্দীদের উৎসাহিত করতেন। সুভাষচন্দ্র বিপিনবাবুর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' শোনার

জন্যে তাঁকে প্রায়ই অনুরোধ করতেন। ওই স্কুলের আর এক শিক্ষক মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু) বিভিন্ন বড় বড় অধিবেশন ও সভায় গান গাইতে আমন্ত্রিত হতেন। তিনি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কাউকে কিছু না বলে ওইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তিনি সবলা দেবীচৌধুরানী ও দিলীপকুমার রায়ের কাছে গান শিখেছিলেন। মহাজাতি সদনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, হাওড়া টাউন হলে সীমান্ত গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর সভায় তিনি গান গেয়েছিলেন। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে ছাত্র ও যুবকদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে বিপিনবাবু ও বাদলবাবুর অবদান সেকালের বড় বড় নেতাদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। জাতীয় পতাকা উৎসবে যে ছাত্র ও তরুণরা গান গেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই পরে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ও গান্ধীবাদী দেশকর্মী শচীন মিত্র। সভাপতি হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই সঙ্ঘ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গীতি আলেখ্য প্রচারের কার্যসূচী নিয়েছিল। উদ্যোগী যুবকদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। তিনি নিজে সুগায়ক। সঙ্গীতে সুর দেওয়া ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুকৃতি সেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১২ সেপ্টেম্বর-১ ডিসেম্বর, ১৯৩১) কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজি যোগদান করেন। ভারতীয় নারীদের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হন সরোজিনী নাইডু। বৈঠকে গান্ধীজি জানান, প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবিধানের খুঁটিনাটি আলোচনায় কংগ্রেস আগ্রহী নয়। অযথা সময় নষ্ট না করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। ব্রিটিশ নাগরিকদের ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বৈষম্য চলবে না। উভয়ের সম-অধিকার, সম-মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে হবে। কংগ্রেসই একমাত্র সারা ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি হবার অধিকারী। অন্য সব দলের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায় বা স্বার্থের মুখপাত্র। কংগ্রেস জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনও ভেদাভেদ বিশ্বাস করে না, প্রশ্রয় দেয় না।

গান্ধীজির সারল্য, আন্তরিকতা, চারিত্রিক মাধুর্য, দৃঢ়তা ও রসবোধ বৈঠকের ভিতরে ও বাইরে রেখাপাত করলে ও প্রশংসিত হলেও বাস্তবে তাঁর দাবিগুলি কোনও গুরুত্ব পায়নি। মূল সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়। অনুন্নত ও 'দলিত' শ্রেণীর প্রতিনিধি ডঃ বি. আর. আমবেদকর, মুসলিম লীগের প্রতিনধি মহম্মদ আলি জিন্না সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবিতে অটল থাকেন। পূর্ণ হতাশা ও শূন্য হাতে গান্ধীজি দেশে ফিরে আসেন। গান্ধীজি স্বদেশে পৌঁছে (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩১) বিপুল অভ্যর্থনা পেলেও, তা অর্থহীন ছিল। সুভাষচন্দ্রও বোম্বাই গিয়েছিলেন গান্ধীজিকে স্বাগত জানাতে ও তাঁর মুখে সব কিছু শুনতে। সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। জওহরলাল স্বীকার করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজির ব্যর্থতা দেশে এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্র গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেছিলেন। গান্ধীজি প্রশ্ন করলে সুভাষচন্দ্র জানিয়ে দেন যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী জাতীয়তাবাদের মূল নীতির বিরোধী। এই নীতির ভিত্তিতে স্বরাজ লাভ অবাঞ্ছনীয়। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজিকে একমাত্র

কংগ্রেস প্রতিনিধি করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত এবং গান্ধীজি তা মেনে নেওয়ায় সুভাষচন্দ্র বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর বোধগম্য হয়নি, কী করে এরকম এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন গান্ধীজিকে "প্রায় একশ' জনের একটি সম্মেলনে, যেখানে বিচিত্র সব রকমের লোক, অনুচরবর্গ ও স্ব-নির্বাচিত নেতাগণকে দৃঢ় একটি ব্যূহের মতো (তাঁর) সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। একাকী সেখানে স্বভাবতই তিনি খুবই অসুবিধেয় পড়বেন।" প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের এবং অন্য সব ঝানু প্রতিনিধিদের সঙ্গে লড়াইতে তাঁকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না। বাস্তবে ঠিক তাই-ই ঘটেছিল।

গান্ধীজির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ক'দিন পূর্বে পুণায় মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে, গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, 'রাজানুগত, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, নামগোত্রহীন' এমন সব ব্যক্তিদেরও ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল যাঁরা ভারতের স্বাধীনতালাভ ও খাঁটি জাতীয়তাবাদীর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতেই সচেষ্ট। অথচ, এই বৈঠক হওয়া উচিত ছিল শুধুমাত্র বিবদমান দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী সিন্‌ফিন্‌দের'ও ব্রিটিশ সরকার ঠিক এমনি একটা 'ফাঁদে ফেলা'র চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিন্‌ফিন্ দল ওই ফাঁদ বুঝতে পেরে বিপদ এড়িয়েছিল। কংগ্রেস তা পারেনি। এখন গান্ধীজি দেশে ফিরলেই তাঁকে অনুরোধ জানানো জরুরি যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ভেঙেছে। ফলে যে চুক্তির 'কায়া' বিলুপ্ত হয়েছে তার 'ছায়া' আঁকড়ে চেষ্টা অর্থহীন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আদৌ যোগদান করা ঠিক হয়নি বলে সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন। আর, যদি করতেই হত, তাহলে ১৯৩০ সালে করলেই ভাল হত। উদারচেতা ভাইসরয় আরউইন বৈঠকের অনেক আগেই কার্যকাল শেষ করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল রক্ষণশীল দল। রাজনৈতিক বাতাবরণই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজি শুধুমাত্র গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজে পূর্ণ সময় ও মন না দিয়ে, ব্রিটেনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সৃষ্টির জন্যে অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন। এটা সমীচীন হয়নি। কংগ্রেসের বিরোধী প্রতিনিধিরা এর সুযোগ নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন যে, গান্ধীজিকে ইংলন্ডে মাঝে মাঝে দ্বৈত ভূমিকা নিতে হত— 'রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা ও বিশ্বোপদেষ্টার ভূমিকা'। এর ফলে, একজন রাজনৈতিক শত্রুর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত তা তিনি করতে পারেননি। অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীর নতুন প্রচারকের ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বিচারে, গান্ধীজির "উদারতা, স্পষ্টবাদিতা, বিনীত আচরণ, শত্রুপক্ষের প্রতি তাঁর সুগভীর দরদ, জন্ বুলের (ব্রিটিশ সরকার) ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং দুর্বলতা হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছিল।" গান্ধীজির অতিরিক্ত বিনয়, ব্রিটিশ সরকারের প্রায় অনুকম্পা ভিক্ষার মতো প্রকাশ্য কথাবার্তা ও ভাষণ জাতীয় কংগ্রেস তথা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্যাদা হানি করেছিল। সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন যে, গান্ধীজি ইংলণ্ড ছাড়ার পর ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচার চালিয়ে, রাজনৈতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের প্রতি যে

সহানুভূতি এবং সমর্থনের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারতেন তা তিনি করেননি। এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল ভারত ও ভারত-সংস্কৃতির পরম বন্ধু এবং গুণগ্রাহী মনীষী রোমাঁ-রোলাঁর সঙ্গে গান্ধীজির নিকট পরিচয় ও কথাবার্তা। ইতালীতে মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারকেও সুভাষচন্দ্র স্বাগত জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ও ইংলন্ডে এবং ইউরোপে গান্ধীজির ভূমিকার যে কঠোর সমালোচনা ও মূল্যায়ন সুভাষচন্দ্র করেছিলেন সে নিয়ে বিতর্কের প্রচুর অবকাশ আছে। গান্ধীজির ইংলন্ডে থাকার ও তারপর কয়েকদিনের ইউরোপ সফরের ফল প্রায় সবটুকুই নেতিবাচক হয়েছিল তা ঠিক নয়। গান্ধীজির ব্যক্তিগত উজ্জ্বল ভাবমূর্তি, অহিংস আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আস্থা, পরোক্ষভাবে ও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মর্যাদা ও ভারতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিতে যে সহায়তা করেছিল তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তারই সঙ্গে এটাও সত্য যে, গান্ধীজির গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের তাৎক্ষণিক ফল ছিল প্রায় শূন্য। আইন অমান্য আন্দোলন ও গান্ধীজির গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার ফলে যে উচ্চাশা ও উদ্দীপনা ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল তা ধূলিসাৎ হয়েছিল। এই হতাশা ও তার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের অনিবার্য গতিহীনতা স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। সেই সুযোগে এমন সব সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক দাবি আরও বৃদ্ধি পায় যা শেষপর্যন্ত আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি।

গান্ধীজির প্রত্যাবর্তনেব পরেব রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সুপরিচিত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজিকে ভাইসবয় লর্ড উইলিংডনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে বার্তা পাঠাবার সম্মতি জানায়। যদি তাতে উইলিংডন অসম্মত হন তাহলে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে বলে স্থির হয়। ইতিমধ্যেই সর্বত্র পুলিশি নির্যাতন ও দমনমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। উইলিংডন গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। এই পরিস্থিতিতে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হয়। গান্ধীজি, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হন। সরকারি চণ্ডনীতি চরম রূপ নেয়। কংগ্রেস নিষিদ্ধ সংগঠন রূপে ঘোষিত হয়। জাতীয় পত্র-পত্রিকা-সাহিত্য নিষিদ্ধ হয়। আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে আবার শুরু করার মতো সাংগঠনিক ও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। এর সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আক্রমণাত্মক নীতি অব্যাহত রাখে। তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেলায় জেলায় রাজনৈতিক সম্মেলন, বিক্ষোভ, আইন অমান্য কর্মসূচী বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এলাহাবাদে কংগ্রেসের এক শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের লাঠি চালনায় মতিলাল নেহরুর বিধবা পত্নী স্বরূপরানী গুরুতরভাবে আহত হন। এই অবস্থার মধ্যেও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দিল্লিতে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও এই সাহসী অধিবেশনের গুরুত্ব কম ছিল না।

গোলটেবিল বৈঠকে অনুন্নত শ্রেণী, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতারা পৃথক নির্বাচনী প্রথা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি তুলেছিলেন। তার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অনৈক্যের শক্তিকে বৃদ্ধি করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার কৌশলী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা' (Communal Award) ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্ত বা নীতি অনুসারে মুসলমান, শিখ ও ইউরোপীয় ভোটদাতাদের জন্যে 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী'র ব্যবস্থা করা হয়। অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত (Depressed Classes) লোকদের হিন্দুদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হবে বলে স্থির হয়। অতঃপর তারা 'তফসিলী জাতি' (Scheduled Caste) নামে পরিচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেস জাতীয় ঐক্যের প্রতীকরূপে বিবেচিত হিন্দু-মুসলমানদের 'সংযুক্ত-নির্বাচকমণ্ডলী'র দাবি (Joint Electorate) অগ্রাহ্য করে।

গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অনুন্নত শ্রেণী বা 'হরিজন'দের কল্যাণসাধন ও মর্যাদাদান ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। তিনি তাঁদের 'তফসিলী জাতি' রূপে চিহ্নিত করে হিন্দুসমাজের বহির্ভূত পৃথক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই সিদ্ধান্ত রদ করার দাবিতে তিনি যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন (২০ সেপ্টেম্বর)। পাঁচদিন পুণাতে ডঃ আমবেদকর প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতির কিছুটা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজির সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর মুখ্য নেতা ডঃ আমবেদকরের এই বোঝাপড়া 'পুণা চুক্তি' (Poona Pact) নামে পরিচিত হয়।

'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'কে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও গান্ধীজির আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মধ্যে ও হিন্দু মহাসভা প্রমুখ রাজনৈতিক দলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও তীব্র সমালোচনা সৃষ্টি করে। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই তখন কারাগারে ছিলেন। জওহরলাল গান্ধীজির অনশনের কথা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এরকম একটি প্রশ্নে গান্ধীজি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মূল সমস্যা ও দাবিকেই (স্বাধীনতার দাবি ও আন্দোলন) গৌণ করে ফেলেছেন। এর পরিণতি কী হবে ? যদি একটা বোঝাপড়া শেষপর্যন্ত হয়ও, তাহলে কী সকলে ভাববে না যে, বেশ বড় রকম যখন কিছু লাভ হয়েছে, এর পর অন্য কোনও দাবির কথা কিছুদিন অন্তত আর না তোলাই ভাল ? তা ছাড়া, আংশিক একটা বোঝাপড়া বা আপসের অর্থ কি হবে না যে, 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র মূল নীতিটাই মেনে নেওয়া হয়েছে ? অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের এত ত্যাগ, এত নির্ভীক প্রচেষ্টার এই হল পরিণতি ? এ তো দাঁড়াল যে, গান্ধীজি শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই হাত শক্ত করলেন। দেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে এক হতাশা ও অপমানবোধের সৃষ্টি করলেন।

গান্ধীজির একান্ত অনুগত ও গুণমুগ্ধ জওহরলালেরই যদি এইরকম প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তাহলে সুভাষচন্দ্রের কী মনে হয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন নয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র ও কিছুটা জটিল। সুভাষচন্দ্রকে বোম্বাই-এর অনতিদূরে কল্যাণ স্টেশনে ট্রেনেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (২ জানুয়ারি, ১৯৩২)। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে, যতদিন গান্ধীজির অনশন চলছিল ততদিন ধীরভাবে কোনও কিছু বিচার, বিবেচনা করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কী উপায়ে গান্ধীজির জীবন রক্ষা করা যায়। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' আগাগোড়াই একটি আপত্তিকর দলিল ছিল। সুতরাং তার আংশিক

সংশোধনের প্রশ্নে গান্ধীজি নিজের জীবন বিপন্ন করে সমীচীন কাজ করেছিলেন কি না সে নিয়ে মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু 'পুণা চুক্তি'র স্থায়ী মূল্য যাই হোক না কেন, একটি মানুষের জন্যে সারা জাতির হৃদয় কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, গান্ধীজির অনশনেব ফলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে গভীর প্রাণসঞ্চার হয়েছিল, হিন্দুদের মনে তা নাড়া দিয়েছিল। অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা সম্পর্কে এক গভীর ব্যাপক সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সামাজিক অন্যায়-বৈষম্য দূরীকরণের চেতনা ও আন্দোলনেব গতি ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আসলে, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক কুসংস্কাব ও উচ্চ শ্রেণীর শোষণ-উৎপীড়নেব অবলুপ্তির জন্যে সুভাষচন্দ্র নিজেও অধীব ছিলেন। জাতি গঠনের জন্যে, দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্যে তিনি এটাকে অপবিহার্য মনে কবতেন। তাই গান্ধীজির মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অনশনেব সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁব এক নৈতিক সমর্থন ও শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু অন্য দিকে, গান্ধীজিব অনশনের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের যে অপূবণীয় ক্ষতি হয়েছিল তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটিই 'অনশনেব অন্তবালে চাপা পড়ে গিয়েছিল'। এই বাস্তব দৃষ্টিতে তিনি গান্ধীজির অনশনকে স্বাধীনতা সংগ্রামেব পক্ষে খুবই ক্ষতিকব বলে মনে করেছিলেন। বিদেশে ভাবতীয়দের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও দাবি সম্পর্কে যে আগ্রহ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হচ্ছিল তাও বিঘ্নিত হয়। গান্ধীজির অনশন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্র ও লক্ষ্যের বিচাবে একটি গৌণ প্রশ্নের মাত্রাতিরিক্ত প্রচার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল।

কল্যাণ রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। মাসখানেক পর (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২) শরৎচন্দ্র বসুকেও ঝবিয়াতে গ্রেপ্তাব কবে সুভাষচন্দ্রেব সহবন্দীরূপে সিওনি জেলে প্রেরণ করা হয়। কযেক মাস পবে শবৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র উভয়কেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে জব্বলপুর জেলে পাঠানো হয়। নানান রকমের ব্যাধিতে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল। এর পর অল্পসময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসাধীনে রাখার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে জব্বলপুর থেকে মাদ্রাজ, সেখান থেকে উত্তর প্রদেশের ভাওয়ালী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, তারপর ভাওয়ালী থেকে লক্ষ্ণৌর বলরামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হয়নি। শারীরিক অসুস্থতার উপসর্গ বাড়তেই থাকে। শেষপর্যন্ত তাঁকে নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বোম্বাই থেকে এস. এস. গঙ্গে জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করেন। ৩ মার্চ তিনি ইতালীর ভেনিস শহরে পৌঁছলে তাঁকে সরকারি অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের ভীতি কতটা ছিল তা একটি গোপনীয় বার্তা (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩২) থেকে জানা যায়। সুভাষচন্দ্রকে বিদেশে যাবার অনুমতি দিলে কী বিপদ দেখা দিতে পারে সেই সম্বন্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে এই বার্তায় জানানো হয় যে, দীর্ঘদিনের এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী (extreme nationalist) সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত, যদিও বিদেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের

কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। ইউরোপে গিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ভাল হলে তিনি বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতবর্ষে ফিরে বিপ্লবের চক্রান্ত করার জাল বুনবেন। ইংলন্ডে যদি সুভাষচন্দ্রকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে তিনি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গভীর সমস্যার সৃষ্টি করবেন। চিকিৎসার জন্যে একবার দেশ ত্যাগের অনুমতি পেলে তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি দেবেন না বা দিলেও তা রক্ষা করবেন না। সুভাষচন্দ্র জাহাজে করে ইউরোপ যাত্রার সংবাদ দিয়ে লণ্ডনের 'ডেলি হেরাল্ড' লেখে (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩), "গান্ধীর কংগ্রেস আন্দোলনের পিছনে 'মস্তিষ্ক' (brain) বলে যাঁকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে সেই মানুষটি আজ এক ইতালীয় জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করেছেন।" অত্যন্ত দুর্বল, যক্ষারোগাক্রান্ত সুভাষচন্দ্রের ক'মাসে ৬৪ পাউন্ড ওজন হ্রাস পেলেও তাঁকে তাঁর মরণাপন্ন মা'কে কলকাতায় দেখতে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। জাহাজে তাঁর সঙ্গে পুলিশ অফিসাররা যান এবং জাহাজ তীর ছেড়ে বেশ কিছু দূর না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর হাতে মুক্তির আদেশপত্র দেওয়া হয়নি। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে ভারত সরকার ও তার পুলিশ বিভাগের এই ভীতি, আতঙ্ক ও তাঁর 'চক্রান্ত' করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সতর্কবাণী শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'র সব্যসাচীকে মনে করিয়ে দেয়।

মান্দালয়ের মতো সিওনি, জব্বলপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি জেলেও সুভাষচন্দ্র প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন। 'উত্তরা' ও 'পরিচয়' পত্রিকা পড়ে তাঁর ভাল লেগেছিল। থোরো, টলস্টয়, আলেকজান্ডার হারজেন প্রমুখ লেখকদের বই পাঠাতে আত্মীয় ও বন্ধুদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। লেনিনের সদ্য প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ 'দি ম্যান ফ্রম ভল্‌গা' বইটির বিজ্ঞাপন দেখে বইটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নিজের 'সত্য উপলব্ধি', সত্য ও আদর্শের জন্যে যে কোনো 'মূল্য দিতে সঙ্কল্প, আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম' লাভের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। ব্যক্ত করেছিলেন বাংলা তথা ভারতের প্রতি ভালবাসার গভীব অনুভূতির কথা। নিঃসঙ্গ কারাজীবনে নিজের মনে গাইতেন— 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' এস. এস. গঙ্গে থেকে বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মতভেদ, সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করতে, দেশকে মহত্তর করতে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন "বাংলা বাঁচলে কে মরবে, বাংলা মরলে কে বাঁচবে ?"

৩২

ভেনিসে পৌঁছবার কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে পৌঁছন। মূলত নিজের চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে যাওয়ার অনুমতি পেলেও সুভাষচন্দ্র ইউরোপে থাকাকালে ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সারা ইউরোপে আগ্রহ, সহানুভূতি ও সমর্থনের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ওই প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ কতখানি কার্যকর হয়েছিল, কীভাবে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিরুদ্ধতার মধ্যেও তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন, ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়ে তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলেন তা

এক বিস্ময়কর কাহিনী। সুদুর ইউরোপে থেকেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনের ওপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া দেশে-বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, গুরত্ব পেত। শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও সুভাষচন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব সবসময়ই প্রবলভাবে অনুভূত হত। ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকলেও তাঁকে ইংলন্ডে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দেশে ফেরার ওপরেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাঁব ইউরোপ প্রবাসের মোটামুটি পাঁচ বছরের মধ্যে (১৯৩৩-১৯৩৮) দু'বারই যখন তিনি দেশে ফিবেছেন তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ও আবার ইউরোপে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনও বিচলিত হননি। নিজের মুক্তির জন্যে সরকারের কোনও অন্যায় আদেশ, শর্ত মেনে নেননি। মান্দালয় থেকে যখন অসম্মানজনক শর্ত মেনে না নিলে তাঁর মুক্তির আশা সুদূর পরাহত সেই সময় সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "আমার মুক্তির সম্ভাবনা বিরল বলে কেউ যেন দুঃখ না করেন। সর্বোপরি আমাদের প্রিয় বাবা-মা'কে সান্ত্বনা দিন, কারণ তাঁদের ভাগ্যই সবচেয়ে কষ্টকর ; আর সেই সঙ্গে সান্ত্বনা দেবেন আর সকলকে, যাঁরা ভালবাসেন আমাকে। স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করার আগে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের...আমি নিজে শান্ত আছি এবং তাঁর (ঈশ্বরের) দেওয়া সব কষ্টের মুখোমুখি হতে পারব শান্ত মনোভাব নিয়ে। আমি আমার নিজস্ব বিনীত উপায়ে, আমাদের জাতির সমস্ত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি বলে মনে করি। আমাদের আদর্শের মৃত্যু নেই, আমাদেব আদর্শ জাতির স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে না এবং আমাদের উত্তরসূরীরা আমাদের অতি প্রিয় স্বপ্নের কথা স্মরণ করে গর্বিত বোধ করবে—এই বিশ্বাসই আমাকে আমার চিরদিনের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে।" ১৯৪৫ সালে তাঁর রহস্যময় শেষ বিদায়ের দিনটি পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র সেই প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছিলেন। বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সেই আদর্শকে। কিন্তু তাঁর প্রিয় স্বপ্নের জন্যে আজীবন দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বর্তমান প্রজন্ম কতটা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগে।

সুভাষচন্দ্র দেশ ছাড়ার পূর্ব থেকেই আইন অমান্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের কঠোর দমননীতি, নির্যাতন ও সন্ত্রাস আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধীজি, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তারও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে আহুত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেনি। তার পূর্বেই র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসকে উপেক্ষা করেই ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী আলোচনার ফলস্বরূপ ভারত-শাসন আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। এই খসড়াই বিল রূপে উত্থাপিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন (Government of India Act of 1935) রূপে বলবৎ হয়।

১৯৩৩ সালের ৮ মে গান্ধীজি 'আত্মশুদ্ধি'র জন্যে তিন সপ্তাহের অনশন শুরু করলেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে তাঁর অনুগামীরা যথেষ্ট অগ্রসর হতে ব্যর্থ

হওয়ায় তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছিল গান্ধীজির এই অনশন। তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। গান্ধীজির পরামর্শে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের বহু নেতা গান্ধীজির অনশনের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেন যে, গান্ধীজির অনশন স্বাধীনতা আন্দোলনকে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করছে। গান্ধীজি আইন অমান্যকারীদের মুক্তি দেবাব আবেদন করলেও ভাইসরয় তা প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে গান্ধীজির আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আত্মসমর্পণ তুল্য মনে হয়েছিল। কংগ্রেস কর্মীদের নৈতিক বল ক্ষুণ্ণ হয়ে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি কবেছিল। হতাশাগ্রস্ত গান্ধীজি নিজেও কংগ্রেস থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করতে থাকেন। এর ফলে হতাশা আরও ব্যাপক ও গভীরতর হয়।

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্র ও বল্লভভাই প্যাটেলের বড় ভাই বিঠলভাই প্যাটেল ভিয়েনা থেকে এক বিবৃতি দেন (মে, ১৯৩৩)। এই বিবৃতি 'বোস-প্যাটেল ঘোষণা বা ইস্তাহার' নামে খ্যাত। তাঁরা দু'জনে খোলাখুলি বলেন, "রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজি ব্যর্থ হয়েছেন।" গত তের বছরে প্রমাণিত হয়েছে, "কেবল নিজেরা দুঃখবরণ করে অথবা শত্রুকে ভালবেসে আমাদের শাসককুলের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারব সে আশা অলীক। প্রয়োজন হল সমগ্র কংগ্রেসের রূপান্তর। যদি না তা সম্ভব হয়, কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করা প্রয়োজন। অসহযোগ বর্জন নয়, বরং তার রূপ পরিবর্তন করে আরও আক্রমণাত্মক করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে হবে।" বিঠলভাই চিকিৎসার জন্যে ওই সময় ভিয়েনায় ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে স্বরাজ্যপন্থী হন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রূপে তিনি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি রূপে (১৯২৫) তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন ও মর্যাদা লাভ করেন। বিদেশে প্রচারের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতৈক্য ছিল। ডাবলিনে বিঠলভায়ের উদ্যোগে 'ইন্দো-আইরিশ লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি সুভাষচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এক সুইস স্যানাটোরিয়ামে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর উইলে এক লক্ষ টাকার অধিক সম্পদ জাতীয় কল্যাণে ও বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজের প্রচারের জন্যে রেখে যান। এই অর্থ দেখাশোনা ও ব্যয়ের দায়িত্ব তিনি সুভাষচন্দ্রকে ন্যস্ত করে যান। সুভাষচন্দ্র এই দায়িত্বভারকে এক 'পবিত্র ন্যাস' বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিঠলভাই প্যাটেলের এই শেষ ইচ্ছা সুভাষচন্দ্র পূরণ করতে পারেননি। বল্লভভাই প্যাটেল আদালতে এই উইলের বিরোধিতা করেন। আইনগত বাধায় সুভাষচন্দ্র ঐ অর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচারের কাজে ব্যয় করার সুযোগ পাননি। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বল্লভভাই প্যাটেলের বিরূপতার এটি এক দুঃখজনক ঘটনা।

১৯৩৩ সালে (১১-১২ জুন) লন্ডনে 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল কনফারেন্স'-এ (Indian Political Conference) সভাপতিত্ব করার জন্যে সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রিত হন। ব্রিটেনে প্রবেশের অনুমতি না থাকায় তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিপ্লবের কৌশল'

(Technique of Revolution)। এটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও মনোভাবকে শত্রুর কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করে বলেন যে, স্বাধীনতার পথে আপসের কোনও প্রশ্ন নেই। অসহযোগ আন্দোলনেব সময় থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের দুঃখজনক পরিণতির বিশ্লেষণ কবে গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে তিনি 'সরকারের পৌষ মাস ও জাতির সর্বনাশ' বলে বর্ণনা কবেন। ব্রিটিশ শক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় ও ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া অন্য কোনও সমাধানেব পথ খোলা নেই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে 'একটি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত দুর্গে'র সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, দুটি উপায়ে এই দুর্গ অধিকাব কবা সম্ভব · দুর্গটিকে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ করে দুর্গের সৈন্যদলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য কবা ; বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করা। কিন্তু বলপূর্বক অধিকারের কোনও চেষ্টাই আজ পর্যন্ত করা হয়নি, কেননা, 'কংগ্রেস অহিংসার অঙ্গীকারে বদ্ধ'। আব, অর্থনৈতিক অবরোধ নানান কারণে ও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে সফল হয়নি।

বর্তমান পবিস্থিতি ও পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কী কী উপায়ে শক্তিশালী ব্রিটিশ শক্তিকে পবাভূত কবা সম্ভব তাব ব্যাখ্যা করে সুভাষচন্দ্র যা বলেন তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য উপায়গুলি হল : কর ও রাজস্ব আদায়ে বাধা দান ; সঙ্কটকালে ভাবতে ব্রিটিশ সবকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য যাতে না পায় তা সুনিশ্চিত কবা , ভাবতে সৈন্যদল, পুলিশ ও সরকারী কর্মচাবীদের (যারা ভারতীয়) বিদেশী শাসকদেব প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি বিনষ্ট করে তাদের সরকারী আদেশ অমান্য কবতে উদ্বুদ্ধ কবা। আর একটি পথ হল, "অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখলেব আয়োজন কবা।" যদিও সুভাষচন্দ্র বলেন যে, "শেষ পথটি বাদ দিতে হবে কাবণ কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটি ছিল তাঁব মুখের কথা, মনের কথা নয়। ওইটুকু সতর্ক না হলে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে জেলের বাইরে একদিনের জন্যেও থাকা সম্ভব হত না। তাঁকে সব দিক থেকে 'শেষ করার' জন্যে ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থা নিত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। এর জন্যে সব রকমের প্রাথমিক মানসিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি, বিদেশে ব্যাপক প্রচাব ও সহানুভূতি অর্জন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য সব শত্রুপক্ষের সাহায্য লাভের চেষ্টা করে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই এক বড় যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। সেই যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। এতটুকু কালক্ষেপের আর সময় নেই। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র যা কিছু করেছিলেন, বলেছিলেন, যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন, যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সব কিছুর পিছনে ছিল ওই একটিই লক্ষ্য। তাঁর মধ্যে এক জরুরি চেতনাবোধ (sense of urgency) ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের প্রতি অবিচল আস্থা, আপসমূলক নীতি ও মনোভাব, যুগোপযোগী বলিষ্ঠ সামাজিক এবং আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থতা, প্রাচীনপন্থী নেতাদের দুর্বলতা সুভাষচন্দ্রকে ক্রমেই এত হতাশ করে তুলছিল যে কংগ্রেসের পক্ষে কোনও বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকর করা সম্ভব বলে তাঁর আর

আস্থা ছিল না। তিনি নতুন এক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন। আলোচ্য ভাষণে তিনি তাঁর ইঙ্গিতই শুধু দেননি, ওই রকম এক নতুন দলের সংগঠন, চরিত্র, কর্মসূচীর রূপরেখা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশকে স্বাধীন ও নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন দৃঢ়সঙ্কল্প নারী ও পুরুষ যাঁরা যে কোনও ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। প্রয়োজন নতুন নেতৃত্বের। এঁরা হবেন যুদ্ধকালীন সেনাপতিদের মতো। দেশ স্বাধীন হবার পর এক নবীন যুবগোষ্ঠীর হাতে সামগ্রিক দায়িত্ব তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের কাজ শেষ হবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রচারকার্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা, "ইংরেজরা জন্ম-প্রচারক, ইংরেজদের বন্দুকের চেয়েও প্রচারকার্য শক্তিশালী অস্ত্র।" নতুন দলটির কর্মীরা সর্বসময়ের কর্মী হবেন। তাঁরা "স্বাধীনতার উন্মাদনায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবেন...ব্যর্থতায় তাঁরা নিরুৎসাহ হবেন না, দুরূহ কাজে তাঁরা ভয় পাবেন না...জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহান এক ব্রত উদ্‌যাপনের কর্মে প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন।" সুভাষচন্দ্র তাঁর এই প্রস্তাবিত দলকে 'সাম্যবাদী সঙ্ঘ' নাম দেওয়া যেতে পারে বলেছিলেন। এটি হবে এক সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয়, সর্বভারতীয় দল। সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই দল কাজ করবে। জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষাণ সংগঠন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর সংগঠন—সকলের মধ্যেই এই দলের প্রতিনিধি থাকবে। বৃহত্তর প্রয়োজনের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গেও কাজ করতে হবে। কোনও দল বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না। দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে শাখা গঠন করতে হবে।

তাঁর প্রস্তাবিত সাম্যবাদী দলের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক স্বাধীন, শক্তিশালী, গতিশীল, উন্নত, আধুনিক ভারতবর্ষের স্বপ্ন। লক্ষণীয় হল যে, তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও দলের কথা চিন্তা করেননি। কংগ্রেসের মধ্যেই এক বৃহত্তর, উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত, স্বার্থশূন্য, সংগ্রামী গোষ্ঠী বা দলের কথা ভেবেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কয়েক বছর পরে তিনি যখন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন তখনও তিনি এক পৃথক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করেননি। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এক পৃথক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ বা ভাঙ্গন সৃষ্টি করা কখনও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কংগ্রেসকে প্রকৃত অর্থে 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গান্ধীজি, জওহরলাল ও অন্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্নে। ব্যক্তিস্বার্থ বা ক্ষমতার লড়াই-এর লেশমাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে। দুঃখের বিষয় হল সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে অনেক কংগ্রেস নেতা ও লেখক সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এই অভিযোগ এবং সমালোচনা করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। প্রসঙ্গত অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থে সুভাষ-গান্ধী বিরোধ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "শুধু পারিবারিক মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব বা মেজাজের পার্থক্য, শিক্ষার হেরফের ইত্যাদি ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে পরিবর্তনশীল বৈদেশিক পরিস্থিতির কথা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ

সংগঠনের, মত ও পথ নিয়ে পার্থক্যের কথা, ভারতীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের তারতম্যের কথা।" ত্রিপাঠী বলেছেন, তিরিশের দশকের সর্বভারতীয় এবং বাংলার রাজনীতির স্ব-বিরোধ, অনিশ্চয়তা, বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক এবং অস্তিত্বের সঙ্কট, সরকারী দমননীতির ফলে জর্জরিত, বাঙালীর এক সঙ্কটকালে, "মৃত্যুঞ্জয়ী মনোবল, আদর্শের দিগন্ত ইউরোপে অবস্থান ও ভ্রমণের ফলে প্রসারিত, কিছুটা বা বিভ্রান্ত, রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন হয়েছিল।" "উনিশ শতকের বাংলার গর্ব ও বিশ শতকের বাংলার অভিমান" সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উদ্যত খড়্গের মতো ঝলসে উঠেছিল। এই বিশ্লেষণ সুন্দর ও যথার্থ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে শুধু মাত্র বাংলার নেতা, বাঙালির গর্ব বলে দেখার যে প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীও তার থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র তিরিশের দশকে, সর্বার্থে শুধুমাত্র এক বড় মাপের সর্বভারতীয় নেতাই ছিলেন না, সারা বিশ্বে তাঁর এক বিশেষ পরিচিতি ও মর্যাদা গড়ে উঠেছিল।

'সাম্যবাদী' দল বা সঙ্ঘ নামকবণটি কিছু সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি করেছিল, এখনও তা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। 'কমিউনিজম' ও 'কমিনিউস্ট'দের সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত কী ছিল, এবং নাৎসিজম, ফ্যাসিজম সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা-চিন্তার বিষয়টি কিছু পরে আসবে। জওহরলাল নেহরুর একটি বিবৃতি (১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৩) প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদের মর্মবস্তু কী সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। জওহরলাল বলেছিলেন, "বর্তমান পৃথিবীতে হয় কোনও ধরনের কম্যুনিজমকে না হয় কেনো ধরনের ফ্যাসিজিমকে বেছে নিতে হবে...এই দুই-এর মধ্যে কোনও মধ্যপথ নেই এবং দুই-এব মধ্যে আমি কম্যুনিস্ট আদর্শকেই বাছাই করেছি।" সুভাষচন্দ্র জওহরলালের এই মতবাদকে মূলগতভাবে ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। তিনি কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজিম-এর সমন্বয় সাধনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উভয় মনোভাবেব মধ্যে মৌলিক প্রভেদ থাকলেও কোনও কোনও বিষয়ে এই দুই মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। এই সাদৃশ্যগত দিকগুলির ভিত্তিতেই দুই-এর সমন্বয় সাধন সম্ভব। এই সমন্বয়কে সুভাষচন্দ্র নামকরণ করেছিলেন : 'সাম্যবাদ বা 'The doctrine of synthesis of equality'। তাঁর মতে ভারতবর্ষে এই সমন্বয় কার্যকর করার প্রয়োজন আছে।

'কমিউনিজম', 'সোস্যালিজম', 'ফ্যাসিজম', 'নাৎসিজম' প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ তিরিশের দশকে ইউরোপে ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আলোচিত হচ্ছিল। রাষ্ট্রপরিচালনা ও শাসনব্যবস্থায় এই মতবাদগুলির সার্থক প্রয়োগ ও তার সুফল-কুফল সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষেও এর প্রভাব পড়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসে, বিপ্লবীদের মধ্যে, শ্রমিক-কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনে, যুব-ছাত্র মানসে তার প্রতিফলন ঘটছিল। কংগ্রেসের মধ্যেই 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'র (Congress Socialist Party) সৃষ্টি হয়েছিল। দুই শীর্ষস্থানীয় তরুণ নেতা—জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র—ওইসব বিভিন্ন মতাদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা শুরু করেছিলেন এবং ওই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মতাদর্শের এই বিতর্ক ও আলোড়ন জাতীয় আন্দোলনে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "কেউ কেউ বলেছেন (বা বলতেন) সুভাষ নাৎসী-ফাসিস্ত মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদি হয়ে থাকেন তবে ১৯৩৩ ও ১৯৩৮-এর মধ্যে হবেন। তার আগে নয়।" এটা ঠিক নয়। ১৯৩৩-এর আগেই সুভাষচন্দ্র এইসব মতবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা-ভাবনাচিন্তা করছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর ভাষণে (৩০ মার্চ, ১৯২৯) সুভাষচন্দ্র বলেন, "সমাজ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় কোনও মতবাদকে অভ্রান্ত ও অখণ্ড সত্য বলে মনে করা সমীচীন নয়। অধিকাংশ ism বা মতবাদের ভেতর অল্পাধিক সত্য আছে। তাই Socialism-এ সত্য যা আছে তাই আমরা চাই। কিন্তু তাই বলে Fascism-এর শৃঙ্খলা, সংঘবদ্ধতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা একেবারে বর্জনীয় নয়।" এই বক্তৃতাতেই তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় 'মার্ক্সসিজম'-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়রের ভাষণে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নীতি ও কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলেন, "আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে আমি বলব যে, আধুনিক ইউরোপ যাকে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ বলে, এই নীতি ও কর্মসূচীতে আমরা তার সমন্বয় পাই। এখানে আছে ন্যায়বিচার, সাম্য, প্রীতি, যা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, এবং তার সঙ্গে মিশে আছে ফ্যাসিবাদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলা—বর্তমান ইউরোপে তা যে অবস্থায় আছে।" কিন্তু সবকিছুর আগে যা ভারতবাসীর প্রয়োজন তা ছিল, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে, 'জাতীয়তাবাদ'—Nationalism। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে তার কাছে এই জাতীয়তাবাদই বিশেষ জরুরি ছিল। তারই সঙ্গে কোন নতুন নীতি ও আদর্শটুকু স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় ফলপ্রসূ হতে পারে, দেশকে শক্তিশালী, উন্নত, প্রকৃত প্রজাকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে তা নিয়ে তিনি নিরন্তর চিন্তা করেছিলেন। তাঁর ইউরোপ প্রবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এক বিশেষ মূল্য ছিল তাঁর জীবনে।

৩৩

ইউরোপ প্রবাসকালে সুভাষচন্দ্র ইউরোপের বহু দেশে গিয়েছিলেন, রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ্, উচ্চপদস্থ সরকাবী কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, আলোচনা করেছিলেন। তাঁর একটিই উদ্দেশ্য ছিল : ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রচার ও জনসমর্থন সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যমূলক এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা এবং অপপ্রচারের প্রতিবাদ ও তা অপসারণের জন্যে চেষ্টা করা। তাঁর ইচ্ছা ছিল সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করা। কিন্তু তিনি সোভিয়েত দেশে প্রবেশের অনুমতি পাননি। অনুমতি লাভের জন্যে তিনি খুব বেশি চেষ্টা করেননি প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, তাঁর সম্পর্কে এমনিই অভিযোগ এবং সন্দেহ ছিল যে, তিনি একজন ভয়ঙ্কর বিপ্লবী। কমিউনিস্ট বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ আছে। এখন যদি তিনি রাশিয়ায় যাবার জন্যে বেশি জেদাজেদি করতেন তাহলে ওই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হত। তাঁর পক্ষে অন্যান্য দেশে যাওয়াও অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ত। তাতে তাঁর ইউরোপ প্রবাসের বৃহত্তর

উদ্দেশ্য সিদ্ধির (চিকিৎসা ছাড়া) অন্তরায় হত। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত রাশিয়ায় বলশেভিক দলের কার্যকলাপ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের প্রকৃত মনোভাব কী, সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মনে কিছুটা সংশয় ও হতাশা দেখা দিয়েছিল। নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন, "আজ কম্যুনিস্ট মতবাদ কোনও ধরনের জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। অথচ ভারতের আন্দোলন এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—ভারতীয় জনগণের জাতীয় মুক্তির এক আন্দোলন...রাশিয়া এখন নিজ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত এবং এখনও বিপ্লবী চেহারা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে বিশ্ববিপ্লব জাগিয়ে রাখার আর আগ্রহ নেই।" সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন, নিজের অর্থনৈতিক সমস্যা ও পুনর্গঠন, জাপান-ভীতি ও বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় রাশিয়া এত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত যে, ভারতবর্ষের মতো দেশের সমস্যা নিয়ে আগ্রহ দেখাবার বিশেষ ইচ্ছে তার নেই। তাই তিনি রাশিয়ার কাছে তেমন কিছু আশা করেননি।

আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, কংগ্রেস আন্দোলন, স্বরাজ্যপন্থীদের নেতাদের মধ্যে গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি রুশ কমিউনিস্ট ও 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর মনোভাব খুবই বিরূপ ছিল। "রাশিয়ার আঁচল" ধরে চলার নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজির সঙ্গে কর্মসূচী ও নীতির প্রশ্নে তীব্র মতপার্থক্য থাকলেও, 'গান্ধী নিপাত যাক'—এই রকমের কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য সুভাষচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য তো ছিলই না—অবাঞ্ছনীয় ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে কখনও কখনও, (বিশেষ করে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে হরিপুরা এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়) ভারতীয় কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানালেও, মূলত তাঁরা আগাগোড়া সুভাষ-বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালে তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থের শেষে 'ভবিষ্যতের ইঙ্গিত' প্রসঙ্গে লেখেন, "নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে ভারতে সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন একটি সংস্করণ হয়ে উঠবে না।" আর একটি কথা তিনি বলেছিলেন যা আজকের ভারতবর্ষের পক্ষেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "রাশিয়ার ইতিহাসে গির্জা ও রাষ্ট্রের নিবিড় সম্পর্ক ও একটি ধর্মীয় সংগঠন থাকার জন্য কম্যুনিজম সেখানে ধর্ম-বিরোধী ও নাস্তিকতামূলক হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে, ভারতবাসীদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় সংগঠন না থাকায় এবং ধর্মীয় সংগঠন ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ কোনও ভাব ভারতে নেই।...উপরন্তু, ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মসংস্কার ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের সূচনা ঘটেছে।" এ ছাড়া, কম্যুনিজমের প্রধান বিষয়বস্তু—ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা—ভারতে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি যাঁরা কম্যুনিজমের অর্থনৈতিক দিকটি গ্রহণ করেন, তাঁরাও ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন না। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এই মূল্যায়ন ও 'ভবিষ্যদ্বাণী' কমিউনিস্টদের খুবই ক্ষুব্ধ করেছিল। তাঁর সম্বন্ধে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরূপ মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভবিষ্যতে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় হবে এবং 'তা ভারতবর্ষেই' হতে পারে, 'অধিকাংশ ism বা মতবাদের ভেতর অল্পাধিক সত্য আছে'—সুভাষচন্দ্রের

এরকম উক্তি অন্ধ রুশভক্ত কমিউনিস্টদের কাছে 'ঈশ্বরনিন্দা'র (Blasphemy) মতো অমার্জনীয় গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। মতাদর্শের প্রতি অন্ধভক্তি বিচারশক্তিকে কীভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে তার এক দৃষ্টান্ত হল 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি' গ্রন্থে সুধী প্রধানের মন্তব্য। তাঁর সুচিন্তিত গবেষণাধর্মী এই সাম্প্রতিক গ্রন্থে প্রবীণ মার্ক্সবাদী লেখক সুধী প্রধান অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন, 'সুভাষচন্দ্রের তীব্র দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দুঃসাহসিক বিদেশ অভিযান কেবল ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর মানুষের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে।" তিনি তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় নেতাজি সুভাষকে 'দেশগৌরব' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, "এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল না।" এমনকি সুধী প্রধান এও লিখেছেন, "আজকের দিনে আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে তাঁর মত একজন শিক্ষিত লোক মার্ক্সবাদী কম্যুনিজমের সাধারণ সূত্রগুলির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না...দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, শ্রেণী সংঘর্ষের ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রের পতনের পর ধনতন্ত্রের উত্থান, ধনতন্ত্রের বিরোধিতায় শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের অবলোপ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।"

সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনার পরিধি ও গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিজম, বলশেভিজম ইত্যাদি বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনার কিছু পরিচয় সুধী প্রধানের গ্রন্থেই রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ ও মার্ক্সিজম সম্বন্ধে তাঁর 'অজ্ঞতার' আলোচনা অপ্রয়োজন হলেও, এইটুকু স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কমিউনিজম ও সোস্যালিজমের সঙ্গে 'পুঁজিবাদ', 'ভোগবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ', 'মৌলবাদ' ইত্যাদির যে রকম বিচিত্র সমন্বয় ও সহাবস্থান পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে, তারপরে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে সম্ভাব্য সমন্বয়ের কথা সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। সুধী প্রধানের বক্তব্যের কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং উল্লেখের মূল্য উদ্দেশ্য হল, ছ' দশক পরে কমিউনিজম তথা বিশ্বের ইতিহাসে এত অচিন্তনীয় যুগান্তকারী পরিবর্তনের পরেও, যদি কমিউনিজম সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের এত তীক্ষ্ণ সমালোচনা হয়, তাহলে তিরিশের দশকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও অব্যবহিত পরে তাঁর প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব কতটা বিরূপ ছিল তা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না।

ভিয়েনার চিকিৎসকদের সুপারিশের ফলে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে যাবার অনুমতি পান। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে তিনি বার্লিনে পৌঁছন। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচী ও তৎপরতা, জার্মানদের চোখে সুভাষচন্দ্র, নাৎসী সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, হিটলার ও নাৎসী জার্মানী সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব, সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল, সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জার্মান মহাফেজখানায় ও বিভিন্ন সূত্রে যে মূল্যবান তথ্য এই বিষয়ে পাওয়া গেছে তা সঙ্কলিত করে প্রকাশ করেছেন নন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে ও রচনায়। এইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'সুভাষচন্দ্র ও নাৎসী

সরকার' এবং 'ব্রিটিশ ও জার্মানদের চোখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' গ্রন্থ দুটি। সুধী প্রধানের 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি' গ্রন্থটিও তথ্যসমৃদ্ধ।

বার্লিনে ভারত-জার্মান সোসাইটির Lothar Frank-এর সাহায্যে সুভাষচন্দ্র নাৎসী সরকারের উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। জার্মান বৈদেশিক দপ্তর তাঁকে বার্লিনে স্বাগত জানালেও তৎকালীন নাৎসী জার্মানীর পরিবেশ ভারতীয়দের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নাৎসী সরকার ইহুদি এবং ভারতীয়-সহ সব অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধার মনোভাব প্রদর্শন এবং ঘৃণ্য প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। এর মূলে ছিল হিটলারের নিজস্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি। হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম্ফ'-এ (Mein Kampf) তথাকথিত 'অনার্য' জাতিগুলির প্রতি তাঁর ঘৃণা ও অবজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন। ভারত-সমেত ওই সব জাতিকে তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ বলে অভিহিত করেন। তাঁর জাতি-বৈরিতা ও বিদ্বেষ ছিল উদগ্র। ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারকদের তিনি অল্প কিছু এশীয় 'সঙ' বা 'ভেলকিবাজ' বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উগ্র সমর্থক ছিলেন হিটলার। তিনি বলেছিলেন, "জাতি হিসেবে ইংলন্ডের গর্ব করার কারণ আছে।" এক বিন্দু রক্ত থাকতে ইংরেজরা কোনওদিন ভারতের ওপর তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে এ চিন্তা পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল বাতুলতা মাত্র। শোষিত জাতিসমূহের কোনও সংগঠনকে তিনি 'অক্ষমদের জোট' বলে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। তিনি বলেছিলেন, "মানব সমাজের জাতিগত মূল্যে বিশ্বাসী আমার মতো একজন জাতীয়তাবাদীর কাছে তথাকথিত 'শোষিত রাষ্ট্রসমূহের' জাতিগত হীনতা একান্তই স্বীকৃত।" হিটলারের আশা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ব্রিটেনের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব জার্মানী ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনে সহায়তা করবে। বলশেভিক মতবাদকে হিটলার 'মানবতা-বিরোধী এক জঘন্য অপরাধ' বলে মনে করতেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে তিনি 'নিকৃষ্ট' হিন্দুজাতির 'উন্নততর' অ্যাংলো-নর্ডিক জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এক বক্তৃতায় (২৭ জানুয়ারি, ১৯৩২) তিনি ভারতকে 'সভ্য' করা 'শ্বেত মানুষের বোঝা' (Whiteman's burden) বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এও লিখেছিলেন, "জার্মান হিসাবে আমি ভারতকে অন্য জাতের চেয়ে ব্রিটিশদের অধীনস্থই বরং দেখতে চাই।" হিটলারের এই ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা নাৎসী সরকারের বহু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জার্মান লেখকদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল।

জার্মানী যাবার পূর্বে সুভাষচন্দ্র যে স্বয়ং হিটলার ও নাৎসী সরকারের এই চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের কথা জানতেন না তা নয়। কিন্তু এর প্রকৃত রূপ ও গভীরতা কতখানি তা তিনি অনুমান করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, উপযুক্ত প্রচারের ও সঠিক তথ্যের অভাবে জার্মান সরকারের এই রকম মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং কিছু জার্মান লেখক ও বুদ্ধিজীবী নিয়মিত কুৎসা ও অপপ্রচার করে হিটলার ও নাৎসী সরকারকে বিভ্রান্ত করছে। যদি ঠিকভাবে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা যায়, সাক্ষাৎ-আলোচনায় বোঝান যায় তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হবে। সংখ্যায় কম হলেও জার্মান সরকারী মহলে ও

লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল, ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় আগ্রহী মানুষও আছেন। সরাসরি হিটলারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলে তাঁকেও তাঁর মত এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝান অসম্ভব নয়। শুধু সুভাষচন্দ্রই নন, হিটলারের ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব এবং তাঁর উগ্র বর্ণশ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের কথা জানা সত্ত্বেও বিশিষ্ট বাঙালী শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত বিধ্বস্ত জার্মানীকে অল্পসময়ের মধ্যে এক সুসংহত শক্তিশালী দেশে পরিণত করায় হিটলারের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের পরামর্শে কলকাতায় অবস্থিত জার্মান কনসাল জার্মান বৈদেশিক দপ্তরকে জানান (১৭ মে, ১৯৩৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে হিটলারের 'মেইন ক্যাম্ফ' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কীয় বিরূপ মন্তব্যগুলি বইটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। হিটলার এই প্রস্তাবে সম্মত হননি।

বার্লিনে পৌঁছে সুভাষচন্দ্র জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে ও অন্যান্য সূত্রে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। জার্মানীর খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকা 'ফ্যোকিখার বেয়োবাখটার' (Volkischer Beobachter) লেখে, "ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জার্মানদের কোনও কৌতূহলই নেই।" ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বেশ কয়েকবার জার্মানী ও ইতালীতে গিয়েছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তিনি ওই সময়ে যান। তিনি কার্যত ভারতবর্ষের, বিশেষ করে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের, বে-সরকারী রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও আত্মিক সম্পদ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে নিরলস প্রচার চালিয়ে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে তিনি জার্মানী এবং ইতালীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি। কিন্তু তাতেও তিনি হতোদ্যম হননি। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল যে, কঠিন হলেও, ভারতবর্ষের প্রতি জার্মান সরকারের মনোভাব ও নীতির সংশোধন এবং পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হবে। এই প্রচেষ্টায় তিনি কিছু কিছু বিশিষ্ট জার্মানদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জার্মান অ্যাকাডেমির ভারতীয় কমিটির প্রধান ডঃ ফ্রানজ থিয়েরফেলডার ও তাঁর বন্ধুরা। জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের মিঃ ভাইয়েকহ্ফ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডঃ স্মিডট প্রমুখ কয়েকজন অফিসার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। তাঁরা হিটলার ও নাৎসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হিটলার ও নাৎসী সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপনের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নাৎসী জার্মানীর সহানুভূতি-সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টার যৌক্তিকতা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছিল। আজও সেই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। বার্লিনে থাকার সময়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অ্যালেক্স কুরটি ও তাঁর স্ত্রী কিটি কুরটির (Alex and Kitty Kurti) বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন ইহুদি। হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ, নির্যাতন ও শেষপর্যন্ত নৃশংসতম গণহত্যা (Holocaust) আধুনিক

পৃথিবীর ইতিহাসে এক বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে আছে। কিটি কুরটি একবার সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, কী করে তিনি নাৎসীদের মতো ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, বিপজ্জনক ঠিকই, কিন্তু উপায় নেই। যে-কোনও মূল্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে হবে। ইউরোপের পচন ধরেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। ইংলন্ডে এবং জার্মানীতে যাঁরা ভালো মানুষ আছেন তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাঁর পথ তিনি স্থির করেছেন। তারপর সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী কুরটিকে প্রশ্ন করেন, "আপনাদের ধারণা আছে, কী অসীম দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা ও অবমাননায় ভারত নিমজ্জিত রয়েছে ? কী যন্ত্রণায় ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের মধ্যে ভারতবর্ষকে চলতে হচ্ছে ? তা কী আপনারা কল্পনা করতে পারেন ?" শ্রীমতী কুরটি তাঁর স্মৃতিচারণে এ কথাও জানিয়েছেন যে, সুভাষচন্দ্র নাৎসীদের ঘৃণা করতেন। কুরটি-রা পরামর্শ দিয়েছিলেন, নাজী এলাকা ছেড়ে নিরাপত্তার জন্যে অন্যত্র চলে যেতে। সুভাষচন্দ্রের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানা, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সম্ভাব্য সকল সূত্রের সন্ধান করা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পরীক্ষা করা। সুভাষচন্দ্রের এই নীতি ও প্রচেষ্টার সাফল্য-ব্যর্থতা এবং যৌক্তিকতা বিচার করার সময় একটি মূল কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। সুভাষচন্দ্র কখনও, কোথাও, কারও কাছে দেশের ও নিজের সম্মান ও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। হিটলার ও নাৎসী সরকারের কাছেও নয়, জাপানের কাছেও নয়, দেশে-বিদেশে কোনও প্রবল শক্তি বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও নয়। জার্মানীতে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এক জার্মান কূটনীতিবিদ লিখেছিলেন, "তিনি ছিলেন যেমন দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী, তেমনই তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও স্পষ্টভাষী। স্বৈরাচারী শাসকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সত্যিই তাঁর জুড়ি ছিল না।" কলকাতায় অবস্থিত জার্মান কনসাল বার্লিনে জানিয়েছিলেন (৫ মে, ১৯৩৩), "বিপ্লবী মানসিকতার সর্বাধিক সম্মানিত অন্যতম কংগ্রেস নেতা" চিকিৎসার জন্যে জার্মানী যাচ্ছেন। জার্মানীতে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার, জাতি-বিদ্বেষ, বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে তিনি গভীর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিছু কিছু জার্মান লেখকদের ভারত-বিরোধী গ্রন্থ ও রচনার তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই রকম অপপ্রচার ও মর্যাদাহানিকর লেখা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্যে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। জার্মান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই ধরনের কার্যকলাপ ও ভারত-বিরোধী মনোভাব সংযত ও সংশোধন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কার্যত জার্মান সরকার কিছুই করেননি। বরং ১৯৩৬ সালের ২৬ জানুয়ারি মিউনিখে জাতীয় সমাজতন্ত্রী ছাত্র সংগঠনের বার্ষিক উৎসবে তাঁর ভাষণে হিটলার সুস্পষ্ট করে দেন যে, আত্মজীবনীতে এবং অন্যান্য ভাষণে ও কথাবার্তায় তিনি ইতিপূর্বে যা কিছু বলেছেন তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। হিটলার 'শ্বেতকায় জাতির' উপনিবেশ স্থাপনের 'অধিকার' এবং বিশ্বশাসনের দায়িত্বের কথা সদম্ভে পুনর্ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ নির্ভরতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইংরেজরাই

ভারতীয়দের আজ্ঞাপালন করতে শিখিয়েছে। হিটলারের এই মনোভাবে সুভাষচন্দ্র কতখানি আহত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছিল ডঃ থিয়েরফেলডার (Thierfelder)-কে লেখা একটি চিঠিতে।

৩৪

১৯৩৬ সালের ২৪ মার্চ ডঃ থিয়েরফেলডার-কে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, তিনি যখন প্রথম জার্মানীতে আসেন (১৯৩৩) তখন তাঁর আশা ছিল, নিজস্ব জাতীয় শক্তি ও আত্মসম্মান বোধে নবজাগ্রত জার্মানীর একই লক্ষ্যে সংগ্রামরত অন্যান্য জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকবে। কিন্তু এখন তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, জার্মানীর নতুন জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর এবং উদ্ধত। হের হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় তাই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। জার্মানীর নতুন জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র স্বার্থপরতা এবং জাতিগত ঔদ্ধত্যকেই উৎসাহিত করছে। জার্মানীর বর্তমান পরিবেশ ভারতীয়দের পক্ষে খুবই হতাশাব্যঞ্জক। জার্মান অ্যাকাডেমি এবং ডঃ থিয়েরফেলডারের মতো অল্প কিছু ভারত-হিতৈষী মানুষ যেভাবে এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করানোব চেষ্টা করে চলেছেন তার জন্যে সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁদের ওই শুভ প্রচেষ্টার সুফলের কোনও লক্ষণ নেই। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানান যে, এখনও তিনি ভারত ও জার্মানীব মধ্যে এক সমঝোতা গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করে যেতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ভারতের আত্মসম্মানের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। সগর্বে সুভাষচন্দ্র লেখেন, "আমরা যখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করছি আমাদের স্বাধীনতা আর অধিকারের জন্য, যখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত, তখন আমরা কিছুতেই অপর কোনও জাতির কাছ থেকে অপমান কিংবা আমাদের জাতি ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ সহ্য করতে পারি না।"

নাৎসী জার্মানীতে বসে হিটলারের এরকম কঠোর সমালোচনা ও তাঁর বক্তব্যেব প্রতিবাদ কেউ করতে পারেন তা অচিন্তনীয় ছিল। শুধু এই চিঠিই নয়, হিটলারের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে একটি বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের এটি প্রথম প্রতিবাদ ছিল না। জার্মানীর মনোভাবে এবং জার্মানীতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার, অপমানকর বৈষম্যমূলক আচরণে তিনি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে ইতিপূর্বে, ১৯৩৫ সালে, তিনি ভারতে জার্মান দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। 'অ্যাডভান্স'-এ একটি প্রবন্ধে (২৫ আগস্ট, ১৯৩৫) জার্মানীতে ভারতীয় ছাত্র এবং শিক্ষানবীশদের ওপর বিধিনিষেধের প্রতিকারের জন্যে ভারতীয় রাজনৈতিক মহল এবং বাণিজ্যিক গোষ্ঠীকে প্রতিবাদ জানাতে বলেছিলেন। এর ফলে 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' তাঁদের বার্লিনের প্রতিনিধির মাধ্যমে 'রাইখ চেম্বার্স অফ কমার্স'-এর কাছে সুভাষচন্দ্রের অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেন। উত্তরে, ওই জার্মান ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আশ্বাস দেন যে, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে জার্মানরা ইচ্ছুক।

ভারতীয় ছাত্র ও শিক্ষানবীশদের কোনও রকম অসুবিধা সৃষ্টি করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়।

সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতা, সাহস ও দৃঢ়তার কোনও তুলনা ছিল না। ভালটার লাইফার, জে. এইচ. ফোক্‌ত প্রমুখ জার্মান লেখকরা সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভালটার লাইফার লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র ছিলেন "এক অসাধারণ গুণী ভারতবাসী···যেমন দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী, তেমনই তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও স্পষ্টভাষী। স্বৈরাচারী শাসকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সত্যিই তাঁর জুড়ি ছিল না।" ফোক্‌ত লিখেছেন যে, ভারতে জার্মানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় নাৎসীরা বাধ্য হয়ে তাদের মনোভাব এবং নীতি পুনর্বিবেচনা করা শুরু করে। এমনকি হিটলারও 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর সংবাদদাতা ডঃ এ. এল. সিম্‌হাকে একটি সাক্ষাৎকার দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার স্থায়ী কোনও সুফল কিন্তু হয়নি। হিটলার ও নাৎসী জার্মানীর ভারতবর্ষ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কোনও পরিবর্তন দেখা দেয়নি। যতদিন না ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ততদিন হিটলার ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও ব্রিটিশ শাসনের অনুরাগীই ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাঁর মূল বিশ্বাস ও প্রচেষ্টা ত্যাগ করেননি। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শক্তি তাতে জড়িয়ে পড়বেই ও গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়বে। তার পূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে উপযুক্ত সময়ে ব্রিটিশ শক্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যে ক'বছর সুভাষচন্দ্র ইউরোপে ছিলেন, সেই সময় তাঁর সব চিন্তা, কর্মতৎপরতা, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার পিছনে ছিল এই একটিই উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে মহানিষ্ক্রমণের পরে জার্মানীতে যাওয়া এবং হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মূলেও ছিল একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিকল্পনা।

ইউরোপে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র নিজেই লিখেছেন যে, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ইউরোপের অবস্থা প্রত্যক্ষরূপে পর্যালোচনা করা। কয়েকবার তিনি জার্মানী ও ইতালী গিয়েছিলেন। রোমে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মুসোলিনী তাঁকে ভালভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির ভিত্তিতে যে শান্তি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা যে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ছে এটা সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন। লীগ অফ নেশনস (League of Nations) বা 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ' যে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির দ্বারা এবং তাদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যার ফলে এক বিরাট সঙ্ঘর্ষ আসন্ন হয়ে পড়েছিল তা আরও নিকট থেকে, গভীরভাবে দেখা এবং বিচারের জন্যে তিনি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, বলকান রাজ্যগুলি ও অন্যান্য দেশে গিয়েছিলেন। আয়ারল্যান্ডে প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরা ও তাঁর বিশিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেছিলেন। বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ইউরোপে তাঁর দেখা ও কথাবার্তা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ।

সুভাষচন্দ্র যাতে না সহজে বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করার অনুমতি পান, অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তার জন্যে ব্রিটিশ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপে যখন যেখানে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন, ব্রিটিশ গুপ্তচররা তাঁর গতিবিধির ওপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছিল, ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতো। প্রতিটি দেশের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে লন্ডনে গোপন রিপোর্ট পাঠানো হত সুভাষচন্দ্র কী করছেন, কী বলেছেন, কার সঙ্গে দেখা করেছেন সব কিছু সম্পর্কে। যেমন, বার্লিন থেকে জানানো হয় (১৮ এপ্রিল, ১৯৩৪) যে, সুভাষচন্দ্র জার্মানীর ড্রেসডেন শহরে সফরকালে 'ড্রেসডেনার এ্যানজাইজার'-এর সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, 'ভারতের অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হল *রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্থান থেকে ইংরেজদের হটিয়ে দেওয়া।*' বসুর সাক্ষাৎকারটি ওই কাগজে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভিয়েনা থেকে রিপোর্ট যায় (২০ এপ্রিল, ১৯৩৪) যে, ভিয়েনার 'হিন্দুস্থান অ্যাকাডেমিকাল অ্যাসোসিয়েশন' কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে রয়েছে। ইনি 'আজ জীবিত সর্বাধিক ব্রিটিশ বিরোধীদের অন্যতম।' বসু এখন 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস'-এর প্রধান দফতরটি লন্ডন থেকে ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এইসব কাজকর্ম 'যথাসম্ভব সংযত করা বিশেষভাব্যে কাম্য।' বুদাপেস্ট শহরের 'পেস্টার লয়েড'-এ প্রকাশিত (৯ মে, ১৯৩৪) সুভাষচন্দ্রের একটি সাক্ষাৎকার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর বিশদ রিপোর্ট *গোপনে লন্ডনে পাঠান হয়।* এই সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেস ও দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

গান্ধীজির ভূমিকা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, গান্ধীজির প্রভাবের দু'টি দিক আছে। একদিকে তিনি নিজে এক জীবন্ত উদাহরণ। অন্যদিকে আছে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। তাঁর সততা ও মহিমময় চরিত্র জনগণের কাছে সর্বদাই এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মত ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকেই মনে করেন আরও বৈপ্লবিক ও আপসহীন হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজরা তাঁর অহিংসনীতি, মহান চরিত্র ও সততাকে শুধুমাত্র নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বৈপ্লবিক উপায়ও গ্রহণ করা ন্যায্য হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন, "হ্যাঁ, ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সব উপায়ই ন্যায্য, এমনকি বিপ্লব এবং হিংসাও।" সুভাষচন্দ্র জানান, অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের বিভেদ দূর করার প্রশ্নে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের প্রশ্নে তিনি বলেন যে, এই সমস্যা ইংরাজরা নিজেদের স্বার্থে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করেছে। ভারত স্বাধীন হলে এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। কমিউনিস্টরা গান্ধীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা 'মোটা পুঁজিবাদী ভিন্ন আর কিছু নন এবং তাঁরা চাইছেন ভারতীয় সর্বহারাদের শোষণ করতে'—এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, কংগ্রেস জনগণের দল। এই দলের নেতারা পুঁজিবাদী নন। নিজেদের জন্যে সম্পদ জমিয়ে তোলার কোনও ইচ্ছাও তাঁদের নেই। দেশের ভবিষ্যৎ

অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্যে কংগ্রেস নেতারা পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা ভাবছেন—"তা সে ইউরোপীয় কিংবা মার্কিনী যাই হোক না কেন। তাঁরা অবশ্য কমিউনিজম চান না, কারণ তা ভারতীয় জনগণের চরিত্র এবং স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" পরিশেষে সুভাষচন্দ্র হাঙ্গেরির বিভিন্ন সংগ্রামের প্রতি ভারতীয়দের সহানুভূতি ও সমর্থন জানান।

প্রাগ থেকে জানানো হয় (১৫ মে, ১৯৩৪) সুভাষচন্দ্র চেকোস্লোভাকিয়া এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্যে গঠিত 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডঃ লেসনীর উদ্বোধনী ভাষণের প্রত্যুত্তরে ভাষণ দেন। লেসনী সম্পর্কে ব্রিটিশ দূতাবাসের ওই গোপন রিপোর্টে যে রুচিহীন জঘন্য মন্তব্য করা হয়েছিল তা অবিশ্বাস্য হলেও অর্থবহ ছিল। অধ্যাপক ভিনসেন লেসনী (Vincene Lesny) ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ। রবীন্দ্রানুরাগী লেসনি কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাপনাও করেছিলেন। এইরকম একজন মানুষ সম্পর্কে ব্রিটিশ দূতাবাসের এক অফিসার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ করে লেখেন, "লেসনী একজন ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ বিরোধী (এবং একজন গাধা—অবশ্য দু'টি সর্বদাই মিশ খায়)।" এই মন্তব্য শুধুমাত্র লেসনি সম্পর্কেই নয়, পরোক্ষভাবে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও ছিল। লেসনীর মতো ভারত-হিতৈষীদের সঙ্গে যোগাযোগ, নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ভারত সম্পর্কে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নামকরা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র-পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার দেওয়া এবং তা গুরুত্ব পাওয়ায় ব্রিটিশ দূতাবাসগুলি এবং লন্ডনের কর্তৃপক্ষ মহল কতটা বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন বোধ করছিল আলোচ্য রিপোর্টটিতে তা ফুটে উঠেছিল।

রুমানিয়ার 'ডিমিনিয়েৎসা' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, এই মুহূর্তে পার্লামেন্টারী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে উন্নতি অর্জনের চেষ্টা করলেও ভারতকে মুক্ত করার জন্যে তিনি প্রতিটি পদ্ধতিই, এমনকি শক্তিপ্রয়োগও ভাল বলে মনে করেন। বিভিন্ন রাজ্যে সুভাষচন্দ্রের ভ্রমণ, সাক্ষাৎকার, আলাপ-আলোচনার প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ দূতাবাসগুলি এতই বিচলিত হয়ে পড়ছিল যে, বেলগ্রেডের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে যুগোশ্লাভিয়ার সরকারকে অনুরোধ জানায় (৯ জুন, ১৯৩৪), সংবাদপত্রগুলিকে নির্দেশ দিতে যাতে বেলগ্রেডে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতির সংবাদটুকু ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে অন্য কোনও সংবাদ ছাপা না হয়। এই সরকারী নির্দেশে কাজ হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র নাকি 'তিক্ত হতাশা' নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ত্যাগ করেন।

সোফিয়া (বুলগেরিয়া) থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসের সি. এইচ. বেনটিঙ্ক সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এক চিঠিতে (১০ জুন, ১৯৩৪) কিছু অদ্ভুত সংবাদ লন্ডনকে জানান। ওই গোপন 'তথ্য' ব্রিটিশ দূতাবাসের এক কর্মী সোফিয়ার অশ্বারোহী পুলিশের প্রধানের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করে সংগ্রহ করেছিলেন। তথ্যগুলি হল : সুভাষচন্দ্র বসু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দু'টি স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি 'সংরক্ষিত' (কথাটির অর্থ দুর্বোধ্য) পাঁচ হাজার অফিসার সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন, যারা লড়াই করেছে এবং এখন 'বৈপ্লবিক কৌশল' অনুসরণ করতে প্রস্তুত। তিনি বুলগেরিয়ান, ফরাসি এবং জার্মান ভাষায় রচিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছেন'। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন যে গান্ধীর শীঘ্রই

মৃত্যু হবে এবং তিনিই তাঁর স্থান দখল করবেন…ভারত একটি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত…তবে সম্ভবত দু' একটি বছর কেটে যেতে পারে…ভারতে চল্লিশ কোটি মানুষ রয়েছেন, তার পনেরো কোটিকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভারতের মুক্তির জন্যে লড়াইয়ে জীবন বলিদান করতে হতে পারে। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এই তথ্য এবং সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের উদ্ধৃতি কতখানি নির্ভরযোগ্য আর কতখানি ব্রিটিশ গুপ্তচরের মস্তিষ্ক প্রসূত, সান্ধ্য মজলিশের পানীয়ের প্রভাব বা ইংরাজি ভাষার অজ্ঞতার জন্যে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সঠিক মর্ম উদ্ধারের ব্যর্থতার ফল ছিল, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বুকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে সুভাষচন্দ্র ইউরোপের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ ও বিচার করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের গতিবিধির ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্যেও যেন শৈথিল্য না ঘটে সে বিষয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসগুলির ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কতটা কঠোর নির্দেশ ছিল সে সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ আছে ভিয়েনা থেকে পাঠানো এক গোপন রিপোর্টে (২৫ এপ্রিল, ১৯৩৬)। সুভাষচন্দ্র তাঁর পিছনে সব সময় গোয়েন্দা লাগিয়ে নজরদারি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভিয়েনার পুলিশের বড়কর্তাকে একটি কড়া চিঠি লিখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র শ্লেষাত্মক ভাষায় লেখেন যে, তাঁর জানা ছিল না অস্ট্রিয়া এখনও একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ! তিনি সতর্ক করে দেন যে, যদি তিনি তাঁর চিঠির কোনও সুদত্তর না পান তাহলে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা ফাঁস করে দিয়ে ভারতীয়দের অস্ট্রিয়া পর্যটন করতে আসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেবেন। পুলিশের বড়কর্তা কোনও উত্তর দেননি, কেননা তাঁর বলার মতো মুখ ছিল না। সুভাষচন্দ্র তাঁর পিছনে লেগে থাকা গোয়েন্দাদের প্রায় হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে এই সন্দেহ নিশ্চিত করার জন্যে তিনি ভিয়েনার শহরতলিতে এক বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে দুই গোয়েন্দাপ্রবরকেও তাই করতে হয়। বেচারাদের ওপর নির্দেশ ছিল কোনওমতেই সুভাষচন্দ্রকে এক নিমেষের জন্যেও চোখের আড়াল করলে চলবে না। সুভাষচন্দ্র মহাপরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকারের কতখানি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাংলার সরকার ও পুলিশ বিভাগ, ভারত সরকার, লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতম মহল এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্রিটিশ দূতাবাসগুলির দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। অনির্দিষ্টকাল বিনা বিচারে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা সহজ ছিল না। সারা দেশজুড়ে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের আশঙ্কা ছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বেশ কিছু সদস্য এই নিয়ে প্রশ্ন করে সরকারকে নাজেহাল করে তুলতেন। ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যরাও ওই সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষে সুভাষের উপস্থিতি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। ইংলন্ডেও তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিতে তাঁদের সাহস হয়নি। আশঙ্কা ছিল, ইংলন্ডের ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধী মনোভাব তীব্রতর করে তাদের সংগঠিত করে বড় রকমের সমস্যা সৃষ্টি করবেন। আবার ইউরোপেও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ভারত-হিতৈষী সংগঠন গড়ে

তুলে তিনি ক্রমেই ব্রিটিশ সরকারের দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছিলেন। সুভাষ-আতঙ্ক এমনই হয়ে পড়ছিল যে, ১৯৩৪ সালের নভেম্বরের শেষে 'পিতা জানকীনাথ মৃত্যুশয্যায়' এই তারবার্তা পেয়ে তিনি বিমানে করে স্বদেশযাত্রা করলে বাংলার সরকার ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কলকাতায় পৌঁছবার আগের দিন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বিমানবন্দরে সুভাষচন্দ্রকে এক পুলিশবাহিনী অভ্যর্থনা করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এলগিন রোডে পিতৃগৃহে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে চিকিৎসার জন্যে তিনি আবার ইউরোপে ফিরে যান। যে স্বল্প সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন তার মধ্যে একদিনের জন্যেও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদানের জন্যে সুভাষচন্দ্র আবার ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত করেন। ওই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জেনে ভিয়েনার ব্রিটিশ দূতাবাসের মাধ্যমে লিখিতভাবে সুভাষচন্দ্রকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে তাঁর অভিমত জানতে চান। উত্তরে জওহরলাল জানান যে, যদিও এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা চিরকাল মেনে নেওয়া যায় না, তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ফেরার সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অবিচল থাকেন। তিনি রোমাঁ রোলাঁকে এক চিঠিতে জানান যে, যদিও নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠদিনগুলি কারাগারে কাটাবার আশঙ্কা আছে, তবুও তিনি সরকারী হুকুমে ভীত নন। ১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল বোম্বাই-এ জাহাজ থেকে নামামাত্র তিনি গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল, বিশিষ্ট জাতীয় নেতারা, সংবাদপত্র-পত্রিকা এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। ১০ মে সারা দেশে তাঁর মুক্তির দাবিতে 'সুভাষ দিবস' পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক সভায়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হওয়ার ফলে তাঁকে কার্শিয়াঙে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়। সেখান থেকে ১৭ ডিসেম্বর তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতার মেডিকেল কলেজে আনা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৩৭ সালের ১৭ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ ছিল তাঁর স্বাস্থ্যের আশঙ্কাজনক অবনতি। কয়েকমাস পরে সুভাষচন্দ্র আবার ইউরোপ যাত্রা করেন (১৮ নভেম্বর, ১৯৩৭)।

সুভাষচন্দ্রকে পুলিশের গোপন রিপোর্টে 'ভারতের ব্রিটিশ শাসনের এক নির্দয় শত্রু' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পার্লামেন্টে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে আটকে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, "বসু একজন সন্ত্রাসবাদী এবং অন্যতম প্রধান সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা। তিনি সহিংস বিপ্লবের পক্ষে প্রচার চালান। এই বিষয়টি প্রচারের জন্য এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে জননিরাপত্তার পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে।" সরকারী বিবৃতিটি সত্য ও মিথ্যার এক সমন্বয় ছিল। সুভাষচন্দ্র সন্ত্রাসবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা, এই বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু স্বাধীন সুভাষচন্দ্র যে জনগণকে

সংগঠিত করে 'জন নিরাপত্তা' অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তার পক্ষে বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠবেন, এই বক্তব্য মিথ্যা ছিল না। কে তাদের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু তা বুঝতে ব্রিটিশ সরকারের ভুল হয়নি।

৩৫

মুসোলিনীর সঙ্গে রোমে সুভাষচন্দ্রের একাধিকবার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রোমে 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট'-এর (Oriental Institute) উদ্বোধন করেছিলেন মুসোলিনী। ইতালী সরকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এর পরই ইউরোপে প্রবাসী প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রদের সম্মেলন (Congress of Oriental Students of Europe) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ চীন, ভারত, পারস্য, আরব, ইজরাইল প্রভৃতি দেশের ছাত্রদের মুগ্ধ করেছিল। রোমে থাকাকালে মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর দু'বার সাক্ষাৎ হয়। এর পরে আর একবার উভয়ের মধ্যে পরপর তিনদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে পিতার পারলৌকিক কাজ শেষ করে ইউরোপে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ, The Indian Struggle, মুসোলিনীকে উপহার দেন।

মুসোলিনী-সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎকার ও আলোচনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ পটভূমি ছিল। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় তরুণদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এইসব ঘটনা ও বিশিষ্ট নায়কদের মধ্যে ইতালীর জনগণের ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস এবং গারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনীর নাম ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্র বাল্যকালেই ইতালীর এই দুই বীর নায়কের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। মুসোলিনী অন্যান্য দেশের মানুষ সম্বন্ধে জানতে ও যোগাযোগ করতে উৎসাহী ছিলেন। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রোমে গেলে মুসোলিনী তাঁকে সাড়ম্বর স্বাগত জানিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হয়েছিলেন। পরে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে কথাবার্তার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বের অভিমত পরিবর্তন করেন। ফ্যাসিবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে ফেরার পথে রোমে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজিও মুসোলিনীর কথাবার্তায়, তাঁর নেতৃত্বাধীনে ইতালীর উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও মনোভাবের কথা রোমাঁ রোঁলাকে জানিয়েছিলেন। অবশ্য তারই সঙ্গে এও লিখেছিলেন যে, তিনি মুসোলিনীকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। প্রখ্যাত বিপ্লবী ডঃ তারকনাথ দাস আমেরিকায় নির্বাসিত জীবনযাপন করতেন। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ' (Modern Review) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে মুসোলিনীর নেতৃত্বের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র যে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে বিশেষ আগ্রহী হবেন তা খুবই

স্বাভাবিক ছিল। ভারতের ইতালীয় দূতাবাস সূত্রে মুসোলিনীও ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সুভাষচন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তার পর ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের গুরুত্ব বোঝার পক্ষে তাঁর অসুবিধা ছিল না। তাই প্রত্যাশিতভাবেই এস. এস. গঙ্গে জাহাজে করে সুভাষচন্দ্র ভেনিসে পৌঁছলে (৩ মার্চ, ১৯৩৩) ইতালী সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান হয়।

রোমে Oriental Institute-এর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে মুসোলিনী বলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোনওদিনই মিলিত হতে পারবে না, এই অভিমত ভ্রান্ত। ইতালী ও এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক নিকটতর হবে। এরই ওপর পৃথিবীর মানুষের মুক্তি নির্ভর করবে। বলা বাহুল্য, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত শ্রোতারা মুসোলিনীর ভাষণে খুশি হয়েছিলেন। তাঁদের আতিথেয়তার সব ভার বহন করেছিলেন ইতালীর সরকার। সুভাষচন্দ্রের তখন প্রধান চিন্তা এবং লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে প্রচার করা, ইউরোপে সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিশিষ্ট নেতাদের নৈতিক সমর্থন লাভ করা। সুতরাং মুসোলিনীর মনোভাব, বক্তব্য এবং সাধারণভাবে ইতালীর অনুকূল পরিবেশ তাঁকে খুবই আকৃষ্ট এবং আশান্বিত করেছিল। সুভাষচন্দ্রকে মুসোলিনী প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন কি না যে ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাধীন হবে। সুভাষচন্দ্রের ইতিবাচক উত্তরের পর, মুসোলিনী এবার প্রশ্ন করেন, এই স্বাধীনতা আসবে কোন পথে? সংস্কারের না বিপ্লবের পথে? যখন সুভাষচন্দ্র জানান যে, বিপ্লবের পথেই দেশের স্বাধীনতা আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তখন মুসোলিনী বলেন যে, এই পথেই তা সম্ভব। সুভাষচন্দ্রের নিজের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না তা জানতে চাইলে তিনি নীরব থাকলে, মুসোলিনী বলেন, অবিলম্বে সুভাষচন্দ্রকে এরকম এক পরিকল্পনা করতে হবে এবং কাজ শুরু করতে হবে।

১৯৩৪ সালে মুসোলিনীর সঙ্গে কথাবার্তায় সুভাষচন্দ্র বেশ উৎসাহ বোধ করেছিলেন। মিলান থেকে অশোকনাথ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে (১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪) তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লেখেন, "রোমে থাকতে বড়কর্তার সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছিল। এ বিষয়টা গোপন রাখবে—তবে ডাঃ থিয়েরফেলডারকে বলতে পার। তা ছাড়া 'গভর্নর অফ রোম'-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং তাঁর সাহায্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম দেখতে পেয়েছিলাম। প্রফেসর টুচ্চি (Tucci) ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আসাতে তাঁর সঙ্গেও দেখা ও কথাবার্তা হয়েছিল। আশা করি রোমে ক্রমশ একটা ভাল আড্ডা গড়ে উঠবে।" সুভাষচন্দ্র মুসোলিনীর কথাবার্তায় এবং ইতালীকে একটি সুশৃঙ্খল, সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ রূপে গড়ে তোলায় তাঁর সাফল্য দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথও হয়েছিলেন। তাঁদের তুলনায় সুভাষচন্দ্র যে আরও বেশি হবেন তাও ছিল খুবই স্বাভাবিক। গান্ধীজিকে ব্রিটিশ সরকার কখনই (তখন তো নয়ই) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু বলে মনে করেনি। বরং ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি ও প্রসারের বিরুদ্ধে গান্ধীজির

অহিংস নীতি তাদের কাছে সহায়ক মনে হত। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে কোনও বিপ্লবী পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর সামান্যতম সম্পর্কও ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংস নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকলেও তাঁর বিপ্লবী মন ও সত্তা ছিল সংশয়াতীত, দেশ ও জাতি গঠনে সামরিক শক্তি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা, শক্তিশালী নেতৃত্ব তিনি অপরিহার্য মনে করতেন। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এর অভাব তিনি লক্ষ্য করে দুঃখিত, উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠনে সুভাষচন্দ্রের ওই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। ইউরোপের জীবনধারা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে ভারতবর্ষেও তার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি আরও গভীর ও তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। এরই প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মনে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে এক সম্ভাব্য সমন্বয়ের চিন্তায়।

সুভাষচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তায় তাঁর প্রথম বছরের ইউরোপ-প্রবাসের অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজ করছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় জেনিভা থেকে লেখা একটি চিঠিতে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪)। তিনি লিখেছিলেন, "বিজ্ঞান শিখ্‌লে চিন্তা ও কাজের অভ্যাসগুলি exact হয়। আমাদের জাতের বড় দোষ যে আমরা বড় 'লেলা-ক্ষ্যাপা'—চরিত্রের মধ্যে exactness এবং বাঁধন নেই। সেটা আনতে হলে আমাদের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই।...চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে হলে—বিবেকানন্দের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান দোষ—আমাদের একাগ্রতা নেই—concentration নেই...এই একাগ্রতার সঙ্গে চাই 'tenacity—লেগে থাকা'।" বিজ্ঞানী মন এবং একাগ্রতার সঙ্গে (যেটি পাশ্চাত্যে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন) এই চিঠিতেই তিনি আর একটি চারিত্রিক গুণ অপরিহার্য বলেছিলেন। তিনি লেখেন যে, শুধু ভালবাসার দ্বারা হীনতা ও কুটিলতাকে জয় করা যায়। নীচতার প্রতিদানে নীচতা দেখালে চলবে না, ভালবাসা ও উদারতা দেখাতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যীশু ও শ্রীচৈতন্যের কথা। তিনি বলেন, "সন্ন্যাসীর আদর্শ বাইরে নয়—প্রাণের ভিতরে। গৈরিক ধারণ করলে সন্ন্যাসী হয় না। এই যুগের জন্য যে সন্ন্যাস, সে সন্ন্যাসের অর্থ—কর্ম সন্ন্যাস। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে একটা মহান আদর্শের জন্য জীবনটা ঢেলে দিতে হবে। এর নাম নিঃস্বার্থ কর্ম।"

সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, লক্ষ্য ও জীবনসাধনা বোঝার পক্ষে এই চিঠিটির অসীম গুরুত্ব রয়েছে। সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিবাদী, নাৎসী অনুরাগী, অসহিষ্ণু, একতন্ত্রী প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়ে সেই সময়ে এবং পরেও অনেকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক পটভূমি ও পরিস্থিতিতে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মনোভাবের বিবর্তন ঘটেছিল তার যথাযথ বিশ্লেষণ তাঁর সমালোচকরা করেননি। আজও একই দৃষ্টিক্ষীণতায় (myopia) কিছু মানুষ ভুগছেন। লক্ষণীয় হল, সুভাষচন্দ্র যখন উপরোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর অল্প ক'দিন আগেই তাঁর সঙ্গে মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট ইতালীর জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত, অবমানকর

ভার্সাই চুক্তিতে লাঞ্ছিত জার্মানী কেমনভাবে অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে হিটলারের নেতৃত্বে পুনর্জীবিত হয়ে উঠছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ শাসনে শোষিত, লাঞ্ছিত, সর্বদিক থেকে বঞ্চিত নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের এক তুলনামূলক চিত্র তাঁকে বিচলিত ও চিন্তিত করেছিল। তিনি পর্যবেক্ষণ করছিলেন নবজাগ্রত জার্মানী, ইতালী, এবং মার্কসবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় এবং আর্থ-সামাজিক তত্ত্ব ও কাঠামোর কোন কোন গুণের সমন্বয় ভারতবর্ষের মতো দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনে ও পুনর্গঠনে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সমন্বয়ের অপরিহার্য উপাদান ছিল একান্তভাবে ভারতীয়। এর মূল আধার, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে, ছিল 'কর্ম সন্ন্যাস'—আদর্শের জন্যে নিঃস্বার্থ কর্ম।

জার্মানী ও ইতালীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করা, হিটলার ও মুসোলিনীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব গ্রহণ করাবার প্রচেষ্টার পিছনে আর একটি বড় কারণ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র ইউরোপে আসার কয়েক বছর পূর্বেই স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আর একটি বড় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আসন্ন। জার্মানী ও ইতালী ওই ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে থাকবে। সুতরাং ব্রিটেনের পরাক্রান্ত শত্রুশক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত কারণে বিশেষ প্রয়োজন। হিটলার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র কোনও সময়েই মোহগ্রস্ত হননি। 'ইউরোপ : আজ ও আগামীকাল'—বিশ্লেষণে (২১ আগস্ট, ১৯৩৭) তিনি হিটলারের অধীন জার্মানী 'নাৎসী দানবের আবির্ভাব' রূপে বর্ণনা করেছিলেন। মুসোলিনী সম্পর্কে বরং তাঁর ভাল ধারণা ও প্রত্যাশা জন্মেছিল। ইতালী অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করলে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা এবং রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করেছিলেন। আফ্রিকার এক স্বাধীন দেশকে এভাবে পদানত করা তাঁরা নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ বলে মনে করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রও অ্যাবিসিনিয়ার ওপর আক্রমণের সমালোচনা করেছিলেন। যদিও তার তীব্রতা কিছু কম ছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল, তিনি আশা করেছিলেন আসন্ন ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইতালী লড়াই করবে। ওই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত ব্রিটেন জয়লাভ করলেও তার সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। ইতালীর অ্যাবিসিনিয়া জয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধকে বাড়িয়ে তুলবে। আর, সেই ক্ষেত্রে আাবিসিনিয়ার পরাজয় মূল্যহীন হবে না। সুভাষচন্দ্রের আর একটি অনুমান কিন্তু নির্ভুল প্রমাণিত হয়নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, "মুসোলিনী এত সুচতুর রাজনীতিবিদ যে তিনি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে কোনও বিপজ্জনক অভিযানে নিজেকে কিংবা তাঁর দেশকে জড়িয়ে ফেলবেন না...বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হলে (ইতালী) কোনও যুদ্ধে যোগ দেবে না।" বাস্তবে কিন্তু তা ঘটেনি।

প্রাগে তৎকালীন চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড বেনেস-এর (Edward Benes) সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার মুক্তি আন্দোলন (বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়), প্রবাসে ব্রিটেন ও রাশিয়ার সহায়তায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে চেক মুক্তি বাহিনী সংগঠন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে ফেরার পথে সুভাষচন্দ্র আবার বেনেস-এর সঙ্গে (তখন তিনি রাষ্ট্রপতি) দেখা করে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ইউরোপে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জেনিভা শহরে এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল (৩ এপ্রিল, ১৯৩৫), রোলাঁকে সুভাষচন্দ্র এক 'মহান ব্যক্তি, চিন্তাবিদ—ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু' বলে শ্রদ্ধা করতেন। রোমাঁ রোলাঁ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি গান্ধীজির জীবনীও লিখেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ দুটি জীবনী-গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও সহানুভূতি ছিল। স্বৈরতন্ত্র ও মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারের অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। রোমাঁ রোঁলার সঙ্গে তাঁর গৃহে সাক্ষাৎকারের চিত্তস্পর্শী কাহিনী সুভাষচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। রোঁলাকে প্রথম দর্শনের অনুভূতি অপূর্বভাবে প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘকায় পুরুষ···বিবর্ণ মুখচ্ছবি, আশ্চর্য দুটি উজ্জ্বল তীব্র চোখ। অনেকবার ছবিতে এ মুখ দেখেছি—মানুষের দুঃখ-বেদনার ভারে অবনত সেই করুণ মুখচ্ছবি! সেই বিশীর্ণ মুখমণ্ডলে এক অপরূপ বেদনার প্রকাশ ছিল—কিন্তু তা পরাজয়ের বেদনা নয়। কারণ যে মুহূর্তে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর রক্তহীন গণ্ডদেশে রক্তাভা দেখা দিল—এক অসাধারণ জ্যোতিতে চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—আর তাঁর প্রত্যেকটি কথায় জীবন ও আশা ধ্বনিত হয়ে উঠল।"

দু'জনের মধ্যে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি, জাতীয় আন্দোলনের রূপ, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। গান্ধীজির নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর সংশয়ের কথা সুভাষচন্দ্র অকপটে ব্যক্ত করেন। রোলাঁর এই বিষয়ে কী মনোভাব ও অভিমত তিনি জানতে চান। রোলাঁ বলেন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তিনি গভীর বেদনা ও নৈরাশ্য বোধ করবেন। যদি গান্ধীজির নীতি ও পথে জাতীয় আন্দোলন ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়, তখন কি বিকল্প পথের কথা ভাবা ঠিক হবে ? সুভাষচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে রোলাঁ বলেন, "যে ভাবেই হোক সংগ্রাম চালাতেই হবে।" রোলাঁর উত্তরে সুভাষচন্দ্র খুব উৎসাহিত বোধ করেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত খোলামেলা অন্তরঙ্গ আলোচনা দীর্ঘসময় ধরে চলেছিল। শান্তিকামী, অহিংস আদর্শনিষ্ঠ রোঁলা স্বীকার করেন যে, তাঁর অন্তর্জীবনে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার অন্যতম হল এই অহিংসার প্রশ্নটি। শোষণ, সামরিক সাম্রাজ্যবাদ, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ও মানবতা বিরোধী সব অন্যায় হল এক 'চিরস্থায়ী পাপ'। এর অবসানের জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। তা না হলে 'মানবসমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী'। রোমাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর বক্তব্য সুভাষচন্দ্রকে নতুন আশা ও প্রেরণা দিয়েছিল। রোলাঁও অভিভূত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা জন্মেছিল। সুভাষচন্দ্রের কল্যাণ ও সাফল্য তিনি কামনা করতেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle 1920-1934 লন্ডনে প্রকাশিত হবার পরেই রোমাঁ রোলাঁকে পাঠিয়েছিলেন। রোলাঁ বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চিঠিতে সেই কথা জানিয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫), "ভারতে বিপ্লবের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্যপাঠ্য

গ্রন্থ...বইটিতে ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী, স্বচ্ছচিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দেখিয়েছেন। ...আপনার সব ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত না হলেও আমি স্বীকার করি আপনার যুক্তি আছে...আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করি।"

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সুনিশ্চিত কারাবাসের কথা জেনেও, সুভাষচন্দ্র স্বদেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অবিচল আছেন জেনে রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে চিঠি লিখে বলেছিলেন দেশে ফেরা স্থগিত রাখতে। ওই চিঠির উত্তরে (৮ এপ্রিল, ১৯৩৬) সুভাষচন্দ্র গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান যে, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটানোর মূল্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতাকামী মানুষদের সর্বদাই দিতে হয়েছে এবং হবে। রোলাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি লেখেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তিব প্রতি তাঁর চিন্তা ও শুভেচ্ছা শক্তি ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ।

৩৬

পোল্যান্ড ভ্রমণের সময় (১৯৩৩) সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল বেশ কিছু মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন। একটি গ্রামীণ কৃষি-বিদ্যালয় তিনি দেখতে গিয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়করা সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবার পর সুভাষচন্দ্রের কাছে খোঁজ করেন, মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন, তিনি বর্তমানে কী করছেন। পোল্যান্ডের সুদূর গ্রামাঞ্চলের এক বৃদ্ধা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে এইভাবে জানতে চাইছেন, এটি সুভাষচন্দ্রের কাছে খুবই মর্মস্পর্শী ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস'র 'প্রাচ্য বিদ্যা সমিতি' সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারত-পোল্যান্ড সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সুভাষচন্দ্র একটি পোল-ভারত সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ভারতপ্রেমিক, সংস্কৃত ও ভারতীয় সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক স্ট্যানিস্ল মিকালস্কির (Stanislaw Michalski) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মিকালস্কি পোল ভাষায় যেসব গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল 'ভগবদগীতা', 'উপনিষদ' (নির্বাচিত অংশ), ঋগ্বেদের চল্লিশটি শ্লোক, ভূমিকা ও মন্তব্যসহ মূল সংস্কৃতে ভগবদগীতা ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র পোল-ভারত সমিতি গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

রুমানিয়া ভ্রমণকালে বুখারেস্টে ডাঃ নরসিং মূলগুপ্ত নামে এক চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় ডাঃ মূলগুপ্ত রুমানিয়ার সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর বিচিত্র জীবন কাহিনী, রুমানিয়াতে খ্যাতি ও সম্মান, দীর্ঘকাল বিদেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাষা মারাঠীর প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর সাদর আতিথেয়তায় সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন।

লীগ অব নেশনস্ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের হতাশা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কুক্ষিগত এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে কিছুই করবে না তা সুভাষচন্দ্র নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন। তাই তিনি মনে

করেছিলেন অবিলম্বে ভারতের এই সংস্থা বর্জন করা উচিত। জেনিভায় অবস্থিত 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্ডিয়া' নামক একটি সংগঠনের সহযোগিতায় ইংরাজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করে ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে জনমত গড়ে তুলতে সুভাষচন্দ্র সচেষ্ট হয়েছিলেন। মাদাম ই. হোরাপ (Madame E. Horup) নামে এক ড্যানিস মহিলা এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন।

আয়ারল্যান্ডের স্বনামধন্য নেতা ও প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরা (Eamon De Vlera), তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবং বিশিষ্ট আইরিশ নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছিল। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক কর্মকৌশল সুভাষচন্দ্রকে বহু পূর্ব থেকেই আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করেছিল। তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে তিনি আইরিশ বিপ্লবী দল সিনফিন-এর বারবার উল্লেখ করেছেন। এই দলের সংগঠন, পরিচালনা ও বিদেশে প্রচারের ক্ষেত্রে দলের সভাপতি ডি. ভ্যালেরার ভূমিকার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকার ও জনগণের প্রতি তাঁর নিজের মনোভাবের ক্ষেত্রে ডি. ভ্যালেরার প্রভাবের উল্লেখ করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার ও ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রবল ইচ্ছার কথা, তিনি ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ-এর সম্পাদিকা এফ. এম. উডস্-কে কয়েক বছর পূর্বেই একটি চিঠিতে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৩) জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি না পেলে তাঁর পক্ষে আয়ারল্যান্ড ভ্রমণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শেষপর্যন্ত বহু চেষ্টার পর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল (জানুয়ারি, ১৯৩৬)।

আয়ারল্যান্ড ভ্রমণ করে, ভারতবর্ষের প্রতি আইরিশ জনগণ ও প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরার সহানুভূতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন। আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (২৩ মার্চ, ১৯৩৬) তিনি বলেন যে, আয়ারল্যান্ডে তিনি যা দেখেছেন ও শিখেছেন তা ভারতের উপযোগী ও আকর্ষণীয় হবে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়রা ইংলন্ডে যান, বছরের পর বছর ইংলন্ডে কাটান, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কখনও আয়ারল্যান্ডে যান না। অথচ, আয়ারল্যান্ড এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। আয়ারল্যান্ডের সব রাজনৈতিক দলই ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমান সহানুভূতিসম্পন্ন। আয়ারল্যান্ডের মানুষের মনে সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করে দু'টি দেশ—ভারতবর্ষ ও মিশর।

ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন যে, ইউরোপের বহু দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি সহায়তা করেছেন। যদিও ব্রিটিশ সরকার ও তাঁর সমালোচকরা সুবিধামত তাঁকে কখনও 'কমিউনিস্ট' আবার কখনও 'ফ্যাসিস্ট' বলে প্রচার করেছিলেন, তবুও তিনি ইউরোপের কিছু দেশে ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতি সহানুভূতির মনোভাব জাগাতে পেরেছিলেন। ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পেরেছিলেন। নিজের সাফল্য সম্বন্ধে কিছু লেখার ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন।

সঙ্কোচ বোধ করতেন। The Indian Struggle যখন ১৯৩৫ সালে লন্ডনে প্রথম প্রকশিত হয় তখন 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বইটি পড়ে বোঝা যায় যে সুভাষচন্দ্র 'আত্মম্ভরী' ও 'অসহিষ্ণু', এই অভিযোগ ভ্রান্ত। বইটি পড়লে তাঁব সম্বন্ধে ববং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি হবে। ইউরোপে থাকাকালে তাঁর সাফল্যের যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তিনি ওই গ্রন্থে করেছেন তা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর অভিমতের যথার্থতার এক প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে থাকাকালে সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন প্রচেষ্টার তাৎপর্য এখনও যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির রূপকার রূপে জওহরলাল নেহরু দেশে বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্রষ্টা রূপে তিনি উচ্চ প্রশংসিত। কিছুটা সমালোচিতও হয়েছেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, সমস্যাজর্জরিত, ভারতবর্ষেব মতো একটি 'উন্নতিশীল' (Developing) দেশকে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশকে 'অনুন্নত' বা 'Under-Developed' কথাটির বেশি প্রচলন ছিল) জওহরলাল নেহক বিশ্বরাজনীতিতে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই জাতীয় কংগ্রেস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির প্রতি মনোভাব এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতিরও প্রধান রূপকার রূপে জওহবলাল পরিচিত। তাঁর এই পরিচিতি ও স্বীকৃতি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর এই ক্ষেত্রে যে অবদান ছিল, গভীর ভাবনা-চিন্তা ও নিরলস প্রচেষ্টা ছিল তা আশ্চর্যজনকভাবে উপেক্ষিত ও প্রায় অজানা হয়ে আছে। ভারতবর্ষের যে সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন তা সুভাষচন্দ্রও বহুপূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিরিশের দশকে ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, অন্তর্নিহিত সম্পদ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচার করে ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা। তারই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রাও বিশ্বের অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে জানুক, আত্মশ্লাঘা ও কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্ত হোক। তাঁর লেখায়, কথায়, ভাষণে ও কাজে বারবার এটি ফুটে উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্র ইউরোপে ভারত-বিরোধী অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নিরলসভাবে চেষ্টা করেছিলেন তা মিথ্যা প্রমাণ করতে। এই প্রসঙ্গে বেলগ্রেড থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে (৩ জুন, ১৯৩৪) তিনি জানান, নানা দেশে একটি প্রচার চালান হচ্ছে যে গান্ধীজি নাকি 'অচ্ছুতদের' বিরুদ্ধে। তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তিনি অনশন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজি কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। এই অপপ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে গান্ধীজির, এবং একই সঙ্গে, কংগ্রেসের ভাবমূর্তিটি নষ্ট করা। সুভাষচন্দ্র এই জঘন্য প্রচারের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তিনি দেশবাসীকে জানান, তাঁর মতো একক ব্যক্তির পক্ষে এইরকম সুপরিকল্পিত মিথ্যাপ্রচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হল সুসংগঠিত কার্যসূচী।

'ইন্ডিয়া স্পীকস' (India Speaks) নামে একটি ভারত-বিরোধী অশালীন চলচ্চিত্র আমেরিকায় প্রদর্শিত হচ্ছিল। রোমে এক ঘরোয়া প্রদর্শনীতে ছবিটি দেখে সুভাষচন্দ্র

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ছবিটিকে মিস মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া'র চিত্রভাষ্য আখ্যা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে ছবিটির মূল সুর হল, "একমাত্র ভারতেই পাপকে পুণ্য বলে গণ্য করা হয়।" এই রকমের চলচ্চিত্র সারা ইউরোপে তৈরি করা হচ্ছে, বহু মানুষ তা দেখছে। এর কি প্রতিকার করা যায় না? সারা দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা উচিত। ভারতীয় চিত্র নির্মাতাদের ভারত-বিষয়ক উচ্চমানের চলচ্চিত্র তৈরি করা উচিত। বিদেশে ওইসব ছবি দেখাবার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। উচ্চমানের ভারতীয় ছবির বিদেশে সমাদর হবে বলে তিনি মনে করেন। প্রযোজকরা একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক লাভবানও হবেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারত-বিরোধী প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় আইন পরিষদে প্রশ্ন তোলা উচিত। 'এভরিবডি লাভ্‌স মিউজিক' (Everybody Loves Music) নামে আর একটি ছবির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, এইসব ছবি কতটা ক্ষতি করছে তা ভারতীয়রা জানে না। ছবিটির একটি দৃশ্যে দেখান হয়েছিল নিজের পোশাকে গান্ধীজি এক ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে নৃত্য করছেন।

আর একটি ভারত-বিরোধী ছবি ভিয়েনায় দেখান হচ্ছিল। ছবিটির নাম "বাঙালি"। 'রহস্যময় ভারতবর্ষের চাঞ্চল্যকর একটি চলচ্চিত্র' বলে ছবিটি বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। ছবিটিতে দেখান হয় যে, ভারতীয়রা 'ভীরু কাপুরুষ জাতি'। ইংরেজরা তাদের ত্রাণকর্তা। ভারতীয়রা স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য। ছবিটি দেখে ভিয়েনার ভারতীয়রা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। সুভাষচন্দ্র ভিয়েনার আর্চবিশপকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে (১৭ এপ্রিল, ১৯৩৫) অনুরোধ করেন ছবিটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে। এই আর্চবিশপ চলচ্চিত্র শিল্পের বিশুদ্ধির জন্যে একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। চিঠিতে যে বিশেষ কোনও কাজ হবে না তা সুভাষচন্দ্র জানতেন। কেননা, ব্রিটিশদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। তাদের অখুশি করার মতো কাজ আর্চবিশপ করবেন সে আশা সুভাষচন্দ্র করেননি। তবু এই প্রতিবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল। সুভাষচন্দ্র বলেন যে, প্রয়োজন হল বিক্ষোভের। কিন্তু ইউরোপের শহরগুলিতে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা তেমন ছিল না। সুতরাং সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হল, ব্রিটিশ সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর একটি যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "আমি জোর দিতে চাই যে পূর্ণ স্বরাজের জন্যে আর অপেক্ষা না করে পৃথিবীর বড় বড় দেশের রাজধানীগুলিতে ভারতীয় দূত নিয়োগের জন্যে আমাদের আন্দোলন শুরু করা দরকার।"

১৯৩৪ সালে ভিয়েনায় 'ইন্ডিয়ান-সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটি' গঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভারতের সঙ্গে এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বহুলাংশে ছিন্ন হয়ে যায়। নিজের এলাকা-বহির্ভূত কোনও কিছু জানবার আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু ওই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। ভারতীয়দের আগ্রহ এখন আর শুধুমাত্র ইংলণ্ডেই কেন্দ্রীভূত নয়। বিশ্বের নানান ঘটনায় ভারতকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র কাঁচামালের সরবরাহকারী দেশরূপে ভারত

পরিচিত থাকতে পারে না। ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নটি দেখতে হবে।

কংগ্রেস নেতাদের একটি বক্তব্য ছিল যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ভারত সম্পর্কে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন হল : (১) উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত প্রতিনিধিবর্গ। (২) ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল। এই মর্মে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং অন্যতম শীর্ষনেতা ভুলাভাই দেশাই-এর প্রকাশিত একটি বিবৃতির উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেন (২১ জুলাই, ১৯৩৫) এই যুক্তি ঠিকই। কিন্তু, সত্যিই যদি কাজ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রচুর টাকাকড়ি না থাকলেও কংগ্রেসের পক্ষে অনেক জরুরি কাজ করা সম্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন বহু যোগ্য, অভিজ্ঞ ভারতীয় আছেন, সংগঠন আছে, যারা কোনও টাকা-পয়সার প্রত্যাশা না করে দেশের হয়ে কাজ করে যেতে পারেন। প্রয়োজন হল, তাঁদের কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি দৃষ্টান্তরূপে বিঠলভাই প্যাটেলের নাম উল্লেখ করেন। প্রয়াত বিঠলভাই প্রায়ই বলতেন যে, কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে যদি তিনি বিদেশে কথা বলতে পারতেন তাহলে তিনি অনেক বেশি সফল হতে পারতেন। সুভাষচন্দ্র সবিনয়ে বলেন, "আমার মতো গৌণ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাও ওই একই ধবনের। টাকা-পয়সার অভাবই যদি কংগ্রেসের একমাত্র সমস্যা হয় তবে কংগ্রেস কি অন্ততপক্ষে আমাকে (এবং আমার মতো অন্যান্য কর্মীদেরও) কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবার ও কথাবার্তা বলবার অধিকার দেবেন?...আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে খুব সোজাসুজি এই প্রশ্নটি রাখলাম, এবং তাঁর কাছ থেকে অনুরূপ সোজাসুজি একটি উত্তরেরও প্রত্যাশা জানাই।"

কোনও উত্তর সুভাষচন্দ্র পাননি। সহজ সোজা উত্তরটি ছিল, তৎকালীন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বা 'হাইকমান্ড'-এর কাছে বিঠলভাই প্যাটেল বা সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন ছিলেন না। প্রশ্নাতীত আনুগত্যই তাঁদের কাছে বিচার্য ছিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু স্পষ্টই বলেছিলেন, অভ্যন্তরীণ নানা প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন, বৈদেশিক প্রচারের ক্ষেত্রে তো কোনওরকম বাধা হয়ে পড়া উচিত নয়। গান্ধীজি সম্বন্ধে যে কোনও নিন্দা সমালোচনা বা কংগ্রেস সম্বন্ধে কোনও বিরূপ কথাবার্তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একাধিকবার তিনি তাঁর কথা ও কাজের মিল প্রমাণ করেছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রায় এক বছর হয়ে গেলেও তিনি প্রয়াত বিঠলভাই প্যাটেলের উইলের প্রবেট পাননি। অথচ প্রয়াত প্যাটেল বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারের জন্যেই ওই টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

বিদেশে প্রচার সম্পর্কে কিছু কিছু মহলে আপত্তি ও বিরূপ মনোভাবের একটি কারণ ছিল যে, এই ধরনের প্রচার আসলে কোনও গোপন, বৈপ্লবিক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী ব্যাপার। এইসব কাজ করলে ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হবে এবং তা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এইরকম আশঙ্কা রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী নেতাদের আপসমূলক মনোভাবের প্রকাশ ছিল। সুভাষচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিদেশে ভারত সম্বন্ধে প্রচারের মূল লক্ষ্য হল ভারত-বিরোধী প্রচারের প্রতিবাদ করা, ভারত সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা ও অন্যান্য

দেশের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভারতের স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই হল এই প্রচারের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের গভীর ঔৎসুক্য ছিল। ভারতবর্ষে অনুরূপ সচেতনতা সৃষ্টি করা, সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। জেনিভাতে থিওসফিক্যাল সোসাইটি, বাহাই সমিতি, সুফীদের একটি ছোট কেন্দ্র, রুশ গির্জা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কোনও কেন্দ্র নেই বলে তাঁর দুঃখবোধ হয়েছিল। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্যে 'নারী আন্তর্জাতিক লীগ' দেখে তাঁর মনে হয়েছিল শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলারা এই সংস্থায় যোগ দিয়ে ভারতের অনেক উপকার করতে পারেন। অহিফেন-বিরোধী তথ্য ব্যুরোর কাজকর্মের কথা জেনে তাঁর মনে হয়েছিল এবকম একটি অহিফেন ও মাদক ভেষজ-বিরোধী (বর্তমান পরিভাষায় 'ড্রাগস') সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন ভারতবর্ষেও আছে। দণ্ডবিধির সংস্কার, বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ ও মানব অধিকার রক্ষার জন্যে ভারতবর্ষে উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কিছু করার জন্যে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ভারতীয় লেখক ও সম্পাদকরা পি. ই. এন. (Poets Editors Novelists) ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ভাবে যুক্ত হন, প্রতি বছর পি. ই. এন. কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠান, ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করাতে উদ্যোগী হন—এটা তিনি চেয়েছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মার্লরো প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়েছিল। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের জন্যে কেবলমাত্র মূলধন ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা নয়, প্রযুক্তিবিদ বিশেষজ্ঞও চাই—এই কথাটি তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন। তার জন্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু 'অসহায়ের মতো বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছে আত্মসমর্পণ' যাতে না করতে হয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথাও তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ নৈতিক পুনরুজ্জীবন ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য সুরক্ষিত করার চিন্তা মাথায় রেখে বাণিজ্যিক চুক্তি করা প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রকৃত মানবিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তায় এবং উদ্যোগে এক অভিজ্ঞ, পরিণত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

৩৭

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের মার্টিন ওয়ার্ড থেকে সুভাষচন্দ্র বিনাশর্তে মুক্তি পান। ভারত সরকার এবং বাংলা সরকার উভয়েই চায়নি যে তিনি ১৯৩৭-এর নির্বাচনোত্তর নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেইরকম সময় হিসেব করেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কয়েক মাস ডালহৌসির শৈলাবাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে বিশ্রাম নেবার পর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে

তিনি অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইনে পৌঁছন (নভেম্বর, ১৯৩৭)। সেখান থেকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি লন্ডনে যান। ইংলন্ডে প্রবেশের অনুমতি তিনি অবশেষে পেয়েছিলেন। এর পিছনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কিছু সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। ১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্রকে যখন প্রথমে চিকিৎসার জন্যে ইউরোপের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকেই টমাস উইলিয়মস, থর্প থার্টল, মর্লে, ম্যাক্সটন, গ্রেনফেল, সোরেনসন, জাগগার, হাউস অফ লর্ডসের আর্ল অফ কিননৌল প্রমুখ সদস্যরা সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে রাখা, ইউরোপে বিভিন্ন দেশে তাঁর ভ্রমণ করার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা এবং ব্রিটেনে প্রবেশ করার অনুমতি না দেওয়া সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করেছিলেন। মর্লের একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে রোনাল্ড টেনিসন পীল জানান (৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫), সুভাষচন্দ্রকে ইংলন্ডে প্রবেশ না করতে দেওয়ার অন্যতম কারণ হল, "এদেশে অনেক ভারতীয় ছাত্র আছেন যাঁদের ওপর বসু এক অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আর তাঁর উপস্থিতি গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতি সহজতর করে তুলবে।"

লর্ড কিননৌল প্রশ্ন করেছিলেন (১ ডিসেম্বর, ১৯৩৬), ব্রিটিশ সরকার কি সুভাষচন্দ্র বসুকে চিরদিন বিনাবিচারে বন্দী রাখতে চান ? এই প্রশ্নের এক দীর্ঘ উত্তরে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যান্ড বলেন, প্রশ্নকর্তা সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনা ঠিকমত জানেন না। "দুর্ভাগ্যক্রমে, অত্যন্ত কর্মদক্ষতাসম্পন্ন, সম্ভাবনাময়, প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি হয়েও মিস্টার বসু হয় ভুলক্রমে নতুবা দুর্ভাগ্যের ফলে তাঁর প্রায় সব কর্মক্ষমতা সৃজনশীল উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করছেন।" ব্রিটিশ সরকার ১৯২১-২২ সালে প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত সফরের সময়ে বয়কট ও বিক্ষোভ আন্দোলনে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ভোলেননি। সেই প্রায় সুদূর অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভারত-সচিব বলেন, "সুভাষচন্দ্র অবৈধ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সংগঠিত করার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে তার প্রকৃত কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত করা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের কাজকর্ম নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া।" তিনি আরও বলেন যে, ভিয়েনায় থাকাকালেও সুভাষচন্দ্র তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। লর্ড জেটল্যান্ডের উত্তরে এটাও বোঝা গিয়েছিল যে, আসন্ন ভারতীয় নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তিনি কারারুদ্ধ থেকে 'অনুপস্থিত প্রার্থী' রূপে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু জিতলেও, যতদিন না তাঁর ওপর সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তিনি আইনসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন না। ব্রিটিশ সরকারের সুভাষ-ভীতি কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল, ভারত-সচিবের উত্তরে তা বোঝা গিয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থ নিরাপদ এবং সুনিশ্চিত করার কথা বিবেচনা করলে এই ভীতি অমূলক ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৩২ সালের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দিলেও ওই বৈঠকের এবং পরবর্তী আলোচনার ভিত্তিতেই ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইন প্রস্তুত হয় ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি বলবৎ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়নি, নতুন

আইনে ভাইসরয়ের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতেও বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহের (Princely States) প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। দেশীয় রাজন্যবর্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবে কি না, সে সিদ্ধান্ত তাঁদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকায় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়ে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জাতীয় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে, মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস উৎসাহী নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে। সাধারণ (General) আসনগুলিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। মোট ১১টি প্রদেশের (Provinces) মধ্যে ৭টিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ ছাড়া সিন্ধু ও আসাম প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ওই দুই প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই ১৯৩৫ সালের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নতুন ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতাহীন মন্ত্রী সুনিশ্চিত করা হয়েছিল বলে তাঁর অভিমত ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া, নানান জটিল বিধি-বিধানের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সংখ্যাগত গুরুত্ব অপেক্ষা আরও অনেক বেশি প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছিল। এর ফলে যে হিন্দু সম্প্রদায় ভারতীয় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ এবং কগ্রেসের দাবিগুলির পিছনে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তাদের প্রতি বৈষম্য দেখান হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে নতুন শাসন ব্যবস্থার পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করে স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি হ্রাস করা ; সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কানি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করা ; সংখ্যালঘুদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা না করে ওই অজুহাতে মুসলিম লীগকে প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করা। সুভাষচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও জনপ্রিয়তা, আপসহীন মনোভাব এবং পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত না হওয়ার লৌহ সঙ্কল্পের কথা ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকার খুব ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্র যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা না নিতে পারেন, সরাসরি গণ-সংযোগ, গণ-আন্দোলন না করতে পারেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন তার জন্যে যা কিছু করণীয় তা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ইউরোপে থাকাকালেও সুভাষচন্দ্র ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। নিজের অভিমত ব্যক্ত করতেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে কিছুসংখ্যক সমাজবাদী কংগ্রেসকর্মী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (Congress Socialist Party) গঠন করেন। এঁরা জাতীয় কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পৃথক কোনও দল গঠন করেননি। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকদের যোগদানে উৎসাহিত করা। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার

প্রতিষ্ঠা করা। দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, সম্পূর্ণানন্দ, আবদুল বারি, এম. আর. মাসানি, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অন্যান্য পার্থক্যের মধ্যে একটি মৌলিক বিরাট পার্থক্য ছিল। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সংগঠন এবং আন্দোলন বলে মনে করতেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা কংগ্রেস দলকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী বলে দেখতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়নে কমিউনিস্টদের এটি ছিল আর এক মস্ত বড় ভুল। জওহরলাল সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল, তিনি ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং সমাজবাদী দলে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যুক্ত থাকলেও, জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণে কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। তবে গান্ধীজির নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং বিরোধিতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হচ্ছিল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট দল বা গোষ্ঠীর জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, ভারতীয় রাজনীতিতে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দল 'জঙ্গী' ভূমিকা নিতে পারবে। এক বিবৃতিতে (১৭ এপ্রিল, ১৯৩৫) তিনি জানান, কংগ্রেসের মধ্যে যে 'দক্ষিণপন্থী ঝোঁক' দেখা দিয়েছে, যে 'পার্লামেন্টারি পলিসি' গ্রহণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই এই দলের জন্ম হয়েছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় ও 'চোখ রাঙিয়ে' এই দলের শক্তি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। তবে দলের নামটির নির্বাচন তেমন ঠিক হয়নি বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 'সমাজতন্ত্র'-র নানা রূপ, রঙ, নানা অর্থ আছে। দলের ধ্যান-ধারণার মধ্যেও কিছু অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা আছে। 'মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণাগুলি' স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার সময় গ্রহণ করা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ ও আশঙ্কা ছিল। তাঁর মতে স্বাধীনতা সংগ্রামী দলেরই দেশের নতুন সংবিধান রচনায় অধিকার থাকা উচিত। সেই সাহস দেখাতে, দায়িত্ব পালন করতে সোস্যালিস্ট দল পারবে কি না সে বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তবুও ওই দলের যে 'এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি' আছে সে কথাও তিনি জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতাকে চিরতরে ঝেড়ে ফেলে আগামী ভারতবর্ষের পুরো দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নেবার দায়িত্ব সোস্যালিস্ট দল গ্রহণ করবে।" সুভাষচন্দ্রের এই প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হয়নি।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রথমে ১৯৩৬-১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। পরে এই মত পরিবর্তন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে তাঁরা ছিলেন না। এই বিরোধিতাও ফলপ্রসূ হয়নি। সুভাষচন্দ্র খুবই হতাশ হন। তিনি মনে করেছিলেন যে, শেষপর্যন্ত সোস্যালিস্টরা গান্ধী-প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল, সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন বলে ব্যাপক পরিচিত, সোস্যালিস্ট দলের আদর্শ ও লক্ষ্যের সমর্থক, কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর 'ভাবপ্রবণ রাজনীতির প্রভাব'। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েক মাস পূর্বে ইউরোপে নেহরুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দেখা

হয়েছিল। নেহরু তাঁর স্ত্রী কমলার চিকিৎসার জন্যে সেখানে গিয়েছিলেন। সুইজারল্যান্ডে এক স্বাস্থ্যনিবাসে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতেই কমলা নেহরুর মৃত্যু হয়। সুভাষচন্দ্র লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে যোগদানের সঙ্কল্পের কথা জওহরলালকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। জওহরলাল চাননি যে গ্রেপ্তার সুনিশ্চিত জেনেও সুভাষচন্দ্র ওই সময়ে দেশে যান। কিন্তু তবুও সুভাষচন্দ্র মত পরিবর্তন করেননি। চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কে তখন চিড় ধরেছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle বইটি জওহরলালকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটিতে জওহরলাল ও অন্যান্য প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কিছু বক্তব্য তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি বইটির পরবর্তী সংস্করণে কিছু কিছু সংশোধন করার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে বলেন। সুধী প্রধান ওই সময়ের নেহরু-সুভাষ সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন যে, নেহরু সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভকে, "সে যুগের প্রত্যেকটি রাজনীতি সচেতন বাঙালীর মনোভাব" বলা যায়। কথাটি বহুলাংশে সত্যি।

The Indian Struggle-এ নেহরুর সমালোচনা বেশ তীক্ষ্ণ। এর পরবর্তীকালে সুভাষের প্রতি নেহরুর বিরূপ মনোভাব, তাঁর কার্যকলাপের বিরোধিতার এটি যে অন্যতম কারণ ছিল তা মনে করলে খুব ভুল হবে না। আদর্শ ও নীতিগত বিরোধ ছাড়াও দু'জনের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব বাড়ার পিছনে দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটিও জড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন, জনপ্রিয়তায় একমাত্র গান্ধীর পরেই জওহরলালের স্থান। কিন্তু নেহরু যে বলেছেন, "ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে কোনও মধ্যপথ নেই, দু'টির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে এবং কম্যুনিজমের আদর্শই আমি বেছে নিয়েছি"—এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। জাতীয় কংগ্রেসের নয়। আর, নেহরুর জনপ্রিয়তার অর্থ এই নয় যে কংগ্রেসের সকলেই তাঁর মতামত স্বীকার করেন। স্বয়ং গান্ধীজি সম্বন্ধেও এরকম কথা বলা যাবে না। তাঁর The Indian Struggle পড়ে নেহরু যেমন খুব খুশি হননি, তেমনি জওহরলালের 'আত্মজীবনী' (An Autobiography), (এটিও ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছিল) পড়ে সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল বইটি লেখার ফলে নেহরু উদারপন্থী ইংরেজ জনগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছেন। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে এই মন্তব্যটি খুব প্রশংসাসূচক ছিল না। গান্ধীজির প্রতি জওহরলালের অটল আনুগত্যের কঠোর সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, পর পর দু'বার (১৯৩৬ এবং ১৯৩৭) নেহরু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বামপন্থী কংগ্রেসীদের আশা জেগেছিল এবার তিনি কংগ্রেসে একটা নতুন গতিশীল চিন্তা ও কর্মসূচীর সূচনা করতে পারবেন। গান্ধীজির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী একটি দল গড়তে পারবেন। কিন্তু জীবনে নেহরু কখনও 'মহাত্মার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পাননি', এখনও তা পারলেন না। সুভাষচন্দ্রের এই মন্তব্যের সবটুকু তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগে ছিল না, পরে সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু যেটুকু তাঁর বই-এর প্রথমভাগে ছিল তা সমকালীন কংগ্রেস রাজনীতি, গান্ধী-নেহরু-সুভাষের সম্পর্ক এবং তার পরবর্তী অধ্যায় বোঝার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ।

ইংলণ্ডে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই নিয়ে

পার্লামেন্টে প্রশ্ন ওঠা ছাড়াও ব্রিটিশ সংবাদপত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র 'দি নিউ স্টেটসম্যান এন্ড নেশন' (The New Statesman and Nation) পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে (৩১ আগস্ট, ১৯৩৫) তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানান। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর The Indian Struggle বইটি লন্ডনে প্রকাশিত ও ব্রিটেনে প্রচারের জন্যে অনুমতি প্রাপ্ত, অথচ বইটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ। ইংরেজ আইনের ব্যাখ্যা কি তাহলে ব্রিটেনে একরকম, আর ভারতবর্ষে আর একরকম? 'ডেইলি হেরাল্ড'-এ (Daily Herald) স্বদেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে এই সতর্কবাণীর প্রতিবাদে তাঁব বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল (২১ মার্চ, ১৯৩৬)। অন্যান্য ব্রিটিশ সংবাদপত্রেও বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'ইভনিং নিউজ' (Evening News), 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' (Evening Standard) এবং 'ইভনিং ক্রনিকল' (Evening Chronicle)-এ তাঁকে জওহরলাল নেহরুর পরবর্তী সম্ভাব্য কংগ্রেস সভাপতি রূপে উল্লেখ করা হয় (১৮ নভেম্বব ১৯৩৭)।

সুভাষচন্দ্র বসুর লন্ডনে পৌঁছনো ও বিপুল সংর্বধনার সংবাদ ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (১১ জানুয়ারি, ১৯৩৮)। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'-এ তাঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও বেবয়। পত্রিকাটির সংবাদদাতা লেখেন, "যেসব ইংরেজ প্রথম বারের মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হন, তাঁরা সকলেই তাঁর মধুর এবং শান্ত ব্যবহার আর ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর প্রত্যয় লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন।"

লন্ডনে সুভাষচন্দ্র লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যান্ড, ব্রিটিশ শ্রমিক দল (Labour Party) ও উদারনৈতিক দলের (Liberal Party) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কথাবার্তা বলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্লিমেন্ট এ্যাটলি, গ্রিনউড, বেভিন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড এ্যালেন প্রমুখ। খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হ্যারল্ড ল্যাস্কি, জে. বি. এস. হ্যালডেন, জি. ডি. এইচ. কোল, গিলবার্ট মারে প্রমুখের সঙ্গে তাঁর দেখা ও কথাবার্তা হয়েছিল। লর্ড জেটল্যান্ড কমিউনিজম সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

যে সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটেনে প্রবেশের অনুমতি দিতেই ব্রিটিশ সরকারের এত প্রবল আপত্তি ছিল, যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ব্রিটিশ দূতাবাস ও গোয়েন্দা বাহিনী লক্ষ্য করেছিল, তাঁর সঙ্গে ভারত-সচিব থেকে শুরু করে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের দেখা করতে সম্মত হওয়া এবং কথাবার্তা বলার মূল কারণ ছিল, ইতিপূর্বেই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন। সুতরাং ভাবী কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর মনোভাব জানা এবং সম্ভব হলে, তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করার ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারী মহলের ছিল। এছাড়া অন্য অনেকেই ছিলেন ভারতবন্ধু ও হিতৈষী।

লন্ডনে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা রজনী পাম দত্তকে একটি সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন সেটি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এ প্রকাশিত হয়েছিল (২৪ জানুয়ারি, ১৯৩৮)। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে রজনী পাম দত্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে ফ্যাসিজম সম্বন্ধে যা বলেছেন সে নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে, ওই নিয়ে তিনি কি কিছু বলবেন? এর উত্তরে তিনি খুব স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে যা বলেছিলেন তা আজও এই বিতর্কিত ও কিছুটা

স্পর্শকাতর বিষয়টি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য বুঝতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, "তিন বছর আগে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার পরে আমার চিন্তাধারা অনেক পরিণতি লাভ করেছে। আমি সঠিক যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল—আমরা ভারতবাসী, জাতীয় স্বাধীনতা কামনা করি এবং তা অর্জন করবার পর সোস্যালিজম অর্থাৎ সমাজবাদের পথে অগ্রসর হতে চাই। 'কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম-এর সমন্বয়' বলতে আমি এ কথাই বুঝিয়েছিলাম। হয়তো আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি সুষ্ঠু হয়নি। কিন্তু আরও একটা কথা মনে করা দরকর। আমি যখন বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের পথে অগ্রসর হতে শুরু করেনি। এবং আমার কাছে এটাই জাতীয়তাবাদের এক উগ্ররূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। আমি একথাও বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যাঁরা কমিউনিজমের পক্ষপাতী তাঁদের একটি বড় অংশ কমিউনিজমের যে রূপ প্রদর্শন করেন, তা জাতীয়তা বিরোধী বলেই আমার ধারণা। এবং তাঁদের কয়েকজন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি যে শত্রুতা প্রদর্শন করছেন তাতে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়।"

লন্ডনে থাকতেই তিনি খবর পান যে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি হরিপুরায় আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। খবর পেয়েই স্বদেশ যাত্রা করে ১৯৩৮ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি কলকাতা পৌঁছন।

৩৮

গান্ধীজি ও তাঁর অনুগত প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গভীর মতপার্থক্য সত্ত্বেও কেন সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পছন্দ করেছিলেন এই নিয়ে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। প্রায় এক দশক ধরে গান্ধী-সুভাষের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা সুবিদিত ছিল। তবুও গান্ধীজি যে সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেস সভাপতি করতে মনস্থ করেন এবং তা কংগ্রেস নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেন তাঁর অন্যতম কারণ ছিল, গান্ধীজির আশা ছিল যে এই পদ দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর প্রভাবে আনতে পারবেন। সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলেও প্রশমিত করতে পারবেন। তা ছাড়া, তেমন উল্লেখযোগ্য বিকল্প প্রার্থীও এই সময় ছিল না। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এই ব্যাখ্যাটি দিলেও আর একটি কারণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। মতপার্থক্য ও বিরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের প্রতি গান্ধীজির আন্তরিক স্নেহ ছিল। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, আদর্শনিষ্ঠা, সাহস, আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক ক্ষমতাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তেমনি সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজির অসামান্য অবদান এবং অনন্যচরিত্র সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতেন। জেনিভাতে এক সাক্ষাৎকারে (৭ জুন, ১৯৩৫) গান্ধীজির এত শক্তির পিছনে কারণগুলির বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন, "প্রসন্নচিত্তে দরিদ্র ভিখারীর মতো জীর্ণ কাপড়ের টুকরো-পরা, মাত্র নব্বই পাউন্ড ওজনের শীর্ণকায় এই মানুষটির অসীম ক্ষমতার গোপন রহস্যটি কি ? উত্তর কিন্তু খুবই সোজা। উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের দিক হতে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ এই মানুষটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার

সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম।" এমনকি ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর প্রথমে সভাপতিরূপে পদত্যাগ, পরে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অদ্বিতীয় ভূমিকার কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন। তিক্ত বিরোধ-বিতর্ক এবং তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ (যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গান্ধীজি সমর্থন করেছিলেন) সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেনি। গান্ধীজিও ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম, অদম্য সাহস ও সঙ্কল্প, দেশের মুক্তির জন্যে নিঃশেষে সব কিছু উৎসর্গ করার কোনও তুলনা নেই। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশন ও তার পরবর্তী কয়েক মাসে মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কিন্তু অচিরেই সেই সম্ভাবনা দূর হয়েছিল। গান্ধীজি যে কতটা তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌশলী রাজনীতিবিদও ছিলেন তা সুভাষচন্দ্র সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি।

করাচি বিমানবন্দরে নামার পর (২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৮) সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে পাঁচশো গাড়ি গিয়েছিল। এত ভিড় হয়েছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে যে তিনি বেরতে পারেননি। বিমানবন্দরের ওপরের বারান্দা থেকে তাঁকে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে ভাষণ দিতে হয়েছিল।

গুজরাটের তাপ্তি নদীর ধারে হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন হয় (১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮)। বিঠলভাই প্যাটেলের স্মৃতিতে কংগ্রেস অধিবেশন স্থলের নামকরণ হয়েছিল 'বিঠল নগর'। অধিবেশনস্থল ও মঞ্চটি অপরূপভাবে সজ্জিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু। রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও অপরূপ শিল্পকলা, চিত্রাঙ্কন ও দৃষ্টিনন্দন অধিবেশন প্রাঙ্গণ ও মঞ্চসজ্জার জন্যেও হরিপুরা কংগ্রেস খ্যাত হয়ে আছে। হরিপুরায় যাবার পথে সুভাষচন্দ্র অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পান। হরিপুরা থেকে একটি প্রাচীন সুসজ্জিত রথে তাঁকে বিঠল নগরে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। রথটি টেনেছিল একান্নটি বলীবর্দ। হাজার হাজার মানুষ ভেঙে পড়েছিল সুভাষচন্দ্রকে এবং ওই শোভাযাত্রা দেখতে। মাত্র দু' মাইল পথ অতিক্রম করতে লেগেছিল দু' ঘণ্টা। স্বতঃস্ফূর্ত অভূতপূর্ব জন-সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ পেয়েই সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন, "এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে ভারতকে বিশ্বের সম্মুখে অধিকতর রূপে উপস্থাপিত করতে হবে। কারণ ভারতের সমস্যা, বিশ্বের সমস্যা। প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সঙ্গে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর কেবল ভারতের মুক্তিই নির্ভর করে না, বিশ্বের উৎপীড়িত মানুষের মুক্তিও নির্ভর করবে।" তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সকল শক্তিকে একটি 'ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে'। হরিপুরা কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির ভাষণেরও অন্যতম প্রধান সুরও ছিল একই।

সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর সমর্থক ও সমালোচক এবং বর্তমান কালের সকল ঐতিহাসিক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনেতারূপে এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি

মতিলাল নেহরুর পত্নী স্বরূপরানী নেহরু, জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসাবে মহান হলেও, তিনি সম্ভবত মহত্তর ছিলেন দেশপ্রেমিক হিসেবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে গভীর স্নেহ করতেন ও তাঁর পরম শুভার্থী ছিলেন। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচলিত ধারা অতিক্রম করে তিনি আন্তরিকতা এবং গভীর আবেগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশন ধর্মঘটের ফলে রাজনৈতিক বন্দী হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যুর উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমি শুধু আপনাদের এই প্রশ্নই করতে চাই যে 'ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু গলিত' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কি না যার ফলে যতীন দাস, সর্দার মহাবীর সিং, রামকৃষ্ণ নমদাস, মোহিতমোহন মৈত্র, হরেন্দ্র মুন্সী এবং অন্যান্যদের মতো উজ্জ্বল ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষেরা বেঁচে না থেকে মৃত্যুবরণের আগ্রহ বোধ করেন।" এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একমাত্র যতীন দাস ছাড়া অন্য কোনও অনশনে মৃত্যুবরণকারী শহীদের নাম প্রায় অনুল্লেখিত।

বিশ্ব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ-নীতির উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমার সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশের উদ্ভাবনী শক্তি ভারত বিভাগ করাব জন্যে এবং সেই ভাবে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করার জন্যে অন্য কোনও সাংবিধানিক কৌশল খুঁজে বার করবে।" ১৯৩৫ সালের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে, ব্রিটিশ সরকার যে ভারত-বিভাগের উদ্যোগ নেবে এই সতর্কবাণী সুভাষচন্দ্রের ভাষণে ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের আন্দোলনে কংগ্রেসকে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত কবতে হবে বলে তিনি জোর দেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলির মধ্যে ছিল : ধর্ম, জাতি, বর্ণ কিংবা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের আইনের চোখে সমান মর্যাদা ও স্বীকৃতি, ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা ; সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ; অনুন্নত শ্রেণীগুলি এবং মুসলমান ও সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ ও অধিকাব সুরক্ষা। সুভাষচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "কংগ্রেস সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বক্ষার জন্যে প্রস্তুত।" স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দেশবাসীকে আরও সংগ্রামের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তিনি বলেন স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস দলের লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত—এই মতে তিনি বিশ্বাস করেন না। যে দল দেশকে স্বাধীন করছে সেই দলেরই দায়িত্ব হল দেশকে পুনর্গঠন করা ও সংবিধান রচনা করা। এর ফলে দেশ এক স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই আশঙ্কা অমূলক। রাশিয়া, জার্মানী ও ইতালীতে যে তা ঘটেছে তার কারণ ওইসব দেশে আছে একটি মাত্র দল। আর সেই দলের, যেমন জার্মানীর নাৎসী পার্টির, নিজস্ব গণতান্ত্রিক ভিত্তি নেই। দল 'নেতৃ-নীতি'র ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু কংগ্রেস দলের ভিত্তি ও সংগঠন হল গণতান্ত্রিক। ভারতবর্ষে একাধিক দল আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ এক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

হরিপুরা ভাষণের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতবর্ষের সার্বিক পুনর্গঠনের জন্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজনীয়তা এবং তার জন্যে এক

সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দান। সুভাষচন্দ্র বলেন, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধিদূরীকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই করা সম্ভব। এর জন্যে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার দু'টি অংশ থাকবে—একটি অব্যবহিত কর্মসূচী এবং আর একটি দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মসূচী। জাতীয় ঐক্য সম্পাদনের জন্যে জাতীয় ভাষা ও একটি সাধারণ লিপির উন্নয়ন করতে হবে। বিমান, টেলিফোন, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের কাছে আনতে হবে। একটি সাধারণ শিক্ষা-নীতির মাধ্যমে সমগ্র জনসাধারণের মনে এক জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় ভাষা ও একই লিপির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রোমান লিপি গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। এই সমস্যাটি ও লিপি মনোনয়ের প্রশ্নটি 'সর্বপ্রকার বিদ্বেষমুক্ত মনে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ ভিত্তিতে' বিবেচনা করা দরকার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাব চাপ সহ্য করা ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে উল্লেখ করে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেন। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্যে জমিদারি প্রথার অবসান, ভূমি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা, রাষ্ট্রের মালিকানায় ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনার অপরিহার্যতার কথা বলেন। শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিক শিল্পায়নের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বলেন, "আমরা যতই আধুনিক শিল্পায়ন অপছন্দ করি এবং তার সমবেত কুফলগুলির নিন্দা করি, আমরা আর ইচ্ছে করলেও শিল্পপূর্বযুগে ফিরে যেতে পারি না।" কিন্তু কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র অতীতে ভারতের সঙ্গে যেসব দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল সেই সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। দেশে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা এবং গণশক্তিকে সুসংহত করার ওপর তিনি জোর দেন। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভাগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ওই সংগঠনগুলিতে বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীদের যোগদান করা জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তা না হলে শ্রমিক এবং কৃষকরা কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচীতে অনুপ্রাণিত হবে না, গণ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে না।

হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আগামী বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক ঘটনার বিবর্তন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। প্রতি পর্যায়ে বিশ্ব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে ভারতবর্ষকে তার সুযোগ নেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

একটি অত্যন্ত মানবিক সমস্যার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দী ও বিচারাধীন বন্দীদের প্রশ্নই নয়, যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী মুক্তি পেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যে, যক্ষার মতো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিদারুণ অনশনের

সম্মুখীন, যাদের পরিবার হাসি মুখে নয়, চোখের জলে মুক্ত বন্দীদের স্বাগত জানান, যাঁদের ভাগ্যে দেশসেবার জন্যে দুঃখ-দারিদ্র্য ছাড়া কিছুই জোটেনি, তাদের প্রতি কী কর্তব্য দেশবাসী পালন করছে ? তাঁদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করতে তিনি আবেদন করেন। এত গভীর চিন্তা, মমতা ও উদ্বেগ সর্বত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্যে ইতিপূর্বে কোনও কংগ্রেস সভাপতি বা সর্বভারতীয় নেতা প্রকাশ করেননি।

সুভাষচন্দ্র সব বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাব ভিত্তিতে কংগ্রেসের গণতন্ত্রীকরণ ও পুনঃসংগঠনের জন্যে সহযোগিতার আবেদন জানান। পরিশেষে, তিনি ভারতবর্ষেব মুক্তি সংগ্রামকে এক আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে বলেন, "আমাদের সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও এবং এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মূল ভিত্তি বিশেষ। সুতরাং আমরা শুধু ভারতের স্বার্থেই সংগ্রাম করছি না, আমাদের এ সংগ্রাম মানবতার স্বার্থে। ভারতের মুক্তির অর্থ মানবতাব পরিত্রাণ।"

হরিপুরা ভাষণ গান্ধীপন্থীদের মনে বেশ কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় বামপন্থী সুর সুস্পষ্ট ছিল। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন (National Planning Commission) গঠন ও তার লক্ষ্যের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নয়ন পবিকল্পনাব প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। ভবিষ্যতের গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতির উল্লেখ, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে নিকটতর সম্পর্কের ওপব বিশেষ গুরুত্ব দান, ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত শাসনসংস্কার এবং প্রস্তাবিত ফেডারেশনেব সুস্পষ্টতর বিরোধিতা রক্ষণশীল কংগ্রেসীদের মনঃপূত হযনি। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "ভাষণটি দক্ষিণপন্থীদের কর্ণে মধুবর্ষণ করেনি।" তাঁবা হরিপুরার 'শোধ' ত্রিপুরীতে নিয়েছিলেন। কথাটি বহুলাংশে সত্য হলেও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সুভাষচন্দ্রের ভাষণ অবশ্যই বামপন্থীদের বেশ খুশি করেছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজি ও তাঁর রক্ষণশীল অনুরাগীদের সঙ্গে তখনি যাতে না বিরোধ-বিতর্ক দেখা দেয় সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাষণেই তিনি বলেন, "মহাত্মা গান্ধী আগামী আরো বহু বহু বছর ধরে আমাদের জাতির জন্যে বেঁচে থাকুন—সমগ্র ভারত আন্তরিক ভাবে এই আশা ও প্রার্থনা করে। ভারত তাঁকে হারাতে পারে না এবং এই সঙ্কটকালে তো কিছুতেই নয়...জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন...আন্দোলনকে তিক্ততা ও ঘৃণামুক্ত রাখার জন্যে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন. .ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। মানবতার স্বার্থে তাঁকে আমাদের আরো বেশি করে প্রয়োজন।" গান্ধীজির প্রতি সুভাষচন্দ্রের এই আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধার প্রকাশে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। গান্ধীপন্থীদের সন্তোষ ও সমর্থন লাভের জন্যে তিনি গান্ধীজির প্রতি ওই শ্রদ্ধা জানাননি। তখনও পর্যন্ত তাঁর সত্যিই বিশ্বাস ছিল যে, মতপার্থক্য থাকলেও গান্ধীজি সব কিছুর উর্ধ্বে। তিনি মুক্তি সংগ্রামের অপরিহার্য সর্বাধিনায়ক। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করা সম্ভব। আলাপ-আলোচনা ও খোলামেলা বিতর্কের মধ্য দিয়ে মতপার্থক্য দূর করে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। অনুরূপভাবে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর 'পুত্রস্নেহ'র কথা বলেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, জওহরলালের মতো সুভাষচন্দ্রেরও বামপন্থী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি

থাকলেও সুভাষচন্দ্র শেষপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না। গান্ধীজির প্রত্যাশাও পূর্ণ হয়নি।

হরিপুরা অধিবেশনে ও পরবর্তী কয়েক মাস সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীপন্থীদের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল। তাঁর অনুগামীরা যাতে বামপন্থীদের আক্রমণাত্মক সমালোচনা না করেন সে দিকে গান্ধীজি নজর রেখেছিলেন। একবার এর জন্যে সর্দার প্যাটেলকে সতর্ক করে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রও তাঁর হরিপুরা ভাষণে যেসব বামপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর কথা বলেছিলেন তার প্রতিটি তখনি কার্যকর করতে গিয়ে রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে যেতে চাননি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তিনি মনে করেছিলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের স্বার্থে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কংগ্রেস সভাপতিরূপে তাঁর এটা বিশেষ দায়িত্ব। লিওনার্ড গর্ডন লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্নে ছাড়া তিনি ওই পদ হারাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি গান্ধীজির একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতে গান্ধীজি লিখেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র মনের মতো কাজ ভালবাসেন। সেই রকম কাজ তিনি পেয়েছেন এবং খুশি আছেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কংগ্রেস সভাপতিকে বলা হত 'রাষ্ট্রপতি'। স্বাধীনতার পূর্বে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের পদ। অবশ্যই ওই পদাভিষিক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তা পদের প্রতি লোভ বা পদমর্যাদার জন্যে নয়। কংগ্রেস সভাপতিরূপে কংগ্রেসকে একটি সুসংহত শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত করে, আপসহীন, প্রগতিশীল লক্ষ্য ও কর্মসূচী গ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় সুনিশ্চিত করতে তিনি চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ তিনি চাননি। কিন্তু মূল আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। পদের মোহ থাকলে তিনি অনায়াসেই গান্ধীজির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতে পারতেন। কংগ্রেস ত্যাগ ও তারপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শেষ মরণপণ সংগ্রামের জন্যে তাঁকে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হত না। সুভাষচন্দ্রের ওপর প্রসন্ন হয়ে গান্ধীজি হয়তো তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সম্পর্কে পুনর্বিচার করতেন।

৩৯

হরিপুরা অধিবেশনের পর থেকেই সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার কার্যকর রূপ দিতে উদ্যোগ নেন। পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে একটি প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। তিনিই এই কমিটির সভাপতি হন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, অম্বালাল সারাভাই, এ. ডি. শ্রফ, কে. টি. শাহ ও ডঃ ভি. এস. দুবে। আহ্বায়ক ছিলেন ভি. ভি. গিরি। বিশেষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই, জে. বি. কৃপালনী,

যমনদাস বাজাজ প্রমুখ। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে জওহরলাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হতে সম্মত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে সভাপতিরূপে চেয়েছিলেন তার কারণ জওহরলাল নিজেও প্ল্যানিং সম্বন্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন, এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন এবং কংগ্রেসের ভেতরকার বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের মধ্যে তিনি ও সুভাষচন্দ্র শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। জওহরলালের ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা ছিল। এ ছাড়া, জওহরলাল মহাত্মা গান্ধীর সর্বাপেক্ষা স্নেহভাজন ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, প্ল্যানিং কমিটির নীতি ও লক্ষ্য এবং তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) শিল্পোন্নয়ন এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীপন্থীদের সংশয় বা আপত্তি থাকলেও জওহরলাল ওই কমিটির সভাপতি পদে থাকায় গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধ দূর করা সহজ হবে।

কংগ্রেস ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। জাতীয় কংগ্রেসে এবং মুক্তি আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে সমসাময়িক ও বর্তমান ঐতিহাসিকেরা সুবিচার করেননি বললে যথেষ্ট হবে না। সুভাষচন্দ্র বহু ক্ষেত্রে প্রায় উপেক্ষিত হয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেস তথা স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তির স্থপতি এবং জাতীয় পরিকল্পনার (National Planning) উদ্যোক্তারূপে প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব এবং প্রশংসা পেয়েছেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলালের অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দূরদৃষ্টি, জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি এবং তাঁর অবদানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা, ওই কমিটির লক্ষ্য এবং কর্মসূচী নির্ণয়ে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাও ছিল অনন্য। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর আদর্শগত বিরোধেব অন্যতম প্রধান কাবণ ছিল এই প্ল্যানিং কমিশন গঠন ও তার কার্যধারা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রায় অস্বীকৃত থেকে গেছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর তথ্যবহুল, 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং' গ্রন্থে এই বিষয়টি বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি সঙ্গত ক্ষোভের সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, নেহরুর গুণমুগ্ধ এক বিদগ্ধ লেখকও 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' গঠনের সব কৃতিত্বটুকু জওহরলালকে দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র লিখেছেন, ওই কমিটি ১৯৩৮ সালে 'কংগ্রেস সভাপতি গঠন করেছিলেন'। আসলে, উক্ত সভাপতি যে 'সুভাষচন্দ্র বসু', এই কথাটুকু পর্যন্ত তিনি উল্লেখ করেননি।

১৯৩৮ সালে ন্যাশনাল প্ল্যানিং ও প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ১৯১৩ সালে উভয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের দুই অগ্রজ মেঘনাদ সাহার সহপাঠী ছিলেন। মেঘনাদ সাহা গভীর আগ্রহের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন লক্ষ্য করতেন। তাঁর প্রতি অধ্যাপক সাহার শ্রদ্ধা ছিল। ১৯২২ সালে নিখিল বঙ্গ যুবক সম্মেলনের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। এই সম্মেলনে মেঘনাদ সাহা ও সুভাষচন্দ্র উভয়েরই বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল জাতীয় পুনর্গঠন। পরবর্তী কয়েক বছরে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ তেমন না হলেও ১৯৩৫ সালে পত্রালাপ হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র

মেঘনাদ সাহার বিভিন্ন উদ্যোগ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্যের সংবাদে ভীষণ খুশি হতেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলে, মেঘনাদ সাহা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যান, দু'জনের মধ্যে প্ল্যানিং কমিটি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগ দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লেখেন, "কংগ্রেস সভাপতি দেশকে অপ্রত্যাশিত নেতৃত্ব দিয়েছেন।" তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি বলেন, "জনপ্রিয় নেতারা এবং জনপ্রিয় সবকারগুলি (প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার) যদি শ্রীযুক্ত বসুর তুল্য বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন, যদি ব্যবসায়ীরা আরো স্বার্থবোধহীন হন, সকলে যদি সামাজিক উন্নতি ও ন্যায়বিচারেব জন্য কাজ করেন, তাহলে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিব যুগে প্রবেশ করতে পাবব, যেখানে ভারতের প্রতিটি নরনারী এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাঁচতে পারবেন যা সম্রাট শাজাহানের পক্ষেও ঈর্ষার যোগ্য।"

সুভাষচন্দ্র মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও মননশীল মানুষের সমর্থন ও উৎসাহ পেয়ে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় (২৩ আগস্ট, ১৯৩৮) তিনি বলেন, "যখন আমরা সমগ্র দেশের জন্যে জাতীয় সরকার গঠন কবব তখন আমাদেব অন্যতম প্রধান কাজ হবে সমগ্র দেশের জন্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা।" গান্ধীজি ও কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতাদের শিল্পায়ন সম্বন্ধে আশঙ্কা এবং শিল্পায়নকে 'অভিশাপ' বলে মনে করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শিল্পায়ন অভিশাপ হতে পারে...কিন্তু এই অভিশাপের হাত এড়াবার উপায় নেই।"

মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল চিন্তাধারার এত বড় সমর্থক ছিলেন যে যখন সুভাষচন্দ্রকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক-বিরোধ দেখা দেয় তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করতে এবং গান্ধীজিকে তার জন্যে প্রভাবিত করতে। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যে মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের আকৃষ্ট করেছিলেন। এরকম এক দৃষ্টান্ত ছিলেন হবিবিষ্ণু কামাথ। কলেজে ছাত্রজীবনেই কামাথ সুভাষচন্দ্রের নামে ও তাঁর অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর মান্দালয় জেল থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি পড়ে কামাথ তাঁর সম্বন্ধে আরও জানার জন্যে অধীর হয়ে পড়েন। সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের একটি ছবি দেখে তিনি বিস্মিত মনে চিন্তা করতে থাকেন যে ওই রকম সুন্দর, নিষ্পাপ যার মুখ, সেই মানুষটির মনের ভেতরে এত শক্তি কী করে থাকতে পারে। এর পর কামাথ আই সি এস হয়ে উচ্চ পদমর্যাদার রাজকর্মচারী হন। বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর কামাথের মনে হতে থাকে যে তিনি তাঁর যৌবনের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলে কামাথ তাঁকে চিঠি লেখেন, "আমি কি আপনার কাজে যোগ দিতে পারি?" এইরকম চিঠি সুভাষচন্দ্র একদিন দেশবন্ধুকে লিখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন, "আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে স্বাগত জানাই।" এরপর কামাথ 'রাষ্ট্রপতি' সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসের এক মধ্যাহ্নে নাগপুরে

এক কংগ্রেসী মন্ত্রীর ঘরে কামাথ সুভাষচন্দ্রের মুখোমুখি হন। সুভাষচন্দ্র কামাথকে উষ্ণ আলিঙ্গন করে স্বাগত জানান। মুখে তাঁর উজ্জ্বল হাসি। বিমুগ্ধ কামাথ অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলেন যে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক মাসের মধ্যে আই সি এস-এর মোহ ও বন্ধনমুক্ত কামাথ সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির যুগ্মসচিব হন ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির নীতি নিয়ে পরে যখন কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়, গান্ধীজি স্বয়ং ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, খাদি ও কুটির শিল্পকে উপেক্ষা করে শিল্পায়নের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এটা কংগ্রেসের সাংবিধানিক নির্দেশ-বিরোধী, তখন জওহরলাল এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েন। শিল্পায়ন ও নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নেহরু বিশ্বাস করতেন, তিনিই ছিলেন কমিটির সভাপতি। কিন্তু গান্ধীজিব সঙ্গে কোনও প্রকাশ্য বিরোধে যেতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। গান্ধীজির ইচ্ছা ও নির্দেশ-বিরোধী কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই নিয়ে কামাথের সঙ্গে নেহরুর দীর্ঘ পত্র-বিনিময় হয়েছিল। কামাথ পদত্যাগ করেছিলেন কমিটিব সচিবের পদ থেকে। কংগ্রেসেব সভাপতি পদে সুভাষের পুনর্নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। ত্রিপুবী অধিবেশনের পর যখন তা গভীর সঙ্কটের রূপ নেয় তখন নেহরুর ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন ওঠে। নেহরু-সুভাষের মতান্তর ও মনান্তর তীব্রতর এবং কিছুটা তিক্তকরও হয়ে ওঠে। প্রভাবশালী শিল্পপতি ও রক্ষণশীল গান্ধীপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত কিছু বড় বড় সংবাদপত্র-পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নীতি সমালোচিত হলেও জনমত ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। এমনকি জেরার্ড কর-এর মতো (Gerard Corr) সুভাষচন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ সমালোচকও স্বীকার করেন (সুবোধ মার্কণ্ডেয়র Subhas Chandra Bose গ্রন্থে উদ্ধৃত) : "Bose was ahead of his time, for the people were not ready for this sort of direct to-the-point bluntness about the Indian condition. It was an engaging characteristic of Bose that—unlike so many Indian politicians—he never attempted to dissemble. He spoke what was on his mind, not always with due regard to the consequences. He could never be a fellow traveller."

সত্যিই সুভাষচন্দ্র তাঁর যুগের পুরোবর্তী ছিলেন। যা সত্যি বলে মনে করতেন তা খোলাখুলি স্পষ্ট করে বলতেন। অন্য অনেক ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মতো ছদ্মবেশ ধারণ বা মনোভাব গোপন করার স্বভাব তাঁর ছিল না। এর ফল কী হতে পারে তা নিয়ে তিনি ভাবতেন না।

নিজের রাজনৈতিক স্বার্থের পক্ষে কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক, বলিষ্ঠ, সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ শুভ হয়নি। ক্রমেই কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতারা সুভাষ-বিরোধী হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁরা চাননি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। অন্তরালে গান্ধীজিরও প্রচ্ছন্নভাবে এই মনোভাবের প্রতি সমর্থন ছিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তখনও গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের কিছু কাল পরেই মধ্যপ্রদেশের (Central Province) কংগ্রেস দলে এক সঙ্কট দেখা দেয়! ক্রমেই এই সঙ্কট মুখ্যমন্ত্রী

এন. বি. খারের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের মধ্যে এক তিক্ত বিরোধের রূপ নেয়। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় মহারাষ্ট্রীয় (মারাঠা-ভাষী) ও মহা কোশলীয় (হিন্দী-ভাষী) দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। ওই দুই দলের মধ্যে মন্ত্রী নির্বাচন ও দপ্তর বিভাগ নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) খারে ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় সাময়িক মীমাংসা হলেও, আবার বিরোধ আরও জটিল ও তিক্ত হয়ে ওঠে। খারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের অভিযোগ ছিল যে, তিনি ব্রিটিশ প্রশাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলীয় নির্দেশ অমান্য করছেন। দলের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করছেন। শেষপর্যন্ত অবস্থা চরমে পৌঁছয়। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি খারেকে ভর্ৎসনা করে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় নির্দেশ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। ক্ষুব্ধ খারে অভিযোগ করেন যে, সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির নির্দেশে কাজ করেছেন। তিনি এরপর বলে বেড়ান যে, তিনি সুভাষচন্দ্রকে নাকি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'গান্ধী রাজনৈতিক চক্রে'র হাতে একদিন সুভাষচন্দ্রের একই অভিজ্ঞতা হবে।

মধ্যপ্রদেশে সঙ্কটের কারণ, ঘটনাবলী ও কেন খারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ওয়ার্কিং কমিটি কঠোর অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তার সব তথ্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে সুভাষচন্দ্র এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)। এই বিবৃতিতে সুস্পষ্ট হয় যে, মুখ্যমন্ত্রীর পদ ও ক্ষমতার লোভে খারে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক, দলীয় স্বার্থ-বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন, কোনও উপদেশ ও আদেশ তিনি কর্ণপাত করেননি। মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। গান্ধীজির বিরুদ্ধে তাঁর কটূক্তি, মিথ্যা সন্দেহ ও অযৌক্তিক অভিযোগও রুচিবিরুদ্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে কয়েক মাসের মধ্যেই গান্ধীজির সঙ্গে বিরোধের ফলে সুভাষচন্দ্রকেও শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগ করতে হলেও তার সঙ্গে খারের ঘটনার কোনও মিল ছিল না। খারের লক্ষ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদ না হারানো। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল কোনওরকম ক্ষমতার প্রলোভনে বা কায়েমী স্বার্থের চাপে দেশের মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে লক্ষচ্যুত না হওয়া।

মুসলিম লীগ, মহম্মদ আলি জিন্নার সাম্প্রদায়িক দাবি ও কংগ্রেস-লীগ রাজনৈতিক মতভেদের প্রশ্নে গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঐকমত্য ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন (১৯৩০) প্রখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবাল। একটি স্বাধীন ও পৃথক মুসলমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে আরও বিশদ ও নতুন রূপ দেন ইংলন্ড প্রবাসী কয়েকজন তরুণ মুসলমান ছাত্র। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রহমত আলি। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের কাছে এই পরিকল্পনা পেশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর মুসলিম রাষ্ট্র, পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব তেমন গুরুত্ব না পেলেও, ১৯৩৩ সালে রহমত আলি পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে ছাত্রসুলভ 'উদ্ভট ও অবান্তর' বলে অভিহিত হলেও অল্পকালের মধ্যেই 'পাকিস্তান'-এর দাবি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসমর্থন লাভ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জিন্না একসময় কংগ্রেস দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি

কংগ্রেস ও উগ্র গান্ধী-বিরোধী হয়ে উঠে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাঁরই নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে ওই দাবিকে জোরদার করে তোলে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী দল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম জনগণের কাছে জিন্নার সাম্প্রদায়িক আবেদন ক্রমেই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এব প্রতিক্রিয়া হিন্দু জনমতেও দেখা দেয়। মুসলিম লীগ দাবি করতে শুরু করে যে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল হল মুসলিম লীগ। মুসলমানদের মুখপাত্র হওয়ার অধিকার শুধু মাত্র মুসলিম লীগের। কংগ্রেস হল হিন্দুদের দল। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কংগ্রেসের নেই। কংগ্রেস এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে বলে যে, কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান ও সর্বধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের সকল মানুষের মুখপাত্র হল জাতীয় কংগ্রেস। জিন্না অভিযোগ করেন গান্ধীজি কংগ্রেসকে হিন্দু পুনর্জাগরণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন। 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে জিন্নার দু'টি প্রধান বক্তব্য ছিল। প্রথমত, প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি নির্মমভাবে মুসলমানদেব স্বার্থ ও অধিকাব দলিত করছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা প্রকৃত অর্থে সংখ্যালঘু নয়। এই উপমহাদেশে তারা এক পৃথক জাতি (Nation)। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি (Two Nations) হওয়ায় ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠদেব শাসন প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের কাছে এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ছিল।

সুভাষচন্দ্রের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা ও সুদৃঢ় করা ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই প্রশ্নে তিনি এতই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, মাঝে মাঝেই রূঢ় বাস্তবকে প্রায় উপেক্ষা কবে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠতেন। হরিপুরা ভাষণে ব্রিটিশ বিভেদনীতির ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়াব যে আশঙ্কা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তা তাঁব দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল। কিন্তু মাত্র দু' মাস পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে এক ভাষণে (১০ এপ্রিল, ১৯৩৮) তিনি বলেন যে, দেশেব মুক্তি আন্দোলন সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ভেঙে ফেলছে। তিনি নিশ্চিত, "ভারতে সাম্প্রদায়িকতা তার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে।" কিছুদিন পরে পূর্ববাংলায় সফরকালে মুসলমান জনসাধারণের কাছে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পেয়ে অভিভূত সুভাষচন্দ্র বলেন যে, বাংলার মুসলমানরা সকলেই শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন। পূর্ববাংলায় তাঁর বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও যে বিক্ষোভ এবং 'কালো পতাকা' দেখান হয়েছিল তাকে তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি। গান্ধীজিও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি গড়ে ওঠা, সাম্প্রদায়িকতার অবসান এবং ভারত-বিভাগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন জিন্নার মন থেকে হিন্দু প্রাধান্যের আশঙ্কা দূর করতে। কিন্তু তিনি সফল হননি। কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

মীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করার জন্যে তিনি জিন্নার সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন (মে-আগস্ট, ১৯৩৮)। তিনি জিন্নাকে লিখেছিলেন যে, এটা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেসের বৃহত্তম সংখ্যক সদস্যরা হলেন হিন্দু। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে কেউ কংগ্রেসের সদস্য হন'না। কংগ্রেসে বহু মুসলমান ও অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন।

"ভারতবর্ষ যাঁদের স্বদেশ সেই সব সম্প্রদায়ের, সব জাতির এবং সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য হয়ে আছে।" কিন্তু তাঁর কোনও যুক্তি বা আবেদনে কাজ হয়নি। জিন্না তাঁর দাবিতে অনড় থাকেন। মুসলিম লীগই একমাত্র মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবে এতেই তিনি সন্তুষ্ট হননি। তিনি জিদ ধরেছিলেন যে মীমাংসার সূত্র খোঁজার জন্যে কোনও কমিটি গঠিত হলে তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে একজনও মুসলমান থাকলে চলবে না। এর ফলে সুভাষ-জিন্না আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু তবুও সুভাষচন্দ্র জিন্নাকে আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রস্তাব ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সহযোগিতার পাওয়ার আশা ত্যাগ কবেননি।

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিপন্ন হলেও সুভাষচন্দ্র আশাহত হননি। কংগ্রেস সভাপতিপদ ত্যাগ (এপ্রিল, ১৯৩৯) ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের (মে, ১৯৩৯) পর ঢাকায় এক বক্তৃতায় (৫ জুন, ১৯৩৯) তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বামপন্থীরা যদি তাঁদের কর্মপদ্ধতি কার্যকর করতে পারেন তাহলে মুসলমানদের অভিযোগ দূর হবে। বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার বৃহত্তর সম্ভাবনা দেখা দেবে। মুসলিম লীগে অভিজাত বিত্তশালী মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে 'হাজারে হাজাবে' এমন সদস্য হচ্ছেন যাঁরা পুরনো নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেবা নেতৃত্বে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দলে টানতে না পাবলে 'ভয়ঙ্কর কর্তব্যচ্যুতিব দায়ে' পড়তে হবে। আসল সমস্যা হল—খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও বেকারত্ব। স্বাধীনতাব পর এর সমাধান হলে মুসলমানদের অভিযোগ এবং সমস্যা দূর হবে। সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজদের চক্রান্ত, বিভেদ নীতি ও অপপ্রচারই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্যে দায়ী। মুসলমানদের মধ্যে একটি শ্রেণীর অল্পসংখ্যক কিছু লোক ভারত বিভাগ চান।

১৯৪২ সালেও সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস অটুট ছিল যে, পাকিস্তান একটি 'আজগুবী পবিকল্পনা' ও 'অকার্যকর প্রস্তাব'। তাঁর এই বিশ্বাস কতখানি অবাস্তব ছিল তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন ও অখণ্ড স্বাধীন ভারতেব আদর্শ ও লক্ষ্যে এত অবিচল ছিলেন যে, তিনি তাঁর স্বপ্নভঙ্গের চিন্তা করতে পারেননি। জিন্নাকে কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম করতে সম্মত করানোর জন্যে তিনি তাঁকে (জিন্নাকে) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা বীর সাভারকরের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছিলেন। তাঁকেও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

অল্পকালের মধ্যেই তিনি গোপনে দেশত্যাগ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে ও পরিচালনায় তিনি কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা আজ আর অজানা নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। দেশত্যাগের পূর্বে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব হলেও ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণের একক ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে জাগে। গান্ধীজিও দেশ-বিভাগের আপসহীন বিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহের ওপর দেশ-বিভাগ করতে হবে। কিন্তু

শেষপর্যন্ত তাঁকেও দেশ-বিভাগ মেনে নিতে হয়েছিল। হতাশ, বেদনাহত গান্ধীজির নিজেকে অসহায় ও একাকী মনে হয়েছিল। ওই মুহূর্তে তাঁর পাশে যদি সুভাষচন্দ্র থাকতেন তাহলে কি ভারত-বিভাগ রোধ করা সম্ভব হত?

৪০

গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতভেদ ও বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federation of India) গঠনের প্রশ্নটি। ফেডারেশন গঠনের প্রবল বিরোধী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর তীব্র বিরোধিতার কারণ ছিল · এই নতুন শাসন ব্যবস্থায ভারতে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়নি। ভাইসরয়ের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতেও বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ভারতের সৈন্যবাহিনী নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল ভাইসরয়ের। তাঁর তিনজন উপদেষ্টাকে তিনিই নিয়োগ করবেন। প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত কোনও বিলে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে পারবেন। মন্ত্রিসভা গঠনের বা ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। ওই রাজ্যগুলির নৃপতিরা ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবেন। 'যুক্তরাষ্ট্র'-এর আর এক অত্যন্ত আপত্তিকর ও ক্ষতিকর দিক ছিল সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত করা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার শর্ত যুক্ত করা হয। প্রধান প্রধান চাকরিগুলি লন্ডনে ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়।

দেশীয় রাজন্যবর্গও 'ফেডারেল' প্রস্তাবে আপত্তি জানান। তাঁরা 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা' (democratic freedom) প্রবর্তনের দাবি সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়ছিলেন। কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতারাও 'ফেডারেল' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, প্রকৃত জনপ্রতিনিধিমূলক একটি গণ পরিষদ (Constituent Assembly) ভারতবর্ষের জন্যে একটি সংবিধান রচনা করুক। মুসলিম লীগ ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার বিন্যাসে আপত্তি জানালেও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অংশটুকু মেনে নিতে সম্মত হয়। এর ফলে 'ফেডারেশন' গঠন বা Federal Scheme পুরোপুরি কার্যকর করা স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল যে, ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ সরকার ওই ফেডারেল ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেস আপস করার দিকে ঝুঁকবে। প্রথমে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস উৎসাহ প্রকাশ না করলেও, শেষপর্যন্ত কংগ্রেস প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। মোট এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ ছাড়া সিন্ধু ও আসামে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ দু'টি প্রদেশেও কংগ্রেস

মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলমানদের জন্যে নির্ধারিত আসনগুলির মধ্যে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলায় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি হয়নি। ফলে 'কৃষক প্রজা পার্টি'র ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সিকান্দার হায়াৎ খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল যে, যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের কোনও মিল নেই তাদের সঙ্গে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় এবং সমীচীন নয়। এর ফলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরও অবনতি হয়।

সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোনও মতেই 'ফেডারেল' প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের জন্যে পূর্ণ শক্তিতে প্রবল মুক্তি আন্দোলন শুরু করা প্রযোজন। মন্ত্রিসভা গঠন করে ও কিছু সীমিত ক্ষমতা পেয়েই রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতারা আরও বেশি আপসের মনোভাব দেখাচ্ছেন। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে অবিচল না থেকে কংগ্রেসের ক্ষমতাশালী নেতারা ইংরাজদের প্রতিশ্রুতিতে আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদের জন্যে সর্বাত্মক আন্দোলনের মানসিকতা হারিয়ে ফেলার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই মনোভাব ও নীতি কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর একটি বিরাট আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আসন্ন। ব্রিটিশ শক্তি ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্যে এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার জন্যে সুভাষচন্দ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বক্তৃতা দেন। কৃষিজীবী, কারখানার শ্রমিক ও কৃষিকর্মীরা যাতে কংগ্রেসে অধিকতর সংখ্যায় যোগ দেন তার জন্যে তিনি আবেদন করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম ব্যক্তির গৃহেও প্রবেশ করেছে'। তিনি মুসলমানদের কংগ্রেস সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এই জাতীয় দলটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। শিলং-এ এক ভাষণে (২৯ অক্টোবর, ১৯৩৮) তিনি খাসিয়া জনগণের কাছে একই আবেদন জানান। তিনি সতর্ক করে দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ফেডারেশন চাপাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বিদেশীদের রচিত সংবিধান ভারতবাসী মেনে নেবে না। কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে যাবে। দু'দিন পরে গৌহাটি কটন কলেজে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন যে, ছাত্রছাত্রীদের সভায় উপস্থিত হতে পারলে তিনি বেশি উৎসাহিত বোধ করেন। তার কারণের সরস ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, এরকম সুযোগ "নিজেকে তরুণ ভাবতে সহায়তা করে—অবশ্য এমন নয় যে আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই দেশে আমাদের মাঝে মাঝেই যৌবনের ইনজেকসন দেওয়া উচিত...প্রথমেই যে কথাটি আপনাদের বলতে চাই তা হল এই যে আমরা যুগ-পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে বাস করছি—এ শুধু সন্ধিক্ষণের সময় নয়, সংগ্রামেরও সময়।"

সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণের অন্তর্নিহিত মর্ম ছিল অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি অনুভব

করছিলেন যে, কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন প্রবীণ নেতারা সংগ্রামবিমুখ হয়ে উঠছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আর বড় কোনও আন্দোলনের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের মাধ্যমে অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভই তাঁদের লক্ষ্য। ঘনীভূত আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন নন, বরং উদাসীন। এই মনোভাব ও নীতি থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করতে হবে। কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে এটি এক বড় কারণ ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি পদে তিনি বা সম-মনোভাবাপন্ন কেউ নির্বাচিত না হলে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন অসম্ভব। স্বভাবতই গান্ধীজি ও তাঁর অনুগত নেতৃবৃন্দের কাছে সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্র আর গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁরা মনস্থির করেন যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেস ও তার পরবর্তী নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ আলোচনার পূর্বে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার (১৯৩৮) প্রায় এক দশক পূর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে খুব দ্রুত একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতারূপে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ইউরোপে প্রবাস জীবনের সূচনা থেকেই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নিরলস, আপসহীন ও জনপ্রিয় নেতারূপে আন্তর্জাতিক (বিশেষ করে ইউরোপে) পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রুরূপে তিনি ইংরাজ সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের কাছে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র সর্বভারতীয় হলেও সুভাষচন্দ্রের প্রধান পরিচিতি ছিল তিনি একজন 'বাঙালি' ও 'বাংলার নেতা'। বাংলার ছাত্র-যুবসমাজের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারাও সাধারণত সুভাষচন্দ্রকে বাংলার নেতারূপে উল্লেখ করতেন। সুভাষচন্দ্রের নিজের কথাবার্তায়, ভাষণে ও লেখায় বাংলার কথা, বাংলার সমস্যা ও বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ অনেক বেশি থাকত। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পরেও সুভাষচন্দ্র বাংলার রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করেননি বা দূরত্ব রাখেননি। কংগ্রেস সভাপতি—'রাষ্ট্রপতি' সুভাষচন্দ্রের কর্মক্ষমতা, শক্তি এবং অমূল্য সময়ের অনেকখানি ব্যয়িত হয়েছিল কলকাতা এবং বাংলার সমস্যা এবং রাজনীতিতে।

কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পরেও সুভাষচন্দ্র বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান এবং কলকাতা মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশনের নেতারূপে পৌরশাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতির জন্যে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু এই কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। কর্পোরেশনের শিক্ষাধিকারিককে কেন্দ্র করে এক অপ্রীতিকর বিতর্কে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। কর্পোরেশনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি (৫ জুলাই, ১৯৩৮) থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কতখানি হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের

অভ্যন্তরীণ পরিবেশে। তাঁর পক্ষে কলকাতা পৌরসভার আবিল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা সমীচীন হয়নি। বাংলায় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে সম্মত না হওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। বাংলার 'পঞ্চ প্রধান'-এর অন্যতম, নলিনীরঞ্জন সরকার ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হন। কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ হলেও তিনি গান্ধীজির বিশ্বস্ত কাছের মানুষ এবং সুভাষচন্দ্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গান্ধীজি ও নেহরু পরিবারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গান্ধী-সমর্থক রূপে চিহ্নিত হন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার নীতি ও কার্যকলাপ সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে ক্রমেই সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। ফজলুল হক মুসলিম লীগের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এমনকি কৃষক প্রজা পার্টির অনেকে অভিযোগ করেন যে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। মুসলমান মন্ত্রিসভা বলেই কংগ্রেস ওই সরকারের উচ্ছেদ চায়, এই অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। "আমি বাংলার মন্ত্রীসভাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি...তাঁরা এগারোজন মুসলমান মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করুন। তাঁরা যদি যোগ্য ও দেশপ্রেমী ভদ্রলোক হন, তবে কংগ্রেস তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না। যে বিষয়ে আপত্তি তা হল এই যে, মন্ত্রীসভায় যোগ্যতা ও দেশপ্রেমের অভাব। আমি আরও অগ্রসর হয়ে বলব যে, যদি এগারো জন অযোগ্য হিন্দুকেও মন্ত্রী করা হয় তাহলেও কংগ্রেসের বিরোধিতা কিছুমাত্র কমবে না। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে না।" লিওনার্ড গর্ডন লিখেছেন, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা পার্টি-তপশীল সম্প্রদায়ের সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য প্রশ্নে তা কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে গান্ধীজি এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং ঘনশ্যাম দাস বিড়লার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া মৌলানা আজাদও ওই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী কিন্তু লিখেছেন যে, গান্ধীজির কংগ্রেস-ফজলুল হক দলের কোয়ালিশনে আপত্তি ছিল না। সুভাষচন্দ্র যে গান্ধীজির মনোভাবে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লিওনার্ড গর্ডন বিশ্লেষণ করেছেন যে রক্ষণশীল গান্ধীপন্থীরা খুব সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন। একাধারে কংগ্রেস সভাপতি ও বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীপন্থীদের কাছে তিনি প্রায় একজন বহিরাগতদের মতো ব্যবহার পাচ্ছিলেন।

দক্ষিণপন্থী গান্ধী-অনুগত কংগ্রেসী নেতাদের ওপর সুভাষচন্দ্র কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা প্রকাশ পায় কলকাতায় এক জনসভায় (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)। তিনি বলেন যে, বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির একটি 'কলঙ্কজনক' ঘটনা হল কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা বর্তমান মন্ত্রিসভার পতন চান না। তিনি ওই মনোভাবাপন্নদের সতর্ক করে বলেন, "বর্তমানে জাতীয় আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যখন কংগ্রেসসেবীদের আর শুধু অতীতের সেবা ও লাঞ্ছনা-ভোগের রেকর্ড নিয়ে অহংকার করলে চলবে না...যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পারলে দেশ

তাঁদের সহ্য করবে না।" সুভাষচন্দ্রের মনে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে যে অসহিষ্ণুতা দেখা দিচ্ছিল তা তিনি ব্যক্ত না করে পারেননি। তিনি বলেন যে, রাজনীতির প্রাথমিক নীতি 'যিনি আমাদের সঙ্গে নন তিনি আমাদের বিরোধী'—এটা ভোলা সম্ভব নয়। যাঁরা প্রগতিশীল হতে পারবেন না এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সমঝোতা রেখে চলবেন তাঁদের জনগণ কোনও প্রকারে সহ্য করবেন না। যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন তাঁদের পরিত্যাগ করতে হবে। পরিশেষে তিনি বাংলার স্বার্থ-বিরোধীদের লক্ষ্য করে সরাসরি বলেন, "নিজেদের এখানকার কুকীর্তির পাপ স্খালনের জন্যে কিছু লোকের ওয়ার্ধার নিকটবর্তী একটি স্থানে রাজনৈতিক তীর্থযাত্রায় যাওয়া একটা বেওয়াজ হয়ে উঠেছে। আমি এই ধবনের লোকদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে অন্যত্র অন্যায় ভিক্ষে কবে তাঁরা তাঁদের কুকীর্তির দরুন নিন্দা এড়াতে পারবেন তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। আমি যতদিন কংগ্রেসেব ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকব ততদিন অন্তত এই সব কলা-কৌশলে কোনও কাজ হবে না।"

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচন যে প্রাচীন দক্ষিণপন্থীরা কোনওক্রমেই সমর্থন করবেন না তা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। ১৯৩৮ সালের শেষ দিক থেকে ত্রিপুরী কংগ্রেসেব অধিবেশন এবং তার অব্যবহিত পরেব ঘটনায প্রকাশ পেয়েছিল গান্ধী-সুভাষ বিরোধ কতটা গভীবে পৌঁছেছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "অবশ্যই ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে সুভাষ গান্ধীর ওপর রেগেছিলেন। গান্ধীব খুশি হবাব কথা নয়।" কেন গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের ওপর অখুশি হয়েছিলেন তাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমলেশ ত্রিপাঠী কার্যত সুভাষচন্দ্রকেই মূলত দায়ী করেছেন। কারণ: ফেডারেশনের ব্যাপারে দক্ষিণপন্থীদেব বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রেব সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল 'অমূলক'। গান্ধীজিকে সুভাষচন্দ্র বৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অনুপযুক্ত (অনিচ্ছুক তো বটেই) মনে করেছিলেন। এই দু'টিই সুভাষচন্দ্রের 'অমার্জনীয়' ভুল বলে ত্রিপাঠী মনে করেন। ১৯৩৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধায় গান্ধীজির আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্যা ও মতভেদ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারটা 'ভদ্রভাবে মিটিয়ে না নেওয়ার' জন্যেও তিনি সুভাষচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের আর একটি ভুলের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ত্রিপাঠী। সেটি হল বামপন্থীদের সাহায্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। সুভাষচন্দ্রের নিজের কোনও সংগঠন ছিল না এবং তা গড়ার চেষ্টাও তিনি তেমন করেননি। ত্রিপাঠীর মতে "আপন Charisma সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা পোষণ করা উচিত হয়নি।"

অমলেশ ত্রিপাঠীর গান্ধী-সুভাষ বিরোধ সম্বন্ধে বিশ্লেষণে গান্ধীজির প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট। গান্ধীজি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ না হলেও তাঁর ধ্যানধারণা যে অস্পষ্ট ও অবাস্তব ছিল তা মনে করা ভুল নয়। তা না হলে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গান্ধীজি ব্রিটেনের সব মানুষের কাছে খোলা চিঠিতে উপদেশ দিতেন না: "আমি চাই নাৎসীদের সঙ্গে আপনারা বিনা অস্ত্রে লড়ুন...অহিংসে অস্ত্র নিয়ে লড়ুন। আমি চাই—যে অস্ত্র আপনাদের হাতে আছে তা আপনারা ত্যাগ করুন;

কারণ ঐ অস্ত্র দিয়ে তো আপনারা নিজেদের বা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে পারছেন না। আপনারা হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনীকে আমন্ত্রণ করুন ; যে-সব দেশ আপনারা বলেন আপনাদের অধিকারে সে-সব দেশ থেকে ওরা যা নিতে চায় তা ওদের নিতে দিন। সুন্দর সুন্দর সব ঘর-বাড়ি সমেত আপনাদের সুন্দর দ্বীপটির দখলও ওদের নিতে দিন। আপনারা এ-সব কিছুই দেবেন, কিন্তু যা দেবেন না তা হল আপনাদের আত্মা, আপনাদের মন…।" হিটলারের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধীর এই চিঠি ব্রিটিশ জনগণের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। গান্ধীজি যে, ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে নতুন উদ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনও গণ-আন্দোলন শুরু করতেই একেবারে ইচ্ছুক ছিলেন না, আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করা তো দূরের কথা—সহানুভূতি এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন এটা অনস্বীকার্য, তাঁর এই মনোভাব ও নীতির পরিবর্তন এসেছিল পরে। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে গিয়েছেন তাঁর পরিকল্পনা মতো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে চূড়ান্ত আঘাত হানতে। এই পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধীজির সঙ্গে মৌলিক প্রশ্নগুলিতে কোনও ঐকমত্যে পৌঁছন অসম্ভব ছিল। আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গান্ধীজি আপাতদৃষ্টিতে নরম, নমনীয় এবং আলোচনার ভিত্তিতে সব সমস্যার মীমাংসা করতে সদাপ্রস্তুত বলে মনে হলেও তিনি নিজের বক্তব্য ও বিশ্বাস সম্বন্ধে অনমনীয় ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করায় তাঁর আগ্রহ থাকলেও নিজের মূল নীতি ও বিশ্বাস থেকে তিনি এতটুকু সরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্রও ছিলেন নিজের মত ও পথ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী ও অটল। পারস্পরিক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি যতই থাকুক না কেন (যা সুভাষচন্দ্রের প্রথমে কংগ্রেস ও পরে দেশত্যাগের পরও অটুট ছিল), গান্ধী-সুভাষ মতানৈক্য ও বিরোধের অবসানের প্রকৃত কোনও সম্ভাবনা প্রথম থেকেই ছিল না। হয়তো একে ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য ধারা বা নিয়তি বলা যায়।

অনেকের এমন ধারণাও হয়েছিল (যা এখনও কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন) যে, সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এই বক্তব্য ভুল নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন সহযোগিতা করতে, সহমত গড়ে তুলতে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে নয়। যদি তাই করতেন তাহলে তিনি সহজেই সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হতেন।

৪১

১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। হরিপুরা কংগ্রেসের পর সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র সচেতনভাবে গান্ধীজি ও তাঁর অনুগত প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিজের বিবেচনায় স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা অর্জন

করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির প্রশ্নে তিনি অবিচল ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকলের সঙ্গে খোলাখুলি বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্যে আধুনিক ঐতিহাসিকরাও মন্তব্য করেছেন যে, পূর্ববর্তী অন্য সব কংগ্রেস সভাপতিদের মতোই সুভাষচন্দ্র কার্য পরিচালনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। কোনও কোনও মহলে এই মনোভাবের জন্যে সুভাষচন্দ্র সমালোচিতও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯৩৮ সালের শেষ দিকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতারা সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করবেন। ফেডারেশন-পরিকল্পনা বর্জন সম্পর্কে তাঁর অনমনীয় মনোভাব, নিয়মতান্ত্রিকতার পথে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস-প্রচেষ্টার কঠোর বিরোধিতা, আসন্ন আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শক্তিকে চরমপত্র দান এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তাঁর সঙ্কল্প গান্ধীজি ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অন্য দু'টি কারণের উল্লেখ প্রয়োজন। প্ল্যানিং কমিশন গঠন, আর্থিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যে যে পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে (জওহরলালেরও সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতায়) গৃহীত হয়েছিল তা গান্ধী-সমর্থক রক্ষণশীল পুঁজিপতিদের (যেমন ঘনশ্যামদাস বিড়লা) পছন্দ হয়নি। এঁদের প্রভাব স্বয়ং গান্ধীজি ও অন্য দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের ওপর কম ছিল না। অন্য কারণটি হল, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত করেও সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের গোষ্ঠী ও মতভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, করার কোনও সম্ভাবনাও নেই। এমনকি গান্ধীজির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, তাঁর অসামান্য অবদান এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর অন্ধ ভক্ত হবেন না। গান্ধীজির উপদেশ ও নির্দেশকেই সর্বক্ষেত্রে শেষ কথা বলে মেনে নিতে তিনি সম্মত হবেন না। এই পটভূমি ও পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচন যে গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতারা (যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন) কোনওমতেই চাইবেন না তা অনিবার্য ছিল।

তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের প্রবল বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হলেও সুভাষচন্দ্র পুনরায় দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করেন। তার কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো তেমন কোনও প্রার্থী নেই। অথচ দেশের ভিতরকার ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে বৃহত্তর আন্দোলন-বিমুখ, আপসনীতি ও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন কোনও সভাপতি নির্বাচিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি হবে। এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হবে। তিনি জানান যে, যদি আচার্য নরেন্দ্র দেব সভাপতি হতে সম্মত হন তাহলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইতিপূর্বেই (১১ জানুয়ারি, ১৯৩৯) ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে মৌলানা আজাদের নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি অসম্মতি জানিয়ে পট্টভি সীতারামাইয়াকে সমর্থন করেন এবং

সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবেন, এই আশা ব্যক্ত করে এক বিবৃতি দেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পরবর্তী সভাপতি পদের প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করা তো দূরের কথা, তাঁকে ওই বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানাননি পর্যন্ত। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোভাব এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ খুবই সঙ্গত ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রমুখ কয়েকজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এক বিবৃতিতে (২৪ জানুয়ারি, ১৯৩৯) কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত যুক্তি উত্থাপন করেন। তা হল : কংগ্রেসের নীতি ও কার্যপদ্ধতি কংগ্রেস সভাপতি নির্ধারণ করেন না। সভাপতির মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে চেয়ারম্যানের মতো। "নিয়মতন্ত্রানুগ রাজতন্ত্রের অধীনে রাজা যেমন সমগ্র জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, ভারতের পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতিও সেইরূপ। অতএব একান্ত সঙ্গতভাবেই এই পদপ্রাপ্তি পরম সম্মানজনক বিবেচিত এবং বার্ষিক নির্বাচন দ্বারা ভারতমাতার কৃতী সন্তানগণের মধ্যে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক লোককে এই সম্মানদানের চেষ্টা হইতেছে।" অর্থাৎ, কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (নেপথ্যে গান্ধীজির !) হাতের পুতুল মাত্র। নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা রূপায়ণে কোনও সার্থক ক্ষমতা বা ভূমিকা তাঁর নেই। বল্লভভাই, কৃপালনী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখরা তাঁদের বিবৃতিতে আরও একটি অভিনব কথা বলেন। সেটি হল যে, বিশেষ কারণ ছাড়া একই ব্যক্তিকে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত করা উচিত নয়। ইতিপূর্বে একাধিকবার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিতদের দীর্ঘ তালিকার (১৯৩৮ পর্যন্ত) উল্লেখ অপ্রয়োজন। শুধু এইটুকু বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, জওহরলাল নেহরু ১৯২৯ (লাহোর), ১৯৩৬ (লক্ষ্ণৌ) এবং ১৯৩৭ সালে (ফৈজপুর) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র যে খুবই ক্ষুব্ধ ও আহত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির ওই সদস্যরা অন্যায়ভাবে ভোটারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। যদি সভাপতি পদে স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচনের প্রথা তুলে দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটিই সভাপতি মনোনয়ন করবেন, এই নিয়ম প্রবর্তন করাই অধিকতর কাম্য। নির্বাচনের দিন আসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ বিতর্ক এবং তিক্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ২৫ জানুয়ারির এক বিবৃতিতে সুস্পষ্ট হয় যে, এক 'ঘরোয়া' আলোচনায় পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্যাটেল বলেন যে ওই আলোচনায় "সুভাষবাবুকে পুনর্নির্বাচিত করা অনাবশ্যক বলেই আমরা পরিষ্কার অভিমত জ্ঞাপন করি"। আলোচনার সময় গান্ধীজি উপস্থিত ছিলেন।

সর্দার প্যাটেল তাঁর ২৫ জানুয়ারির বিবৃতিতে বারদৌলিতে 'ঘরোয়া' আলোচনায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন সেই নামগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই, আচার্য কৃপালনী, বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী। সুভাষচন্দ্রের বিরোধীশক্তি কতটা প্রবল পরাক্রান্ত ও সুসংগঠিত ছিল তা ওই নামগুলি থেকেই সুস্পষ্ট

হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে তাঁর সমর্থকদের মধ্যে তেমন কোনও 'বড় নাম', ইংরাজি পরিভাষায় 'political heavy weight', ছিল না। ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের ওই যুক্ত বিবৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রফি আহমদ কিদোয়াই, কে. এফ. নরিম্যান (K. F. Nariman), ডাঃ খারে, মিনু মাসানি, ইউসুফ মেহের আলি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বলেন যে, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির ওই সাতজন সদস্যের প্রচারকার্যে নামা এত ক্ষুদ্রজনোচিত, হীন ও অশোভন হয়েছে যা কংগ্রেসের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল।

শরৎচন্দ্র বসুকে একটি তারবার্তায় (২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৯) সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বল্লভভাই প্যাটেলের মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। বল্লভভাই জানান যে, সুভাষচন্দ্রকে পুনর্নির্বাচনের কোনও বিশেষ প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না এবং তিনি (শরৎচন্দ্র) যেন সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করতে অনুরোধ জানান। শরৎচন্দ্র এই তারবার্তার তীব্র প্রতিবাদ করলে বল্লভভাই প্রত্যুত্তরে সরাসরি মন্তব্য করেন যে, দেশের স্বার্থে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন "ক্ষতিকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে"। সর্দার প্যাটেলের ওই ধরনের রুচিবিরুদ্ধ, অবমানকর মন্তব্য শরৎচন্দ্র, আচার্য নরেন্দ্র দেব, সর্দার শার্দূল সিং কবিশের ও সুভাষচন্দ্রের অগণিত সমর্থক এবং গুণগ্রাহীদের গভীরভাবে মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ করে। এম. এস. আনে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন নেতারাও ওইভাবে প্রতিনিধিদের ভোটাধিকারে হস্তক্ষেপ করার প্রতিবাদ জানান এবং সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে (২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৯) প্রশ্ন করেন, "আমি উক্ত সদস্যদের (ওয়ার্কিং কমিটির) হাতের পুতুল হব না—এই জন্যই কি তাঁরা আমার বিরোধী?" বল্লভভাই প্যাটেলের যুক্তিগুলির অসারতার পুনরুল্লেখ করে তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, "আমার পুনরায় নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, এই যুক্তি এমনই বিস্ময়কর যে, এর প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। যদি ওই সমস্ত নেতারা (সর্দার প্যাটেল প্রমুখ) তাঁদের প্রভাব আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করতেন এবং আমার নির্বাচনের বিরুদ্ধে অনুজ্ঞা প্রচার না করতেন, তাহলে আমরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের যথার্থ অভিমত জানতে পারতাম এবং ওই অভিমত সর্দার প্যাটেলকে বিস্ময়ে অভিভূত করত।"

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও দেশজোড়া গভীর আগ্রহের মধ্যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (২৯ জানুয়ারি, ১৯৩৯)। সকলকে বিস্মিত করে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস মহারথীদের সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০-১৩৭৫ ভোটে পরাজিত করে পুনর্নির্বাচিত হলেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের প্রদত্ত ভোটের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট প্রাপ্ত ১৫৮০টি ভোটের মধ্যে ৪০৪টি সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন বাংলা থেকে। অর্থাৎ ১১৭৬টি ভোট তিনি পান ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে। সুভাষচন্দ্রের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা ও সমর্থন ছিল সংশয়াতীত। বিশেষ করে, প্রচ্ছন্নভাবে গান্ধীজির এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অনুগত বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের প্রবল বিরোধিতা, প্রচার এবং চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের

পুনর্নির্বাচন ছিল এক চমকপ্রদ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর অনুরাগী সমর্থকরা অত্যন্ত উৎফুল্ল বোধ করেন। বিজয় অভিনন্দনের উত্তরে অভিভূত সুভাষচন্দ্র বলেন যে, সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'ব্যক্তিগত' কিছু নেই, এই কথাটি তিনি প্রথম থেকেই বলে এসেছেন। এই জন্যেই 'তিক্ততা কিংবা বিদ্বেষের লেশমাত্র ছাড়াই' তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছিল। সমর্থকদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আবেদন কবেন তাঁরা যেন 'বয়োজ্যেষ্ঠদের অহেতুক সমালোচনা কিংবা নিন্দা' না করেন। এই আনন্দের মুহূর্তে এমন কোনও শব্দ উচ্চারণ কিংবা এমন কোনও কাজ না করেন যাতে কারোর অনুভূতি আহত হয়, কারোর প্রতি কটাক্ষ না করা হয়। সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতি তাঁর সদিচ্ছা ও এক সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টির আন্তরিক প্রযাসের প্রকাশ হলেও এর মধ্যে বাস্তবচিত্রের কোনও প্রতিফলন ছিল না। তাঁর প্রতি ওযার্কিং কমিটির 'বয়োজ্যেষ্ঠ' বা প্রবীণ নেতাদের বিরূপতা কতটা, তাঁর অপ্রত্যাশিত জয়ে তাঁরা কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তাঁদের পিছনে তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) আসল প্রতিপক্ষ কে তা সুভাষচন্দ্র সঠিক অনুমান করতে পারেননি। এই মারাত্মক ভুল তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা এবং বিচারবুদ্ধির অভাবের ফলেই হয়েছিল বললে অন্যায় হবে না।

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন যে গান্ধীজি চান না তা পূর্বেই সুস্পষ্ট হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজিকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করতে। তিনি জওহরলালকেও অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন। তাতে কোনও ফল হয়নি। যে 'ঘরোয়া' আলোচনায় পট্টভি সীতারামাইয়াকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেখানে গান্ধীজি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কোনও সিদ্ধান্ত যে তাঁর পূর্ণ অনুমোদন ছাড়া নেওয়া অসম্ভব তা কারোর অজানা ছিল না। গান্ধীজি নিজেও সুভাষচন্দ্রকে প্রার্থী না হতে বলেছিলেন। প্যাটেল, পন্থ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী প্রমুখ নেতারা গান্ধীজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করবেন না তাও জানা কথা ছিল। তবুও সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারেননি বা পারলেও মন থেকে মানতে পারেননি যে, গান্ধীজিই তাঁর বিরোধীদের শক্তির মূল উৎস। তাঁর বিশ্বাস ছিল গান্ধীজি এই ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক-বিরোধ ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। তাঁর সেই বিশ্বাস প্রচণ্ড আঘাত পেল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই গান্ধীজির বিবৃতিতে (৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৯)। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, গোড়া থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা শোভন হয়নি। পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর উদ্যোগে প্রার্থী হয়েছিলেন। সুতরাং এই পরাজয় "সীতারামাইয়ার পরাজয় আমারই বেশি, তাঁর নয় (the defeat is more mine than 'his')।" তথাপি তিনি সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে আনন্দিত। সুভাষচন্দ্র 'দক্ষিণপন্থী'দের অনুগ্রহে সভাপতি না হয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এখন তিনি বিনা বাধায় একমতাবলম্বী সদস্যদের নিয়ে একটি সুসংহত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন। নিজের নীতি ও কর্মসূচী কার্যকর করতে পারবেন। এই বিবৃতিতে তিনি সুভাষচন্দ্রকে 'প্রশংসাপত্র'ও দিয়ে বললেন, "যাই হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন (After all, Subhas Babu is not

an enemy of the country)।" গান্ধীজির এই বিবৃতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো ছিল। তিনি কার্যত জানালেন সুভাষচন্দ্র তাঁর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের বিরাগভাজন হয়ে এবং তাঁদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কেমন করে সভাপতিরূপে কাজ করতে পারেন তা তিনি দেখবেন। অমলেশ ত্রিপাঠী গান্ধীজির এই বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "এত ভদ্র ভাষায় এমন ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে ?"

গান্ধীজির বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র গভীর মর্মাহত হন। গান্ধীজির বক্তব্য এবং নির্বাচনের ফলাফলকে তাঁর (গান্ধীজির) ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ের প্রতীকরূপে দেখার যুক্তিকে খণ্ডন করেন। গান্ধীজির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আমার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী কিরূপ মত পোষণ করেন, তা আমি জানি না। কিন্তু তাঁর মতামত যাই হোক না কেন, তাঁর বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব। অন্যান্য সকলের আস্থা অর্জন করেও আমি যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের আস্থা লাভ করতে না পারি, তাহলে সেটা আমাব পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হবে।" আবেগপ্রবণ সুভাষচন্দ্র ভুল প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁর প্রতি গান্ধীজি ও গান্ধীপন্থীদের বিরোধিতার গভীরতা, নির্বাচনে পরাজয়ে তাঁদের হতাশা ও অপমানবোধের তীব্রতা তিনি পরিমাপ করতে পারেননি। কোনও মতেই তাঁরা যে তাঁকে সভাপতি পদে মেনে নেবেন না (একমাত্র সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ছাড়া) তা সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর দৃঢ় আশা ছিল যে, উদার সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করলে বিভিন্ন মতের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সুসংহত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হবে। বিরোধ ও তিক্ততা পিছনে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করা সম্ভব হবে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও আপস ও অবিলম্বে এক সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নে কোনও সমঝোতা করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলে তাঁর সমর্থন লাভের জন্যে সুভাষচন্দ্র ১৫ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওই দিনই ওয়ার্ধা থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র জানান যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'স্বভাবসিদ্ধ সদয় ব্যবহার ও প্রীতির সঙ্গে' তাঁকে গ্রহণ করেছেন। 'পরিপূর্ণ হার্দ্য পরিবেশে 'উভয়ের মধ্যে তিন ঘণ্টা ব্যাপী 'জ্বলন্ত' সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা হয়নি। কয়েকটি সাময়িক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও সেগুলি জানাবার সময় আসেনি। বাস্তবে কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হয়েছিল। গর্ডন এর কারণ উল্লেখ করে লিখেছেন যে, সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle বইটিতে গান্ধীজি ও গান্ধীপন্থীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তাতে গান্ধীজি তাঁর ওপর খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। এর ওপর ছিল ত্রিপুরীর সভাপতি নির্বাচনের সাম্প্রতিক ঘটনা। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্রকে 'শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন' ('preparing to teach him a lesson')। পরে গান্ধীজিকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রে (২৫ মার্চ, ১৯৩৯) জানা গিয়েছিল যে, গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর কোনও ঐকমত্যই হয়নি। তবু সুভাষচন্দ্র একটি সম্মানজনক মীমাংসা ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গান্ধীপন্থী নেতাদের সহযোগিতার আশা ছাড়েননি। আচার্য কৃপালনী লিওনার্ড গর্ডনকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা (Old Guard) তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস পরিচালনায় সহযোগিতা করবে, এটা চিন্তা করার অর্থ সুভাষচন্দ্র 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে গান্ধীজির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে একটি সম্মানজনক মীমাংসায় আসার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমলেশ ত্রিপাঠী বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীজির সঙ্গে ওয়ার্ধায় সাক্ষাৎকারে 'ব্যাপারটা ভদ্রভাবে মিটিয়ে না নিয়ে' সুভাষচন্দ্র একটি বড় ভুল করেছিলেন।

মস্ত ভুল সুভাষচন্দ্র সত্যিই করেছিলেন, কিন্তু সেটি কয়েকদিন পরে। ওই প্রসঙ্গে আসার পূর্বে কৃপালনীর সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন সম্বন্ধে একটি তথ্য উল্লেখ করি। আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও ওই সময় কংগ্রেসের মহাসচিব ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কট্টর বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র যখন গুরুতর অসুস্থ এবং প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় অধিবেশনে আসেন তখন কৃপালনী মন্তব্য করেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র সত্যিই অসুস্থ নন। তিনি 'নাটক করছেন'। সেই কৃপালনীই পরবর্তীকালে ঘোষণা করেছিলেন, "কংগ্রেস পঞ্চাশ বছরে যা করতে পারেনি সুভাষ তা পাঁচ বছরে করেছেন।" অবশ্যই এই স্বীকারোক্তি তিনি করেছিলেন বহু বছর পরে 'নেতাজি'র অবদান স্মরণ করে। এই স্বীকৃতি অন্য বহু নেতা, একদা যাঁরা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁকে শেষপর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরাও মুক্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন। কিন্তু যে ঐতিহাসিক সত্যটি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয় তা হল, 'দেশনায়ক' ও 'রাষ্ট্রপতি' (কংগ্রেস সভাপতি) সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজি' সুভাষচন্দ্রে উত্তরণ এক অবিচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও ইতিহাসের ধারার পরিণতি ছিল।

কয়েকদিন পরেই (২২ ফেব্রুয়ারি) ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলে সঙ্কট ঘনীভূত হয়। জওহরলাল নেহরু একই দিনে এক পৃথক পত্রে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে কার্যত তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্রকে জানান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিঠির ভাষা ও সুভাষচন্দ্রের সমালোচনা ছিল তীব্রতর। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সুভাষচন্দ্রকে কোনওরূপ সাহায্য করতে পারবেন না বলে জানিয়ে তিনি লেখেন, "আমি পাকা সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান হলেও গত কুড়ি বছর যাবৎ অনুসৃত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস শান্তিপূর্ণ পন্থা সর্বান্তকরণেই গ্রহণ করেছি।" প্যাটেল প্রমুখ ১২ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ গ্রহণ করা ছাড়া সুভাষচন্দ্রের কোনও বিকল্প বাধা ছিল না। ২২ ফেব্রুয়ারির ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অসুস্থতার জন্যে তিনি যোগ দিতে যেতে পারবেন না জানিয়ে সুভাষচন্দ্র ওই সভা স্থগিত রাখার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষার সৌজন্য পর্যন্ত দেখান হয়নি। নেহরুর চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বিশেষ আহত বোধ করেছিলেন। ত্রিপুরী অধিবেশন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে এক বিবৃতিতে (৪ মার্চ, ১৯৩৯) তিনি জওহরলালের অভিযোগগুলি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, "সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর পণ্ডিতজীর এই অভিযোগ যে, আমার কার্যকালে স্থানীয় কংগ্রেসের বিরোধ সাধারণ বাঁধাধরা পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি না করে শীর্ষবিন্দু থেকে নিষ্পত্তি করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস যে আমার কার্যকাল অপেক্ষা পণ্ডিত নেহরুর কার্যকাল সম্বন্ধে একথা বেশি পরিমাণে ঘটে।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, নেহরুই

একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "বস্তুত আপনি নির্দেশদানকারী সভাপতি অপেক্ষা স্পীকার হিসেবেই বেশি কাজ করেছেন।"

সুভাষচন্দ্র যে অযৌক্তিক কথা বলেননি তার সমর্থন রয়েছে খোদ পট্টভি সীতারামাইয়ার স্বীকৃতিতে। তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা সীতারামাইয়া লিখেছেন যে, সুভাষচন্দ্র কখনও নিজের মতামত জাহির করা পছন্দ করতেন না। সভাপতিরূপে কোনও বিরোধে পক্ষ অবলম্বন করার ইচ্ছা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্পষ্ট বক্তা হলেও কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সংযত, সহনশীল, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

৪২

ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদানের জন্যে নিদারুণ অসুস্থ শরীর নিয়ে সুভাষচন্দ্র ৬ মার্চ জব্বলপুরে উপস্থিত হন। পরের দিন বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব তুললেন। প্রস্তাবটিতে বলা হল : ত্রিপুরীর কংগ্রেস অধিবেশন গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত যে সব মৌলিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে তার প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে। কোনও ক্রমেই ওই নীতি থেকে সরে আসা উচিত হবে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিগত বৎসরের কার্যক্রমের প্রতি আস্থা জানাচ্ছে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহপ্রকাশমূলক মন্তব্য করা হয়েছে তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছে। আগামী দিনের সঙ্কটকালে গান্ধীজিই কংগ্রেস ও সমগ্র দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারেন। তাঁর আস্থাভাজন হওয়া কংগ্রেস পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে অপরিহার্য। গান্ধীজির পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়েই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্যে কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ জানান হচ্ছে।

পন্থের এই প্রস্তাবের আক্রমণের লক্ষ্য এবং মর্মকথা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা এবং নব নির্বাচিত সভাপতিরূপে গান্ধীজির কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব। গান্ধীজি নিজে ত্রিপুরী অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজকোটে জয়পুরের রাজাদের সঙ্গে প্রজামণ্ডলের দাবি নিয়ে এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ওই সমস্যা যতই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা ত্রিপুরী অধিবেশনের চেয়েও জরুরি ছিল না। ত্রিপুরী অধিবেশনের অভূতপূর্ব সঙ্কট যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তাতে গান্ধীজির উপস্থিতি একান্তই অপরিহার্য ছিল। রাজকোটের সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা মাত্র ক'দিনের জন্যে পিছিয়ে দিলে তেমন কোনও ক্ষতি হত না। গান্ধীজির অনুপস্থিতির পিছনে যে রাজনৈতিক কৌশল কাজ করেছে সে রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বড়লাট লিনলিথগো ৭ মার্চ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, গান্ধীজি ত্রিপুরীতে যান আর নাই যান, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, তিনি সুভাষচন্দ্রকে 'কনুই'-এর ধাক্কা দিয়ে কোণঠাসা করেছেন এবং নিজেকে মঞ্চের আলোর সামনে নিয়ে এসেছেন ('Whether

he goes to Tripuri or not he has beyond any question completely elbowed the unhappy Bose out into the cold...and has concentrated the spotlight on himself'.)। বড়লাট খুব ভুল কিছু বলেননি।

তুমুল বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর পন্থ প্রস্তাবটি ২১৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই সভাপতি পদে নির্বাচনে সাফল্যের পর এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত মনে হলেও খুব বিস্ময়কর ছিল না। সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরেই তাঁর প্রবল প্রতাপ ও প্রভাবশালী বিরোধীপক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে সভাপতি রূপে নিষ্ক্রিয় করার উদ্যোগ নেন। আবেগপ্রবণ সুভাষচন্দ্রের তুলনায় তাঁরা ছিলেন অনেক ধীর স্থির ও কৌশলী। তাঁদের প্রথম লক্ষ্য ছিল সুভাষচন্দ্র যেন সত্যিই সুসংহত ও কর্মক্ষম কোনও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে না পারেন। ওয়ার্কিং কমিটি যদি সভাপতির পছন্দমত না হয়, তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা না করেন তাহলে তাঁর পক্ষে কংগ্রেস সংগঠন পরিচালনা ও নিজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব হবে। প্রবীণ গান্ধীপন্থী নেতারা সভাপতি পদে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করাতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস সংগঠনে তাঁদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেক বেশি। গান্ধী-অনুগত দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীরূপেও তাঁরা ছিলেন অনেক বেশি সংগঠিত। রাজনীতির পিচ্ছিল পথ ও কূট-কৌশলের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল অনেক বেশি। কেমন ভাবে ও কী উপায়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যায় সেই বিষয়ে তাঁরা ছিলেন অভিজ্ঞ। তুলনামূলকভাবে এইসব দিক থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন কম অভিজ্ঞ ও দক্ষ। তাঁর শক্তির প্রধান উৎস ছিল এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি, সম্মোহনী ভগবদ্দত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি। সঙ্গী সাথী ও সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা। ইংরাজি পরিভাষায় charisma। কিন্তু সারা দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও বিভিন্ন প্রদেশে তিনি তাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারেননি। সেই সুযোগ ও সময়ও তিনি পাননি। তিনি এগার বার কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর ওপর যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়েছিল তা অন্য কোনও সর্বভারতীয় নেতাকে সহ্য করতে হয়নি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে দীর্ঘ সময় তিনি ইউরোপে ছিলেন। ভারত সরকার, বাংলা সরকার, গোয়েন্দা-পুলিশ বাহিনী এবং ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান শত্রু। কোনও সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সরকারি রোষানল ও সতর্কদৃষ্টি থেকে মুক্তি পাননি। তাঁর মনোবল ও লৌহসঙ্কল্প এতটুকু শিথিল না হলেও তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন যৌবনের প্রতীক। ভারতবর্ষের জাগ্রত যুবশক্তির কাছে তিনি ছিলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেম, সর্বত্যাগী মুক্তিসংগ্রামী এক আদর্শ পুরুষ। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী উচ্চমহলে এবং নীতি ও কার্যসূচী নির্ধারণে ছাত্র-যুব সমাজের প্রভাব ও ভূমিকা ছিল গৌণ। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে, বিশেষ করে হরিপুরা কংগ্রেসে ও ত্রিপুরী অধিবেশনের সঙ্কটকালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই সমর্থনের ভিত দুর্বল ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের দুর্বলতা সুভাষচন্দ্রের অজানা ছিল না। সভাপতি পদের নির্বাচনের দু' সপ্তাহ পূর্বে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন (১৫

জানুয়ারি, ১৯৩৯), "আমি দেখতে পাচ্ছি সংখ্যাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত বামপন্থীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ ও বিসম্বাদে বিদীর্ণ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা গত কয়েকমাসে শক্তি সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, শক্তি খুইয়েছে।" সুভাষ-সমর্থক বামপন্থীদের দুর্বলতা ও দ্বিধা পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে আরও প্রকট হয়েছিল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতির ভাষণ (১০ মার্চ) ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি নিজে অসুস্থতার জন্যে ভাষণটি দিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র বসু এটি পাঠ করেছিলেন। রাজকোটের সমস্যার প্রশ্নে গান্ধীজি অনশন শুরু করেছিলেন। সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার পর তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। সুভাষচন্দ্র তার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখদের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ এবং জওহরলালের কার্যত পদত্যাগের উল্লেখ করলেও তিনি ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের জটিলতা প্রসঙ্গে তিনি মিউনিখ চুক্তির (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) উল্লেখ করে বলেন ওই চুক্তির ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে আরও আগ্রাসী পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়েছে। এর সুযোগ গ্রহণ করে এখনি স্বরাজের দাবিটি উত্থাপন করে একটি চরমপত্র দাখিল করতে হবে। উত্তরের জন্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দিতে হবে। যদি অসন্তোষজনক উত্তর কিংবা আদৌ উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে জাতীয় দাবি আদায়ের জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে 'সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহের মতো বৃহৎ সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রস্তুত নয়'। এই রকম সংগ্রামের সময় এখনও আসেনি বলে সংশয় প্রকাশ দুঃখজনক। এরকম বিরল সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে তা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা হবে। পরিশেষে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আবেদন করে বলেন যে তাঁর বিশ্বাস 'মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া' দূর হবে। মহাত্মা গান্ধী জাতিকে পরিচালনা করে কংগ্রেসকে বর্তমান সঙ্কটমুক্ত করতে সহায়তা করবেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণে সুস্পষ্ট ছিল যে তিনি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে গভীরভাবে আগ্রহী। সাম্প্রতিক মতভেদ, মতান্তর এবং তিক্ততা ভুলে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করতে উদগ্রীব। ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে, কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণে সকল দল ও মতের যথাযথ স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দিতে তিনি প্রয়াসী। মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধীজির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আছে। গান্ধীজিই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্যে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করুন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্র ঐকান্তিকভাবে তাঁর লক্ষ্যসাধনের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন। সর্দার প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আজাদ, কৃপালনী প্রমুখ নেতারা তাঁর একান্ত অনুগত হলেও গান্ধীজি নিজে সব সঙ্কীর্ণতা, গোষ্ঠীতন্ত্র, ব্যক্তিস্বার্থ, বিদ্বেষ-বিরূপতার ঊর্ধ্বে। মতপার্থক্য, প্রকাশ্য বিরোধ-বিতর্ক এবং তাঁর পুনর্নির্বাচনে গান্ধীজির অসন্তোষ সত্ত্বেও গান্ধীজি তাঁর আবেদনে সাড়া দেবেন। ওয়ার্কিং কমিটির থেকে ১২ জন সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে যে অচল

অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার সুষ্ঠু ও সম্মানজনক মীমাংসায় গান্ধীজি সাহায্য করবেন। জওহরলালও গান্ধীজির পরামর্শ ও ইচ্ছার বিরোধিতা করবেন না। গান্ধীজিকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অন্যদের মতো 'অন্ধ গান্ধীভক্ত' ছিলেন না। মৌলিক নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে কারোর সঙ্গেই তিনি আপস করতেন না। গান্ধীজি জ্ঞানত কোনও অন্যায়-অবিচার করবেন না, এই বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের বদ্ধমূল ছিল। সিতারামাইয়ার পরাজয়কে নিজের পরাজয় রূপে বর্ণনা করার পরেও সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেননি (বা করতে চাননি) যে, তাঁর মূল বিরোধ গান্ধীজির সঙ্গেই। তিনিই তাঁর আসল প্রতিপক্ষ। অন্যরা যা কিছু বিবৃতি দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও কৌশল গ্রহণ করেছেন তার পিছনে গান্ধীজির পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন অনুমোদন আছে। তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমোদন সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে তাঁদের পক্ষে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া অসম্ভব।

গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতে খোলাখুলি আলোচনা করে তিনি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গান্ধীপন্থী নেতাদের সহযোগিতা পাবেন আশা করেই সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরীর নিয়ে ওযার্ধায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। এরপর গোবিন্দবল্লভ পন্থ যখন কার্যত সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন তখনও সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ ছিল পন্থের প্রস্তাবের বয়ান গান্ধীজি দেখেছিলেন কি না বা ওই বিষয়ে তাঁর অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না। অথচ ত্রিপুরীতে ব্যাপকভাবে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে পন্থ, প্যাটেল প্রমুখের প্রস্তাবের পিছনে গান্ধীজির সমর্থন আছে। সুভাষচন্দ্র এটা বিশ্বাস করেননি। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সঙ্কট, বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি নির্ধারণ এবং ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে চরমপত্র দিয়ে দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা নিয়ে গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ (২৪ মার্চ-৬ মে, ১৯৩৯) হয়েছিল। ২৭ এপ্রিল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির কলকাতায় সাক্ষাতও হয়। সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করার জন্যে গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন। তাঁর (গান্ধীজির) সিদ্ধান্ত মেনে নেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু গান্ধীজি তাতেও অসম্মত হন। তিনি বলেন সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্রের নিজের পছন্দমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। অথচ গান্ধীজি ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর ভক্তদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে সভাপতি রূপে কাজ করা অসম্ভব। ওই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে পদত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্র পদত্যাগই করেছিলেন (৩০ এপ্রিল, ১৯৩৯)।

গান্ধী-সুভাষ বার্তা ও পত্র বিনিময় উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণের মূল্যবান দলিল। এইগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের অবসান ঘটিয়ে, গান্ধীজির নেতৃত্বে অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে গণ-আন্দোলন শুরু করার জন্যে সুভাষচন্দ্র অধীর হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীজির পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত ছিলেন শুধু একটি মাত্র শর্তে। সেটি হল, ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র ও গ্রহণযোগ্য উত্তর দেবার সময়সীমা বেধে দিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু গান্ধীজির অভিমত ছিল যে, উপযুক্ত সময়, পরিস্থিতি ও পরিবেশ তখনও সৃষ্টি হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি ব্যক্তিগত স্নেহ ও শুভ কামনা জানালেও গান্ধীজি তাঁর অবস্থান থেকে এতটুকু সরে আসেননি। নমনীয়তা দেখাননি। গান্ধীজির সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সুভাষচন্দ্র এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে, কারোর কারোর কাছে তা প্রায় তাঁর 'আত্মসমর্পণ'-এর ইচ্ছা বলে মনে হয়েছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। গান্ধীজিকে তিনি লিখেছিলেন (২৯ মার্চ, ১৯৩৯), "আমি প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি নই এবং বিরোধ পুষে রাখি না। এক অর্থে আমার মনোবৃত্তি মুষ্টিযোদ্ধার মতো অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে হাসিমুখে করমর্দন করি এবং খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তিতে ফলাফল গ্রহণ করি।"

গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে, পন্থ-প্রস্তাবের কোনও অনুলিপি তাঁকে পাঠান হয়নি। কয়েকদিন পরে এলাহাবাদে না আসা পর্যন্ত প্রস্তাবটি তাঁর চোখেও পড়েনি। গান্ধীজির এই কথা জেনে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে লেখেন, "ত্রিপুরীতে এই গুজবে আকাশ ভরপুর ছিল যে প্রস্তাবটির পিছনে আপনার পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমরা যখন ত্রিপুরীতে ছিলাম তখন এই মর্মে একটি বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।" প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি এটি ভিত্তিহীন গুজব মাত্র ছিল? গান্ধীজি পন্থ-প্রস্তাব পড়েননি এবং তাঁকে ওই বিষয়ে কিছু জানান হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন। গান্ধীজি সারা জীবন সত্যের পূজারী ছিলেন। সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মূল কথা। সুতরাং তাঁর পক্ষে অসত্য ভাষণ ছিল অসম্ভব। অন্য দিকে পুনর্নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস অধিবেশনের মধ্যেই অনাস্থা প্রকাশ কবে প্রস্তাব আনার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গান্ধীজির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাঁর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে আনা অসম্ভব ছিল। সমস্ত প্রস্তাবটির মূল সুর ছিল গান্ধী বনাম সুভাষচন্দ্র। পন্থ পরে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তাঁরা গান্ধীজির পক্ষে ছিলেন, সুভাষের বিপক্ষে নয়। এ ছিল লৌকিক ভাষায় 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র চেষ্টা মাত্র। গান্ধীজিকে সরাসরি যুক্ত করে এরকম একটি প্রস্তাব, যা প্রকৃত অর্থে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণার নামান্তর মাত্র ছিল, গান্ধীজির অজ্ঞাতসারে আনা সম্ভব ছিল না। এই রহস্যের সমাধানের সূত্র সম্ভবত আছে গান্ধীজি সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে। তাঁকে বলা হয়েছে 'A politician saint'। আসলে গান্ধীজির মধ্যে এক সন্ত বা মহাপুরুষ এবং এক ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের দ্বৈত সত্তা ছিল। মাঝে মাঝেই তার প্রকাশ ঘটত।

গান্ধীজি কোনও অসত্য ভাষণ করেননি। তিনি পন্থ-প্রস্তাবটি পড়েননি। প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরীতে বিষয়-নির্বাচনী সভায় পেশ করার পূর্বে তিনি তা দেখেননি। প্রস্তাবের বয়ান তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু ওই রকম একটি উদ্যোগ যে পন্থ প্যাটেল প্রমুখ নিতে চলেছেন তা তিনি জানতেন। তাঁর সমর্থনও তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। এরপর যা কিছু করার করেছিলেন তাঁর ভক্তরা। ত্রিপুরীর ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হত্যায় যুধিষ্ঠিরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্রোণাচার্যকে বধ না করলে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে একমাত্র এই সংবাদ শুনলে দ্রোণাচার্য অস্ত্রত্যাগ করবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। আর তা না করলে দ্রোণাচার্যকে বধ করা ছিল অসম্ভব। তাই শেষপর্যন্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যকে শোনাতে হয়েছিল,

'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ'। মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য ছিল দ্রোণাচার্য বধে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকার মতো। ত্রিপুরীর ঘটনা এবং শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও কংগ্রেস থেকে তাঁকে বহিষ্কারের আদেশ অভিমন্যুর কথাও স্মরণ করায়। চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বীব অভিমন্যু সংগ্রাম করেছিলেন সাত মহারথীর বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র সংগ্রাম কবেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালনী, রাজাগোপালাচারি, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সিতারামাইয়া, সবোজিনী নাইডু প্রমুখ মহারথীদের বিরুদ্ধে। এঁদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে ছিলেন জওহরলাল নেহরুও। মহারথীদের পিছনে অলক্ষ্যে ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু বেরিয়ে এসে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সংগ্রাম কংগ্রেসের যে মহারথীরা তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল না। অমিত শক্তিশালী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে—স্বদেশে এবং দেশের বাইরে। নেতাজিরূপে বিভিন্ন ভাষণে তিনি গান্ধীজি ও জওহরলালকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কোনও তিক্ততা বা বিদ্বেষ তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রকৃত অর্থেই তিনি 'খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব'-এর (sportsmanship) দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

কংগ্রেসের যে নেতারা সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন, রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ও কিছুটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের পরিচয় কখনও কখনও দিয়েছিলেন তাঁদেরও স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ গঠনে অবদান অবিস্মরণীয়। রাজনৈতিক জীবনে ঘটনাচক্রে আবিলতার আবর্তে পড়া দুঃখজনক হলেও এটি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। তিরিশের দশকে গান্ধীজির নেতৃত্বকে কেউ চ্যালেঞ্জ করবেন, তাঁর নীতি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, এটি ছিল তাঁদের কাছে অসহনীয়। গান্ধীজি নিজেও তাঁর অনুগামীদের পূর্ণ আনুগত্য চাইতেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালেই বলেছিলেন, "মহাত্মার ক্ষেত্রে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী বিপজ্জনক। কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত। মহাত্মা আর কারও নেতৃত্ব মেনে নেবেন না।" ১৯৩৮-১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র কিন্তু ঠিক তাই-ই করেছিলেন। গান্ধীজির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা, তাঁর খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং কংগ্রেস সংগঠনে ও জনচিত্তে তাঁর অনন্যসাধারণ মর্যাদার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয়েও তিনি গান্ধীজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই বিদ্রোহ ব্যক্তি গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও নয়। সুভাষচন্দ্র প্রথমে প্রতিবাদ ও পরে বিদ্রোহ করেছিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ, অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করতে তাঁর অসম্মতি এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করার প্রবণতার বিরুদ্ধে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নেও গান্ধী-সুভাষের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজি ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতারা 'সর্বহারা'দের পাশে না দাঁড়িয়ে ক্রমেই 'ধনিক'দের পাশে ঝুঁকে পড়ছেন বলে সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর 'The Indian Struggle'-এ দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছিলেন, "দেশের জন্যে মহাত্মা গান্ধী অভূতপূর্ব কাজ করেছেন ও করে যাবেন। কিন্তু ভারতের মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।"

গান্ধী-সুভাষ বিরোধ সুভাষের পুনর্নির্বাচন ও পদত্যাগের নাটকীয় ঘটনা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি কোনও সহানুভূতি বা সমর্থন থাকার প্রশ্নই ছিল না। তাঁর পরাজয় ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ব্রিটিশ সরকারের কাছে একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব স্যার রিচার্ড টটেনহ্যামের মন্তব্য ছিল কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। টটেনহ্যাম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন যে, রাজকোটে গান্ধীজির 'আমরণ-অনশন'-এর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় মূল দৃষ্টি রাজকোটে কেন্দ্রীভূত করা। 'মহাত্মার ইচ্ছা অনুসারে'-ই পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদ ত্যাগ করা প্রসঙ্গ টটেনহ্যাম লেখেন, "সেই মানুষটির বিরুদ্ধে এই ছিল কংগ্রেস স্বৈরাচারীর প্রতিশোধ, যিনি ঠিক তিন মাস আগে স্বৈরাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায্যভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।" গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, তাঁদের কোনও প্রচেষ্টাই কখনও সফল হয়নি, কিংবা অশান্তি, বিশৃঙ্খল, হিংসা অথবা কষ্টস্বীকার ছাড়া আর কোনও লাভ হয়নি। রাজনীতি বাদ দিলেও সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ এবং এমনকি চরকা কাটা—সেখানেও গান্ধীজি কাজ শুরু করে কখনও সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেননি। কিছুদূর এগিয়ে কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে তা পরিত্যাগ করেছেন। টটেনহ্যাম পরিশেষে মন্তব্য করেন, "বলা হয় যে, মিস্টার গান্ধী তাঁর সময় থেকে শত বৎসর এগিয়ে ছিলেন। তা হতে পারে···যদি তা সত্যি হয়, তবে এটিও সমভাবে সত্য যে, একজন মানুষ, যিনি সময় থেকে এতখানি এগিয়ে, তিনি আমাদেব প্রতিদিনকার পৃথিবীর দৈনন্দিন কাজকর্মের একজন বাস্তববাদী নেতা হিসাবে তাঁব অনেক পিছনেব সারির নেতার থেকে বেশি কার্যকর নন। আজ ভারতের প্রযোজন একজন বা একদল যুবকের, যাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে অথচ যাঁরা অলীক কল্পনাপ্রবণ নন। এমন একদল যুবক চাই যাঁরা পরিস্থিতিব যথাযথ অবস্থা অনুযায়ী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন, যাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োজনে দেখাতে পারেন আপস করার সাহসকে··।" টটেনহ্যামের মতো ব্রিটিশ প্রশাসকদের গান্ধীজি সম্বন্ধে বীতরাগ প্রমাণ করছিল তাঁদের গান্ধী-ভীতি কতখানি প্রবল ছিল। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি ও সপ্রশংস মনোভাব থাকলেও তাঁর আপসহীন মনোভাবের জন্যে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

৪৩

গান্ধীজির উদ্যোগ ও মধ্যস্থতায় সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য সূত্রের সম্ভাবনার আশা সুভাষচন্দ্র ত্যাগ করেননি। গান্ধীজিকে তিনি লেখেন (৩১ মার্চ), "এই বিপদ থেকে কংগ্রেস ও দেশকে রক্ষা করা আপনারই হাতে। যে-সব মানুষ বিভিন্ন কারণে সর্দার প্যাটেল ও তাঁর গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ রূপে বিদ্বিষ্ট তাঁদের এখনও আপনার ওপর আস্থা আছে এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আপনি নৈর্ব্যক্তিক ও নির্দলীয় দৃষ্টিতে সব কিছু

বিচার করতে পারেন। তাঁদের কাছে আপনি 'জাতীয়' ব্যক্তিত্ব—দল ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে—সুতরাং আপনি বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপন করতে পারেন।" সুভাষের এই আবেদনের উত্তরে গান্ধীজি জানালেন (২ এপ্রিল), "তুমি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট বক্তা এবং তোমার মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্যে আমি তোমার পত্র পছন্দ করি।" কিন্তু এরপরই তিনি তাঁর অননুকরণীয় মিষ্টি ভাষায় সুভাষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে লিখলেন, "আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, হয়তো আমি ভীরু হয়ে উঠছি এবং কিছুটা অতি সাবধানীও বটে। আর তোমার সামনে রয়েছে যৌবন এবং যৌবন হতে সঞ্জাত বাধাবন্ধহীন আশাবাদ। আমি আশা করি যে তুমি সঠিক এবং আমি ভ্রান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজ কংগ্রেস যে অবস্থায় আছে তাতে তার পক্ষে কার্যোদ্ধার করা সম্ভব নয় এবং উল্লেখ্যভাবে আইন অমান্যও সে করতে পারবে না। সুতরাং তোমার বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয় তাহলে আমি অচল হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং সত্যাগ্রহের সর্বাধিনায়ক হিসেবেও আমার ভূমিকার অবসান ঘটেছে।" সোজা কথায় গান্ধীজি জানালেন যে সুভাষচন্দ্রের যুক্তি ও বক্তব্য তিনি একেবারেই মানেন না। কোনও বড় রকমের আন্দোলন শুরু করার পরিস্থিতি নেই এবং এরকম চিন্তাও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। যদি সুভাচন্দ্রের ইচ্ছা হয় তিনি নিজেই যা ভাল বোঝেন করুন। তার সঙ্গে তিনি কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে চান না।

গান্ধীজির চিঠি ও মনোভাবে গভীরভাবে আহত সুভাষচন্দ্র লিখলেন (৬ এপ্রিল), "আপনি একটি পত্রে মন্তব্য করেছেন যে যাই ঘটুক না কেন আপনি আশা করেন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না। আমিও সর্বান্তকরণে এই আশা পোষণ করি। এই প্রসঙ্গে আমি কি বলতে পারি যে জীবনে যদি আমি কোনওকিছুর জন্যে গর্ববোধ করে থাকি, তবে তা এই যে আমি ভদ্রলোকের সন্তান এবং সেজন্য নিজেও একজন ভদ্রলোক। দেশবন্ধু আমাদের প্রায়ই বলতেন—'জীবন রাজনীতি অপেক্ষা বৃহত্তর'। তাঁর কাছ থেকে সেই শিক্ষা আমি পেয়েছি।" গভীর মর্মাহত, ক্ষুব্ধ, অভিমানী সুভাষচন্দ্র আহত সিংহের মতো গর্জে উঠলেন চিঠির শেষে : "আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন মহাত্মাজি, যে গত কিছুদিন ধরে আমি শুধু একটি বিষয়ের জন্যে প্রার্থনা করছি। তা এই যে আমার ও আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যা শ্রেষ্ঠ পথ সে বিষয়ে আলোকসম্পাত প্রয়োজন ও উপলক্ষ দেখা দিলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যাতে মুছে ফেলতে পারি সে জন্যে শক্তি ও প্রেরণা আমি প্রার্থনা করেছি...আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একমাত্র যে ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা জাতি গঠিত তারা যদি প্রয়োজন দেখা দিলে জাতির জন্যে আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত থাকেন তবেই সে জাতি বাঁচতে পারে। এই নৈতিক (কিংবা আধ্যাত্মিক) 'হারাকিরি' সহজ জিনিস নয়। যখনই দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হবে তখনই মৃত্যুর সম্মুখীন হবার মতো শক্তি ঈশ্বর যেন আমাকে দেন।"

কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে (২৩ এপ্রিল, ১৯৩৯) সুভাষচন্দ্র এক জনসভায় পুনরায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে আবেদন জানান। আসন্ন অধিবেশনে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা আছে এবং তার জন্যে অধিবেশনে দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না, এরকম মন্তব্য ও প্রচারের উল্লেখ করে তিনি সকলের কাছে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের রাজকীয় সম্মান জানাবার অনুরোধ জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে

দেন যে বর্তমান বিতর্কে কোনও প্রাদেশিক প্রশ্ন জড়িত নয়। সমস্যাগুলির চরিত্র সর্বভারতীয়। সকলকে জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে।

শেষ মুহূর্তেও আশা ছিল যে, গান্ধীজি ও জওহরলালে সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে সঙ্কটের অবসান হবে। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হওয়ার অন্তরায় দূর হবে। কিন্তু গান্ধীজিব সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্ফল হয়। ৩০ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার আনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নেহরুর প্রস্তাব ছিল যে, পুরনো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাই নতুন কমিটিতে থাকবেন। কিন্তু কমিটিতে শীঘ্রই দু'টি আসন শূন্য হবে। ওই দুটি পদে সুভাষচন্দ্র তাঁর মনোনীত দু'জন প্রার্থীকে নেবেন। রফি আহমদ কিদোয়াই ও জয়প্রকাশ নারায়ণ নেহরুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। সে দিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়। পরের দিন সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে তাঁর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির চরিত্র যদি আবও প্রতিনিধিত্বমূলক হয় তবেই তাঁর পক্ষে সভাপতির পদে থাকা সম্ভব। তিনি বলেন যে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্ম-পরিষদ কয়েকজন "ব্যক্তিসমষ্টির নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্র হওয়া উচিত নয়...কগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা চাই।" সভায় পৌরোহিত্য করছিলেন সরোজিনী নাইডু। তিনি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য অস্পষ্ট বলে অভিহিত করেন। জহওরলাল তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। সরোজিনী নাইডু নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্যে আহ্বান জানান। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও কে. এফ. নরিম্যান এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সরোজিনী নাইডু তা অগ্রাহ্য করেন। এরপর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি রূপে নির্বাচন করেন। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই নতুন সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রস্তাবিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হতে অসম্মতি জানালে তাঁদের স্থানে ডাঃ বিধানন্দ্র রায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মনোনয়ন করেন। উল্লেখ্য হল, দু'জনই ছিলেন বাংলার প্রতিনিধি। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কট্টর গান্ধীপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই নিজেকে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে গান্ধীজি বৃন্দাবনে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের এক সভায় বলেন যে, তিনি এখনি ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেবার সম্পূর্ণ বিরোধী। সংগ্রাম করার মতো প্রস্তুতি ও শক্তি বর্তমানে কংগ্রেসের নেই। সুভাষচন্দ্রের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ধারণার কোনও মিল নেই। কংগ্রেসের মধ্যে 'দুর্নীতি' সম্পর্কেও তাঁর একই ধারণা। তিনি আরও বলেন যে, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য সুবিদিত হলেও প্রতিদিনই তাঁরা তাঁর (গান্ধীজির) আরও কাছাকাছি আসছেন। জওহরলালের সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য আছে। কিন্তু তা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁকে ছাড়া তিনি নিজেকে অসহায় (crippled) বোধ করেন। জওহরলালেরও একই অনুভূতি। "আমাদের হৃদয় অভিন্ন (our hearty are one)।" সুভাষচন্দ্র ও তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে গান্ধীজির মনোভাব ও বক্তব্য কী ছিল এরপর তা বুঝতে আর কোনও অসুবিধা ছিল না।

দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে বাংলায়, ব্যাপক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কংগ্রেসের

গান্ধীপন্থী প্রবীণ নেতারা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে অন্যায়ভাবে, তাঁকে অপমান করে পদত্যাগে বাধ্য করার চক্রান্ত করেছেন। ছাত্র-যুব সমাজে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। সুভাষ-অনুরাগীদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক, আদর্শনিষ্ঠ ও এক অদ্বিতীয় সংগ্রামী বীর পুরুষের জীবন্ত আদর্শ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগী কিছু সদস্যদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে পড়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্দার প্যাটেল ও কৃপালনী। কৃপালনী ওই সময় কংগ্রেসের মহাসচিব ছিলেন। তিনি শুধু পদত্যাগই করেননি, সুভাষচন্দ্র 'নাটক' করছেন এমন মন্তব্যও করেছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বল্লভভাই প্যাটেলের সুভাষ-বিরোধিতার পিছনে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও একটি ব্যক্তিগত কারণ ছিল। বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর উইলে বিদেশে জাতীয় কংগ্রেস ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারকার্যের জন্যে যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন তার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রকে ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন তা বল্লভভাই মেনে নেননি। এই নিয়ে তিনি আদালতে পর্যন্ত যান ও ওই মামলা বেশ কিছুকাল চলেছিল। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিরূপতা অন্য রূপ নিয়েছিল। গুরুতর অসুস্থতার জন্যে সুভাষচন্দ্র ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে যখন সর্দার প্যাটেলকে বার্তা পাঠান এবং অনুরোধ জানান ওই বৈঠক স্থগিত রেখে কয়েকদিন পরে করতে, তখন সর্দার প্যাটেল সুভাষচন্দ্রের 'অসুস্থতা একটি ভান,' বৈঠকে যোগদান না করার অছিলা মাত্র বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্য কতখানি অশোভন ও মিথ্যা ছিল তা বলা বাহুল্যমাত্র। সুভাষচন্দ্র এতে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহ কারও থাকতে পারে, বিশেষ করে যাঁরা তাঁর শ্রদ্ধেয়, অগ্রজতুল্য ও দীর্ঘকালের সহকর্মী, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় তিনি 'আমার অদ্ভুত অসুখ' (My Strange Illness) শীর্ষক একটি রচনায় (এপ্রিল ১৯৩৯) এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য দিয়ে তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কীয় প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে এই রচনাটির উল্লেখ থাকলেও তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধী-সুভাষ তথা গান্ধীভক্ত কংগ্রেস নেতাদের শক্তিশালী জোটের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ কেন এত তীব্র ও তিক্ত রূপ নিয়েছিল তা উপলব্ধি করার জন্যে এই রচনাটি মূল্যবান। মানুষ সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মানসিক গঠনের ওপরেও এই রচনাটি আলোকপাত করেছিল।

নিজের অসুস্থতার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে সুভাষচন্দ্র লেখেন যে, ত্রিপুরীতে যখন তিনি পৌঁছন তখন তাঁর ১০২° জ্বর। ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগী সদস্যদের একজন তা বিশ্বাস না করে কংগ্রেস শিবিরের ডাক্তারকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি নিজে তাপগ্রহণ করেছিলেন কি না। সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম পাঠাতে থাকেন। অনেকে ওষুধের নমুনা, কবচ আশীর্বাদী ফুল, পাতা, যজ্ঞভস্ম, নির্মাল্য পাঠান। বহু মহিলা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কবচ, মালা, প্রসাদী ফুল ইত্যাদি তাঁর বালিশের তলায় রাখার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লেখেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানসিকতার মানুষ, কিন্তু আমি যেখানে একমত হতে পারি না সেখানেও আমি অপরের সহানুভূতি ও আবেগের মর্যাদা রক্ষা করে চলি... এই

সব নিদানপত্র, ওষুধ, কবচ, ফুল যজ্ঞভস্ম প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য কী তা আমি নিজের মনে চিন্তা করতে থাকি। এগুলি আসে বিশাল ভারতীয় জনসমাজের প্রত্যেক শ্রেণী হতে এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সকল প্রান্ত হতে—এটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমার এত বিশাল সংখ্যক শুভার্থী ও সহানুভূতিকারী আছেন দেখে আমার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ভরে যায়।" এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সুভাষচন্দ্রেব ভবিষ্যতের রাজনৈতিক মনোভাবই শুধু নয়, সমগ্র জীবন সম্বন্ধে তার বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ত্রিপুরীর নৈতিক অসুস্থতা সৃষ্টিকারী আবাহাওয়া সুভাষচন্দ্রের মনে রাজনীতি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল। দিনের পব দিন তিনি সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু শত শত মানুষেব ওই সব পত্র, নিদানপত্র, ওষুধ, কবচ ও প্রসাদীফুল তাঁর কাছে এক অন্য ভারতেব রূপ প্রকাশ করেছিল। তিনি স্বীকার কবেন যে, তাঁর মধ্যে যে ক্ষোভ জন্মেছিল, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মানুষ সম্বন্ধে যে আস্থা চলে যেতে বসেছিল তা ফিরে আসে। তিনি উপলব্ধি কবেন, 'মানুষকে অবিশ্বাস করাব অর্থ হল তাব মধ্যে দেবত্বকে অবিশ্বাস কবা—নিজের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস কবা...আমি আবাব আমার স্বাভাবিক সুস্থ আশাবাদ ফিরে পেয়েছিলাম।" মানুষের ওপর এই বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের উৎসাহ অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অবিচল বিশ্বাস। তারই সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে ববীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' ভাষণের শেষ ঘোষণা ও সতর্কবাণী—'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারান মহাপাপ'-এর পূর্বাভাস। সুভাষচন্দ্র ওই রচনার পরিসমাপ্তিতে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘোষণা করে বলেন, "একটা জিনিস আমি জানি। এই ভারতের জন্যই পবিশ্রম করা হয় ও যন্ত্রণা ভোগ করা হয। এই সেই ভারত যার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া চলে। ত্রিপুরী যাই বলুক বা যাই করুক এই সেই প্রকৃত ভারত যাতে মৃত্যুহীন আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।'

ত্রিপুরীর পর এক নতুন সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল এটা বলা অত্যুক্তি হবে না। ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতা, আঘাত, হতাশা ও অবমাননা সুভাষচন্দ্রকে ইস্পাতের মতো কঠিন ও তরবারীর মতো শাণিত করেছিল। তিনি আরও নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী ও মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার জন্যে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজি' সুভাষচন্দ্রে রূপান্তরের পটভূমি সূচিত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের এক প্রধান কারণ ছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র National Front-এ সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবিতে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়-পন্থীরা ও অন্যান্য বামপন্থীরাও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। ত্রিপুরীতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের এক বড় প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। কিন্তু জয়প্রকাশ রাজনৈতিক চিন্তায় তখনও গান্ধীর অনেক কাছাকাছি ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেবার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তিনিও মনে করতেন যে, গান্ধীজি ছাড়া কোনও বড় আন্দোলন করা সম্ভব নয়। জয়প্রকাশ ব্রিটিশ সরকারকে একটি 'জাতীয় দাবিপত্র' দেবার প্রস্তাব করেন কিন্তু

তা মেনে নেবার জন্যে কোনও সময়সীমা বেঁধে দেবার পক্ষে তিনি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত জয়প্রকাশের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের প্রতিনিধিদের এক বড় অংশ পন্থ-প্রস্তাবেব ওপর ভোটদানে বিরত থাকেন। এর ফলে ওই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া অনেক সহজ হয়েছিল। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের কিছু সদস্য জয়প্রকাশের সিদ্ধান্তে খুব অখুশি হয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে অনেকেও খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁদের পার্টিব পক্ষে জয়প্রকাশের নীতির বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না। এব কাবণ ব্যাখ্যা করে সুধী প্রধান (তিনি ত্রিপুরীতে উপস্থিত ছিলেন) লিখেছেন, "অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সমস্যা ছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কম্যুনিস্ট কর্মীরা সকলেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট সংগঠনের মধ্যে কাজ করছিল।' অসন্তুষ্ট কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিরা বঙ্কিম মুখার্জীকে দিয়ে পন্থ-প্রস্তাবে বিরোধিতা কবেছিলেন। তাঁর সুবিধা ছিল তিনি একাধাবে কিষাণ সভার নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব সদস্য ছিলেন। কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগেব প্রশ্নে জয়প্রকাশের ভূমিকা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিযনাথ বসুকে লিখেছিলেন (১৭ এপ্রিল, ১৯৩৯), "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিব নেতৃত্বেব বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই আমাদের পরাজয় ঘটেছে।" CSP-র 'বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতকতার' তীব্র সমালোচনা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও করেছিল। আনন্দবাজাব পত্রিকায (১৯ মার্চ, ১৯৩৯) তৎকালীন বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক কমিউনিস্ট পার্টির সুরেন গোস্বামীর 'ত্রিপুরীর গান' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা অমলেন্দু ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এটিতে বাংলার কমিউনিস্টদের মনোভাব ফুটে উঠেছিল।

মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল
লাল বুলি আওড়ানো আমাদের ছল
কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা
জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা
চিৎকার করে শুধু বাড়ায়েছি গান্ধীর বল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল।...

লক্ষণীয় হল কবিতাটিতে জহরলালের পৃথক উল্লেখ। অমিয়নাথ বসুকে লেখা চিঠিতেও সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি, জওহরলালের চেয়েও বেশি অন্য কেউ ক্ষতি করেনি।

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, মতান্তর এবং মনান্তরের জন্যে কে কতখানি দায়ী ছিলেন, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে জওহরলালের ভূমিকা কী ছিল ইত্যাদি প্রশ্নগুলি এখনও খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। সাম্প্রতিক আলোচনার মধ্যে লিওনার্ড গর্ডন ও অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বি. আর. নন্দ-র (Jawaharlal Nehru : Rebel and Statesman) এবং এস. গোপাল-এর জওহরলাল নেহরুর জীবনীতে এই বিষয়ে

আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য অনেকেও লিখেছেন।

নেহরু পরিবারের সঙ্গে বসু পরিবারের হার্দিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল। মতিলাল সুভাষচন্দ্রকে স্নেহ করতেন, যদিও দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তখন এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক কর্মী। সর্বভারতীয় পরিচিতি ও প্রবীণ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর দক্ষতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্যে। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রথম দিকে ছিলেন রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে খুব কাছাকাছি। দু'জনেই সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার এবং কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জওহরলাল ছিলেন গান্ধীজির সবচেয়ে স্নেহভাজন। গান্ধীজি তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে তখনই জওহরলালকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। বহু ক্ষেত্রে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলেও এবং প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত করলেও নেহরু শেষপর্যন্ত গান্ধীজির বিরুদ্ধে যেতে পারতেন না। গান্ধীজির প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। এই নিয়ে সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন গান্ধীজির অনুরাগী। তাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন যে, তিনি অন্যদের মতো অন্ধভক্ত ছিলেন না। নীতির প্রশ্নে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে ভিন্ন মত ব্যক্ত করতে, প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। গান্ধীজিও সুভাষচন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর প্রশ্নাতীত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর অনুরাগীদের পূর্ণ আনুগত্য চাইতেন। তাঁর কথাই (আলোচনা-বিতর্কেব পর) শেষ কথা এটি কংগ্রেস মেনে নেবে তা তিনি চাইতেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া, প্রয়োজনে বিদ্রোহ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। গান্ধী-নেহরু-সুভাষের ত্রিকোণী সম্পর্ক নেহরু-সুভাষের সম্পর্ককে প্রভাবিত ও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। গান্ধী-সুভাষ ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য ও বিরোধে (যা ত্রিপুরী অধিবেশনে ও পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল) জওহরলালের পক্ষে গান্ধীজির পক্ষে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তবুও আশা করেছিলেন যে, জওহরলাল দক্ষিণপন্থী গান্ধীভক্তদের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন। এই অবাস্তব অলীক আশার মূল কারণ ছিল যে, সুভাষচন্দ্র তখনও উপলব্ধি করতে পারেননি যে তাঁর আসল প্রতিপক্ষ স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। অন্যরা তাঁর সেনাপতি মাত্র।

সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল জওহরলাল ও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল বামপন্থীদের শক্তিশালী ও আরও সংগ্রামী করে তুলতে পারবেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আপস করবেন না। সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকর করবেন। ইউরোপ প্রবাসকালে জওহরলালের কাছে তিনি তাঁর আশা ব্যক্ত করেছিলেন। অনুজের মতো অগ্রজতুল্য জওহরলালের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। কমলা নেহরু যখন বিদেশে মৃত্যুশয্যায় তখন সুভাষচন্দ্র জওহরলাল ও কমলার পাশে ছিলেন। ফৈজপুর কংগ্রেসে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হলে সুভাষচন্দ্র ওই অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জওহরলাল তাঁকে দেশে না ফেরার উপদেশ দিলেও সুভাষচন্দ্র তা শোনেননি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আসন্ন সঙ্কটের সময়

কংগ্রেসের কী নীতি গ্রহণ করা উচিত এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য ইতিপূর্বেই দেখা দিয়েছিল। তবুও তখনও দু'জনের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে জওহরলাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান বিরোধকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী মতপার্থক্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। নেহরুর মতে দুই বিবদমান দলের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না। প্রবীণ নেতাদের অবদান কিছু কম ছিল না। তাঁদের 'দক্ষিণপন্থী' বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। গান্ধীজি ছাড়া কোনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চিন্তা করাই সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র গান্ধীপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে নেহরুর মতো উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। নেহরুর মতো গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 'অভিন্ন হৃদয়' ছিল না। নেহরুর তা অজানা ছিল না। তাই তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন চাননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির গান্ধীপন্থী সদস্যদের বিরোধ এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক এমন দাঁড়িয়েছে যে সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের সংহতি ব্যাহত হবে। সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ এবং পরে পন্থ-প্রস্তাব গ্রহণের সময় যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তাতে জওহরলালের ভূমিকা মোটেই সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে ছিল না। বাক্যজাল সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, নেহরু সুভাষ-বিরোধীদের পক্ষেই ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এটা মেনে নেওযা সম্ভব ছিল না। তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, জওহরলাল, যাঁকে তিনি অগ্রজতুল্য সহযোদ্ধা বলে শ্রদ্ধা করেন তিনি চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর প্রতি ও বামপন্থী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যখন সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন তখন সুভাষচন্দ্র জওহরলালের ভূমিকায় মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। জওহরলাল অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠনের যে প্রস্তাব জওহরলাল করেছিলেন তাতে কার্যত পুরানো পদত্যাগী সদস্যদের প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হত। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এ শর্তে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না।

৪৪

জওহরলালের অভিযোগ ছিল যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলছেন তা ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। শরৎচন্দ্রও নাকি তাঁর তৎকালীন একান্ত সচিব নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে বলেছিলেন যে, সুভাষের এধরণের অভিযোগ করা উচিত হচ্ছে না, কেননা তিনি এগুলি প্রমাণ করতে পারবেন না। যেভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজান হয়েছিল, ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একযোগে পদত্যাগ করা হয়েছিল, অসুস্থ সভাপতির অনুরোধ সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক স্থগিত রাখা হয়নি, ত্রিপুরীতে মূল অধিবেশনের পূর্বে বিষয়-নির্বাচন কমিটিতে

পন্থ-প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল, সুভাষের 'নাটক' ও 'রাজনৈতিক অসুস্থতা' নিয়ে প্রচার চালান হয়েছিল, স্বয়ং গান্ধীজি যেভাবে সুভাষচন্দ্রের সকল অনুরোধ ও সহযোগিতাব আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারপরেও কি সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ এবং অভিযোগ অমূলক ছিল বলা যায় ? অবশ্যই সুভাষচন্দ্রের ভাষণে, বিবৃতি ও চিঠিপত্রে মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু যে তিক্ত পরিবেশ ও 'অসুস্থ আবহাওয়া' সৃষ্টি হয়েছিল, যেভাবে কংগ্রেস মহারথীরা সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরে সমবেতভাবে আক্রমণ করেছিলেন তাতে তিনি কোনও প্রত্যাঘাত করবেন না, অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন না, এ প্রত্যাশা কেমন করে সম্ভব ছিল ? কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা (Old Guard) ১৯৩৫ সালেব আইন অনুসারে নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা গঠনের ও ক্ষমতালাভের স্বাদ পেযে ক্রমেই সংগ্রামবিমুখ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আপসের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন, এই অভিযোগ ঐতিহাসিকেরাও করেছেন। ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Two Nations' গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্লান্ত বয়োবৃদ্ধ কংগ্রেস নেতারা ক্রমেই আরও দীর্ঘ লডাই করার শক্তি ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন। তাই তাঁরা আপস-আলোচনার পথই বেছে নিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত ভাবত-বিভাগও মেনে নিয়েছিলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা সহজে উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত সুভাষচন্দ্রেব মনে ওইরকমই এক আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজিকে বাদ দিয়ে দেশব্যাপী কোনও বৃহৎ আন্দোলন করা সম্ভব নয় তা সুভাষচন্দ্রও জানতেন। তাই নেতৃত্ব দেবার জন্যে তিনি বারবার গান্ধীজির কাছে আবেদন করেছিলেন। এটিকে বর্তমান কালেও কোনও কোনও ঐতিহাসিক সুভাষচন্দ্রের দুর্বলতা ও গান্ধীজির কাছে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত বলে সমালোচনা করেছেন। এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। সুভাষচন্দ্র শেষপর্যন্ত চেয়েছিলেন কংগ্রেস যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে। গান্ধীজি আবার কংগ্রেস তথা সমগ্র জাতিকে পথ দেখান এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গান্ধীজি সেই পথ গ্রহণে অসম্মত, ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সঠিক ও বাস্তবোচিত ছিল কি না তা বহু বিতর্কিত। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর পাঁচ বছরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অবদান গান্ধীজি ও জওহরলালের অবদানকেও অতিক্রম করেছিল।

কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (AICC) সভায় সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করার পর প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্রের উগ্র সমর্থকরা নেহরু, পন্থ, কৃপালনী প্রমুখ নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জওহরলাল শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। সভার পর শরৎচন্দ্র গাড়ি করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। শরৎচন্দ্র তাঁর পরিবারের সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে গৃহের সম্মানিত অতিথির প্রতি যত্ন ও শিষ্টাচারের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। রাজনৈতিক বিরোধ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যেন স্পর্শ না করে। সুভাষচন্দ্রও একাধিকবার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন কোনও বহিরাগত অতিথির যেন অমর্যাদা না হয়। প্রাদেশিকতার কোনও ছাপ যেন আচার-আচরণে না পড়ে।

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র 'সর্বাপেক্ষা মিত্রতাভাবাপন্ন' নেহরুর সঙ্গেও সুবিচার করেননি। গান্ধী-সুভাষের মধ্যে মিটমাট করে দেবার ব্যাপারে জওহরলাল তেমন কোনও চেষ্টা করেননি, এই অভিযোগ ঠিক নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। নেহরুর পরামর্শমত বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীদের বিভেদের ওপব অত জেদ না ধবে সুভাষচন্দ্রের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিযে নেওয়াই শ্রেয ছিল বলে অমলেশ ত্রিপাঠী ইঙ্গিত করেছেন। তাঁব মতে, "সবচেয়ে বড কথা, ১৭ এপ্রিল তিনি (জওহরলাল) গান্ধীকে অনুরোধ কবেছেন 'সুভাষেব অনেক দোষ আছে কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন হলে তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা লাগবে'।" জওহবলাল নিজে সুভাষচন্দ্রের 'হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা' দেবার জন্যে কতটুকু আন্তবিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন? সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্যে তিনি যে প্রস্তাব দিযেছিলেন তার প্রকৃত মূল্য বা অর্থ কী ছিল? ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেব একযোগে পদত্যাগ কবা ও পন্থ-প্রস্তাব উত্থাপন করার ব্যাপারে জওহবলাল কতটা সক্রিয ভূমিকা নিয়েছিলেন? তিনি কী ওই ধরনের সুভাষ-বিবোধী উদ্যোগেব কার্যকর বিরোধিতা করেছিলেন? ইচ্ছা থাকলেও জওহবলালেব পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কেননা তা করলে কার্যত গান্ধীজির বিবোধিতা তাঁকে করতে হত। জওহরলাল কখনই তা করতে পারেননি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রেব প্রতি তাঁব একপ্রকার স্নেহ ছিল। তাঁর দেশপ্রেম, অদম্য শক্তি ও কর্মক্ষমতার প্রতি নেহরুব শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ঘটনা প্রবাহে ও নানান বিরোধী রাজনৈতিক স্রোতের আবর্তে জওহবলাল এবং সুভাষচন্দ্র দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছেছিলেন।

অমলেশ ত্রিপাঠীব আব একটি মন্তব্য বিস্ময়কব। তিনি লিখেছেন, "নেহরু এক চিঠিতে সুন্দব কবে বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে সুভাষ বাংলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোনও প্রতীকের সঙ্গে বা ব্যাপারে যুক্তি প্রয়োগ অসম্ভব'।" এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হল জওহরলালের সুভাষচন্দ্রকে 'বাংলার প্রতীক' বলে অভিহিত কবা সঠিক ছিল এবং 'বাঙালি' সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারে ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের মানুষের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে শুধুমাত্র 'বাংলা'র নেতারূপে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই লক্ষণীয় ছিল। এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। তাঁকে সর্বভারতীয় নেতারূপে স্বীকৃত জানানোর কুণ্ঠা প্রচ্ছন্নভাবে গান্ধীজির মধ্যেও লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাতীয় প্রশ্নে ও তাঁর সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের বিরোধে প্রাদেশিক মনোভাব আনার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি ও ভারতের সর্বপ্রান্তে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল সংশয়াতীত। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি পদে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সিতারামাইয়ার বিরুদ্ধে অবাঙালি প্রতিনিধিদের ভোট কত পেয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাঙালির গর্ব নিশ্চয় ছিল। এই গর্ববোধ রবীন্দ্রনাথ অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর মানপত্রে। কবি লিখেছিলেন, "বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।

গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্যে রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।" রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রের দুর্গতির অবসানে'র জন্যে, দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্রের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশের বাঙালি নেতারূপে নয়। বাংলাদেশের প্রতি বঞ্চনা, বাংলার বিড়ম্বনার বেদনা ব্যক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে, সমগ্র দেশকে সুভাষচন্দ্র জাগিয়ে তুলবেন। "সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপরে মাথা তুলবে।" তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই...সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন।" কবি বলেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞে প্রত্যেক প্রদেশকে উপকবণ সাজিয়ে আনতে হবে। তাঁর প্রার্থনা ছিল যে সুভাষচন্দ্রের সাধনায় "বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি যোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।" দেশের দুঃখকে আপন দুঃখ করে নিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশীর্বাদ জানান এই জেনে যে, "দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।" কবির দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র শুধু বাংলার প্রতীক ছিলেন না, সমগ্র দেশ ও জাতির মুক্তির অগ্রদূত, রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের হোতা ছিলেন। এই দৃষ্টিতে গান্ধীজি, জওহরলাল ও কংগ্রেসের প্রবীণ গান্ধীপন্থী নেতারা সুভাষচন্দ্রকে দেখেননি। তাঁর জনপ্রিয়তা, চুম্বকী আকর্ষণী শক্তিকে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙালি স্বাদেশিকতা ও প্রাদেশিকতার ছাপ দিতে চেয়েছিলেন। অন্তত ওইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এর পূর্বে ২১ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতা রূপে স্বীকার করেছি মনে মনে।" সুভাষচন্দ্রকে তিনি বিশ্বভারতীর প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন কেননা মানুষের মানবত্ব সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সাধন ক্ষেত্র বিশ্বভারতীতে কেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওই পরিচয় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন তা দেখে সুভাষচন্দ্র আনন্দিত হবেন এই আশা তাঁর ছিল। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তাঁকে জনসংবর্ধনা জানানোর ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মানপত্রটি পূর্বেই রচনা করে রেখেছিলেন। পরে সেটি প্রকশিত হয়েছিল।

নেহরু-সুভাষের সম্পর্ক ও পারস্পরিক মনোভাব প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ রাখা জরুরি। এটি হল ১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্রের The Indian Struggle-এর এবং দু'বছর পরে জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীর (An Autobiography) প্রকাশ। সুভাষচন্দ্রের গ্রন্থের বহু বক্তব্য ও সমালোচনা গান্ধীজি, জওহরলাল ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বইটি ইংলন্ডে

প্রকাশিত হলেও ভারতে নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল যে বইটির প্রচার ভারতে ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী মনোভাবকে বৃদ্ধি করবে বলে আশঙ্কা ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নির্মম সমালোচনা করলেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু ব্রিটেনের সাধারণ মানুষদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি। বরং তাঁদের চরিত্রের বহু গুণের প্রশংসা করেন। ইংরাজদের প্রতি তাঁর যে কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই তা তিনি তাঁর গ্রন্থে ও অন্যান্য লেখায় ও ভাষণে একাধিকবার ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল আপসহীন। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য থেকে কোনও কারণে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত হননি।

জওহরলালের আত্মজীবনীর সুর ছিল ভিন্ন। জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন কারাগারে। কিন্তু তাঁর কারাজীবন আর সুভাষচন্দ্রের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা এক ছিল না। জওহরলালের 'আত্মজীবনী' এক অসাধারণ গ্রন্থ। এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান। জওহরলালের স্বদেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতের। পিতা মতিলাল নেহরু একদা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে "সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন" ('the greatest terrorist organisation') রূপে বর্ণনা করেছিলেন। জওহরলাল তা বিস্মৃত হননি। কিন্তু কারাগারে বসেও আত্মজীবনী লেখার সময় তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে তেমন কোনও বিরুদ্ধ ভাব অনুভব করেননি। ইংলণ্ডের হ্যারো ও কেমব্রিজে ছাত্রজীবনের প্রভাবের কথা, ইংলন্ডের কাছে তাঁর ঋণের কথা তিনি বলেছেন। ১৯৩৬ সালে জওহরলালের 'আত্মজীবনী' প্রকাশের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বি. আর. নন্দ লিখেছেন যে, বইটি ইংরাজ পাঠকদের কাছে অভূতপূর্ব সমাদর পায়। 'বেস্ট সেলার' হয়ে ওঠে। বইটি পড়ে তাঁরা শুধু নেহরু সম্পর্কে নয়, গান্ধী সম্পর্কেও এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। নেহরুর 'অবিশ্বাস্য দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ততা এবং অবিচল সততা (astonishing philosophic detachment and unflinching honesty)' বি. বি. সি-র মুখপত্র 'Listner'-এ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয়। কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা সকল ইংরাজ রাজকর্মচারীদের নেহরুর বইটি পড়ার উপদেশ দেয়। নেহরুর 'জাদু' (charm) ইংরাজদের অভিভূত করে। উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীরা নেহরুর বন্দনা করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের সর্বোচ্চ মহলে এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে নেহরুর সততা, আন্তরিকতা, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রভৃতি গুণগুলি কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেক 'ভয়ঙ্কর' ধারণা দূর করতে সহায়তা করে।

The Indian Struggle এবং An Autobiography—দুই ঐতিহাসিক পুরুষের দুই অসামান্য গ্রন্থ। দু'টির স্বাদ, রচনাশৈলী ও সাহিত্যমূল্য ভিন্ন হলেও মূল বিষয়বস্তু অভিন্ন—ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন, ব্রিটিশ শাসন, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও ঘটনার বিশ্লেষণ। দু'টি গ্রন্থ সুভাষচন্দ্রের ও জওহরলালের মধ্যে মৌলিক প্রশ্নে গভীর পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তোলে। সুভাষচন্দ্র যে ব্রিটিশ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের অনমনীয় বিরোধী তা তাঁর The Indian Struggle-এ আরও সুস্পষ্ট হয়েছিল। অন্যদিকে, কংগ্রেসে

জওহ্বলাল নেহরুর স্থান যে গান্ধীজির পরেই, তিনিই যে গান্ধীজির সবচেয়ে স্নেহ ও আস্থাভাজন এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী—এটিও ক্রমেই ফুটে উঠছিল। সুতরাং নেহরুর ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ জনগণের প্রতি এমন উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে আপস-আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়ার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল কবেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশান্বিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ইতালী ও জার্মানীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ জওহ্রলাল 'সযত্নে পরিহার করে চলেছেন' তার কারণ ফ্যাসিবাদ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁর বিরাগই শুধু নয়, জওহ্রলাল ইংলন্ড ও ফ্রান্সে তাঁর বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করতে চান না। জওহ্রলালের আত্মজীবনীর কোনও বিরূপ সমালোচনা সুভাষচন্দ্র করেননি। শুধু লেখেন, "ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন যাঁর ফলে উদারপন্থী ইংরেজ জনগণের মধ্যে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।" জওহরলাল অবশ্য সুভাষচন্দ্রের গ্রন্থ পড়ে অখুশি হয়েছিলেন এবং তা সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন।

গান্ধী-জওহরলাল-সুভাষ এই ত্রয়ীর সম্পর্ক ও তৎকালীন রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা-সঙ্কটেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানসিক এবং সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই তিনি সরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিছু মৌলিক মতাদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য থাকলেও ওই সম্পর্ক অটুট ছিল। জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র দু'জনেই কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁদের ওপরে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাগুরু, মহান পথপ্রদর্শক এবং তাঁদের পরম শুভার্থী বলে গণ্য করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার (১৯১৪) এবং বিলেত থেকে স্বদেশ ফেরার সময় জাহাজে কথাবার্তার (১৯২১) উল্লেখ পূর্বেই করেছি। মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন দিলীপকুমার সেটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন। ওই চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে লেখেন, "...সুভাষের চিঠিটিও বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করলুম।"

১৯৩০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে চিঠিপত্র ও তারবার্তার আদান-প্রদান শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ গভীর আশা ও আগ্রহের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম লক্ষ্য করতে থাকেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বন্যাত্রাণের জন্যে গঠিত কমিটি থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পদত্যাগের পরে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ওই কমিটির সভাপতি হতে সম্মত হন। হিজলী বন্দী শিবিরে গুলিচালনার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে জনসভায় সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। হিজলীর বন্দীরা তাঁদের আমরণ অনশন রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে ভঙ্গ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ প্রবাসকালে তাঁর The Indian Struggle বইটির ভূমিকা লেখাকে কেন্দ্র

কবে ববীন্দ্রনাথের ওপব সুভাষচন্দ্রের অভিমান হয়। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ববীন্দ্রনাথ যেন বার্নাড শ'কে এই বিষয়ে অনুরোধ জানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানান যে, বার্নাড শ'কে তাঁর পক্ষে অনুবোধ জানানো ঠিক হবে না। এর ফল ভাল না হবারও আশঙ্কা আছে। ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্রেব মনে হয় যে, গান্ধীজি অসন্তুষ্ট হবেন ভেবেই ববীন্দ্রনাথ শ'কে অনুরোধ জানাতে অনিচ্ছুক। সুভাষচন্দ্র তাঁর ক্ষোভেব কথা সবাসবি জানিযে লেখেন যে, রবীন্দ্রনাথকেই ভূমিকা লেখার জন্যে অনুবোধ কবাব কথা তাঁব মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বইয়ে গান্ধীজির সমালোচনা আছে। সুভাষচন্দ্রেব ধাবণা হয়েছে যে ববীন্দ্রনাথ সম্প্রতি গান্ধীজির 'অন্ধ ভক্ত' হযে পড়েছেন। সেই ভেবে তিনি আর রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকা লেখার জন্যে অনুবোধ কবেননি। সুভাষচন্দ্রেব চিঠি পেযে রবীন্দ্রনাথ দুঃখবোধ করেন। তিনি উত্তবে লেখেন, "এই উপলক্ষে একটি কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভাবতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আবেক যুগে নিযে যেতে পেবেছেন...মনের দিকে, কল্পনার দিকে, ব্যবহারের দিকে, তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণীব জীব। কোনও কোনও বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন—কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকবে। আমরা কেউ সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিইনি।" এরপব রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সুভাষচন্দ্রের আর কোনও দিন ভুল হয়নি। সব বিরোধ-বিতর্ক ঘাত-প্রতিঘাতের পরেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যাযনেব সঙ্গে সুভাষচন্দ্রেব গান্ধী-মূল্যায়নেব খুব পার্থক্য ছিল না।

১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিযেছিলেন। তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে ববীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হযেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী-সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিব জন্যে আন্দোলন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে তা সমর্থন করেন। সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানান। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রকে পুনর্নির্বাচিত করা হোক তা রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেয়েছিলেন। এই অনুরোধ জানিয়ে গান্ধীজি ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই অনুরোধে কাজ হয়নি। ওই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে লেখেন (১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৯) যে, তিনি ইতিপূর্বেই ওই বিষয়ে মহাত্মাজী ও জওহরলালকে লিখেছেন। কিন্তু "আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভূত মানুষ...সুতরাং অব্যবসায়ীর ইচ্ছা জ্ঞাপনের বেশি আর কিছু করার অধিকার আমার নেই।" ২১ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে অভিনন্দন জানানো হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের নাগরিক সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাব করে ও উদ্যোগ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ওই সভায় যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু সুভাষের জন্যে মানপত্রটি তিনি রচনা করে রেখেছিলেন। কেন তিনি শেষ পর্যন্ত আসেননি এবং কেন ওই মানপত্র তখনি প্রকাশিত হয়নি এই নিয়ে অনেক গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। একটি ধারণা জন্মেছিল যে, সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে ও গান্ধীজি এবং জওহরলালকে জড়িয়ে এমন প্রবল রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল, পরিবেশ এত তিক্ত হয়ে পড়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে

করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরীর সঙ্কটের চরম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যেই সুভাষচন্দ্রকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন মধ্যস্থতা করার। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করে, গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্যা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও সুফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথও ব্যর্থ হন বিরোধ মেটাতে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘটনা, সুভাষ-বিরোধী সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, পন্থ-প্রস্তাব ও সুভাষচন্দ্রকে অপদস্থ ও কোনঠাসা করার নিন্দনীয় কার্যকলাপে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহিত হয়েছিলেন। ১৯ মার্চ গান্ধীজিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানান, "অনুগ্রহ করে আর বিলম্ব না করে এই আঘাত প্রশমনের জন্যে আপনার কারুণ্যের হস্তপ্রয়োগ করুন যাতে আঘাত ক্ষতে পরিণত না হয়।" গান্ধীজি তাঁর 'গুরুদেব'-এর আবেদনের পরেও করুণার হাত প্রসারিত করেননি।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ হতোদ্যম হননি। গান্ধী-সুভাষ বিরোধের বিয়োগান্ত পরিণতি নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পূর্বে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে চার ঘণ্টা ধরে গান্ধী-সুভাষ বৈঠক হয়। তাতেও ফল হয়নি। ২৯ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করার পর অধিবেশনের ভিতরে ও বাইরে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র নিজে জনতাকে সংযত করে নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাঁদের গাড়িতে তুলে দেবার পর নিজে বাড়ি ফেবেন। সুভাষচন্দ্রের সেদিনের আচরণ, দৃঢ়তা ও যেভাবে চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তিনি নিয়ন্ত্রণ কবেছিলেন তার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন, "অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছ তাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণ ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ; তা হলেই আপাতদৃষ্টিতে যা তোমার পরাজয় বলে মনে হচ্ছে তাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদ, আশা এবং আস্থা সুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল।

৪৫

কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগের পর সুভাষচন্দ্র উদ্যোগ নিলেন সব বামপন্থী দল ও বাম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই একটি দল গঠন করতে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক (৩ মে, ১৯৩৯)। সুভাষচন্দ্র হলেন সভাপতি। সহ-সভাপতি শার্দূল সিং কবিশের ও লালা শঙ্কর লাল। সাধারণ সম্পাদক হলেন পণ্ডিত বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠী, কে. এফ. নরিম্যান ও সত্যরঞ্জন বক্সী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অন্নপূর্ণাইয়া, সেনাপতি বাপাত, এইচ. ভি. কামাথ প্রমুখ। লক্ষণীয় ছিল যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষে শুধু বাঙালিরা ছিলেন না। নতুন দল

বাংলার ও বাঙালির দল ছিল না। সুভাষচন্দ্রের ও ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনে সর্বভারতীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছিল। বাংলার অভিমান বা বাঙালি গর্বের প্রতীক ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল না। নতুন দল গঠনের পিছনে সুভাষচন্দ্রের দু'টি প্রধান প্রত্যাশা ছিল। গান্ধীবাদীদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মতবিরোধ ও সংঘাত দেখা দিলে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগ্রাম কার্যকর হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে কোনও বড় সঙ্কটকালে 'গান্ধী-দল' যদি সময়োপযোগী তৎপরতা দেখাতে না পারে তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সক্ষম হবে। বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে (২১ জুন, ১৯৩৯) তিনি তাঁর দলের তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন : (১) বামপন্থীদের সংহতি সাধন, (২) বামপন্থী সংহতির মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রকৃত ঐক্যসৃষ্টি এবং (৩) কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত এবং অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পূর্ণ স্বরাজের জন্যে আন্দোলন শুরু করা। ফরওয়ার্ড ব্লকে শুধুমাত্র কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যরাই যোগ দিতে পারবে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের বর্তমান সংবিধান এবং কর্মসূচী অপরিবর্তিতভাবে মেনে নেবে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে 'সাংবিধানিকতা' এবং 'সংস্কারবাদ'-এর প্রতি যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা দূর করে জনগণের মধ্যে এক বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্যে ফরওয়ার্ড ব্লক সচেষ্ট হবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে সংগ্রাম শুরু করা এবং ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা।

সকল বামপন্থী দলের পক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করা সম্ভব হবে না জেনে ২১ জুন তিনি একটি বামপন্থী সংহতি কমিটি (Left Co-ordination Committee) গঠন করেন। কমিটির আহ্বায়ক হন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ইউসুফ মেহের আলি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. সি. যোশী, ভরদ্বাজ ও সোমনাথ লাহিড়ী, কিষাণ সভার স্বামী সহজানন্দ ও এন. জি. রঙ্গ, মানবেন্দ্রনাথ রায়গোষ্ঠীর মানবেন্দ্রনাথ ও কার্নিক, ফরওয়ার্ড ব্লকের সত্যরঞ্জন বক্সী ও বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠী প্রমুখ এই সমন্বয় কমিটির সদস্য হন। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয় (৫ আগস্ট, ১৯৩৯)। এই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ ও শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়। সুধী প্রধান ওই সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সোমনাথ লাহিড়ী ও পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি সহযোগিতা করতেন। তাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ওই সময়ে কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। একক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব কোনও শক্তিশালী সংগঠন ও গণ-সমর্থন না থাকায় ওই সময়ে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, বিশেষ করে হিটলারের আক্রমণের পর, সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করলে কমিউনিস্টদের নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উগ্র সুভাষ-বিরোধীতে পরিণত হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কুৎসা রটনা করতে কমিউনিস্টরা বাকি রাখেননি। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য ও অন্ধভক্তি কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধিকে লুপ্ত করে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশা

বাস্তবধর্মী ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণও নির্ভুল ছিল না। তিনি আশা করেছিলেন গান্ধীপন্থীদের পরিচালিত কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি গ্রহণ করবে। বামপন্থীদের সমর্থন ও সংহতির ওপর তিনি খুব ভরসা করেছিলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ওপর তাঁর বেশি নির্ভরতা ছিল। কিন্তু ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতাব পর তাঁর এরকম আশা পোষণ করার কোনও কারণ ছিল না। জয়প্রকাশ নারায়ণ যতই সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হন না কেন, তিনি যে একটি নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে গান্ধী-বিরোধিতা করবেন না, সুভাষচন্দ্রের প্রতি যতই শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা থাকুক না কেন গান্ধীজির নেতৃত্ববিহীন কোনও জাতীয় আন্দোলন শুরু করা যে অসম্ভব এ বিষয়ে তিনি স্থিব নিশ্চিত ছিলেন, এটা সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধি না কবার কোনও কাবণ ছিল না। অন্যান্য বামপন্থী দল ও বামপন্থী মনোভাবাপন্নরা কতটা দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন তা তিনি জানতেন। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীপন্থীদেব নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কতখানি তার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। গান্ধীজির যতই সমালোচনা হোক না কেন, তাঁব নেতৃত্বের দুর্বল দিকগুলি সম্বন্ধে অসন্তোষ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তাঁর কোনও বিকল্প ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে যে অচিন্তনীয় ছিল তাও উপলব্ধি করা কঠিন ছিল না। সর্বোপরি তিনি আশা করেছিলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল বিশেব দশকে যেভাবে কংগ্রেসেব মধ্যে কার্যকর ও সফল হয়েছিল তা ফবওয়ার্ড ব্লকের পক্ষেও সম্ভব হবে। কিন্তু ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে পরিস্থিতির ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পবিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। গান্ধীজি ও দেশবন্ধুর মতপার্থক্য এবং বিরোধের সঙ্গে গান্ধীজি ও তাঁর মতভেদ ও বিরোধের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। গান্ধী-দেশবন্ধু-মতিলাল আর গান্ধী-নেহরু-সুভাষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনোভাবের স্তর ছিল প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন। এ ছাড়া, ছিলেন গান্ধীভক্ত দক্ষিণপন্থী নেতারা। 'রাজার থেকে পার্ষদদে'র সহনশীলতার অভাব এবং উগ্রতা ছিল অনেক বেশি। যাঁরা তাঁর পুনর্নির্বাচনের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁকে নিষ্ক্রিয় সভাপতি করে শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন, রাজনৈতিকভাবে তাঁকে শেষ করতে চেয়েছিলেন এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনও শর্তেই মিটমাট চাননি, তাঁরাই তাঁকে ও তাঁর দলকে কংগ্রেসের ভিতরে কাজ করতে দেবেন, কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তিত করতে দেবেন, এরকম আশা সুভাষচন্দ্রের মনে এসেছিল এটাই বিস্ময়কর।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভুলের কয়েকটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রথমত, ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতার পরেও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের আশা তিনি ত্যাগ করেননি। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের জরুরি প্রয়োজন তাঁর মনে সর্বাগ্রে ছিল। তিনি আশা করেছিলেন সভাপতি পদে ইস্তফা দেবার পর গান্ধীপন্থীরা অতীতকে পিছনে ফেলে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। দ্বিতীয়ত, নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, পদত্যাগের পর তাঁর প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর অসুখের সময় দূর দূরান্তর থেকে সাধারণ মানুষ যেভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, পরম আত্মীয়ের মতো তাঁর আরোগ্য কামনার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল তা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের পর কয়েকমাস তিনি সারা ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। প্রায় এক হাজার সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সর্বত্র বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। প্রতিটি সভায় বিশাল

জনসমাবেশ হয়েছিল। এর ফলে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি যদি গান্ধীজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁকে অমান্য করে কোনও কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং আন্দোলন শুরু করেন তাহলে জনসমর্থন তাঁর পক্ষেই থাকবে। তৃতীয়ত, মনে হয়েছিল জনগণের ওপর ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে, দলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের কয়েক মাস পরে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গান্ধীজির ওই মন্তব্য তাঁর বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও আশাবাদী হয়ে ওঠেন। গান্ধীজির সঙ্গে যতই মতপার্থক্য ও বিরোধ হয়ে থাকুক না কেন গান্ধীজির কথা ও মন্তব্যের গুরুত্ব তাঁর কাছে হ্রাস পায়নি। ১৯৪০ সালের জুন মাসেও (যার অনেক পূর্বেই তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন) তিনি গান্ধীজি ও তাঁর প্রধান প্রধান সহচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন' শুরু করার জন্যে 'আবেগপূর্ণ' আবেদন করেন। তাতে কোনও সাড়া পাননি। গান্ধীজি 'দীর্ঘ ও সৌহার্দপূর্ণ' (সম্পূর্ণ নিষ্ফল) আলোচনার শেষে বলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে তাঁর (গান্ধীজির) অভিনন্দন বার্তাটি তিনি প্রথম লাভ করবেন। গান্ধীজির এই মন্তব্যে সুভাষচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে অবিলম্বে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করতে সুভাষচন্দ্র জিন্নার কাছে প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগ তখন 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করেছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করার জন্যে এতই উদগ্রীব ছিলেন যে, তিনি এমন প্রস্তাবও করেছিলেন যে ওই রকম সংগ্রাম হলে জিন্নাই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন। জিন্না ওই প্রস্তাবও গ্রাহ্য করেননি। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র অধীর হয়ে উঠেছিলেন আর এতটুকু কালক্ষেপ না করে ওই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে মরণ সংগ্রাম শুরু করতে। উদগ্র ও অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন রূপায়িত করার জন্যে সুভাষচন্দ্রের প্রবল বাসনার আবেগের গভীরতা এবং তীব্রতা উপলব্ধি না করলে তাঁর তৎকালীন রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার বিচার করা সম্ভব নয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতা গান্ধীজি ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের একেবারেই পছন্দ হয়নি। তাঁরা ক্রমেই উদ্বিগ্ন ও রুষ্ট হচ্ছিলেন এবং প্রত্যাঘাতের চিন্তা করছিলেন। বোম্বাইয়ে জুন মাসের (১৯৩৯) শেষে AICC-র অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মতি ছাড়া কোনও প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীরা কোনও সত্যাগ্রহে অংশ নিতে পারবে না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্মের কোনও প্রকাশ্য সমালোচনাও নিষিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকরা। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৯ জুলাই সারা দেশে বিক্ষোভ জানাবে স্থির করে। কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সতর্ক করে ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি

সুভাষচন্দ্রকে এক বার্তায় (৬ জুলাই, ১৯৩৯) জানান যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর কর্তব্য হল দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই হুমকিতে সুভাষচন্দ্র অবিচল থাকলেও অনেকেই বামপন্থী সমন্বয় কমিটি থেকে সরে যান। প্রদেশ কংগ্রেসেও যাঁরা তাঁর সমর্থক ছিলেন তাঁদের অনেকেও শেষপর্যন্ত তাঁর পাশে থাকেননি। যেমন, অতুল্য ঘোষ হাওড়ার কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে জানান (৯ জুন, ১৯৩৯), "আমি ঘোষণা করিতেছি যে বর্তমানে বাংলা দেশে সুভাষবাবুর কাজকর্ম সমর্থন না করা অন্যায় এবং আমি সর্বান্তকরণে সুভাষবাবুর কাজকর্ম সমর্থন করিতেছি এবং করিয়া থাকি।" কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তা করেননি।

১৬ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি কার্যত সুভাষচন্দ্রকে 'Show Cause' নোটিশ জারি করেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপন করে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনার কথা জানান। উত্তরে সুভাষচন্দ্র লেখেন (৭ আগস্ট) যে, বাক্-স্বাধীনতার জন্যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, কিন্তু বাক্-স্বাধীনতা কী শুধু কংগ্রেসের বাইরে প্রয়োগ করা হবে, ভেতরে নয়? তিনি স্মরণ করিয়ে দেন গান্ধীজি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে সংখ্যালঘুদের বিদ্রোহের অধিকার স্বীকার করেছিলেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের কাজকর্ম বিদ্রোহের পর্যায়ে যায়নি। তাঁরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠদেব গৃহীত প্রস্তাবের সমালোচনা করেছেন মাত্র। তিনি জানিয়ে দেন ৯ জুলাই-এর ঘটনার জন্যে যদি কোনও কংগ্রেসকর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও যেন অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরিশেষে তিনি লেখেন, "যদি ৯ জুলাই সর্বভারতীয় দিবসরূপে উদ্‌যাপন করা অপরাধ হয় তাহলে আমি স্বীকার করি যে আমি চরম অপরাধী।" সুভাষচন্দ্রের ওই উক্তি একদিন তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে কথা বলেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি।

কংগ্রেস 'হাইকম্যান্ড' তাঁদের মনস্থির পূর্বেই করেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে বাংলা প্রদেশ কমিটির সভাপতি পদ থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে এবং আগামী তিন বছর তিনি কংগ্রেসের কোনও কমিটিতে নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিছু পরে তিনি কংগ্রেস থেকেই বহিষ্কৃত হন। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। বাংলা কংগ্রেসে চরম প্রতিক্রিয়া ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়নি। যাঁরা দীর্ঘকাল সুভাষপন্থী ও তাঁর নিকট বন্ধু বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদেরও অনেকে 'দলত্যাগ' করে গান্ধীপন্থী হয়ে যান। বাম সংহতিতে ভাঙন ধরে। অক্টোবরে কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা ও পরের মাসে কমিউনিস্টরা বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেন।

সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি ওই উদ্যোগের মধ্যে 'শক্তিস্পর্ধা'র প্রভাব ও 'শক্তিপ্রিয়তা'র লক্ষণ দেখেছিলেন। জওহরলালও যেন ওই স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। পরম স্নেহভাজন জওহরলালের এই প্রবণতা দেখে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লেখেন, "আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত মদমত্ততার সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি?"

সুভাষচন্দ্রকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে কবি কতখানি মনোবেদনা বোধ করেছিলেন ও গান্ধীজিকে এরকম যেন না ঘটে তার জন্যে সানুনয় অনুরোধ করেছিলেন এই প্রসঙ্গটির সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমর গুহের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র' বইটিতে আছে। গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে এক বার্তায় তিনি জাতীয় ঐক্যের বিশেষ স্বার্থে বহিষ্কার-আদেশ তুলে নেবার অনুরোধ জানান। দু'দিনের মধ্যেই গান্ধীজি উত্তরে জানালেন ওই আদেশ তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি তা করতে হয় তাহলে কবি যেন সুভাষচন্দ্রকে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেন। গান্ধীজি কতখানি সুভাষচন্দ্রের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন আরও কিছুদিন পরে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে না জানিয়েই তাঁর ঘনিষ্ঠবন্ধু ও সহকর্মী দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ গান্ধীজিকে চিঠি দিয়েছিলেন ওই একই অনুরোধ করে। এর উত্তরে গান্ধীজি লিখলেন (১৫ জানুয়ারি, ১৯৪০), "...সুভাষ পরিবারের 'আদুরে ছেলের' মতো আচরণ করছে। ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করার একমাত্র উপায় হল ওর চোখ খুলে দেওয়া...আমি সুনিশ্চিত যে বিষয়টির মীমাংসা করা গুরুদেবের পক্ষে অত্যন্ত জটিল। তিনি এ কথা বিশ্বাস করুন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কিছু নেই। আমার কাছে সে পুত্রেব মতো।" ("I feel Subhas is behaving like a spoilt child of a family The only way to make up with him is to open his eyes.. I am quite clear the matter is too complicated for Gurudev to handle.")

সহজ কথায়, গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিলেন ওই ব্যাপরে তিনি যেন মাথা না ঘামান। সুভাষচন্দ্রকে উপযুক্ত "শিক্ষা" দিতেই হবে। কবির পক্ষে জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এটি তাঁর বিষয়ও নয়। গান্ধীজির কাছে থেকে এরকম রূঢ় চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের কী মনে হয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। গান্ধীজিকে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর অন্তহীন স্নেহ ছিল। সুভাষের মধ্যে তিনি আগামী দিনের এক মহান নেতাকে দেখেছিলেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই তিনি তাঁর 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন (মাঘ, ১৩৪৫)। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, "কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে তিনি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত 'কংগ্রেস ভবন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই এই ভবনের নামকরণ করেছিলেন 'মহাজাতি সদন'। অনুষ্ঠানে কবিকে ভিত্তি স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেন (১৯ আগস্ট ১৯৩৯) যে, ওই ভবন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা সর্বপ্রকার ত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তাঁদের "আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও আদর্শের এক বাহ্য প্রতীকস্বরূপ হবে।" পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক সঙ্কটের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না...বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার— স্বাধীনতা—হেলায় ছেড়ে দেবে না।" রবীন্দ্রনাথের ভাবণে ছিল বাংলার নবজাগরণের কথা যা একদিন জীবনের

সর্বক্ষেত্র আলোকিত করে রাষ্ট্রমুক্তি সাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল করে তুলেছিল বাংলাকে। আত্মগৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক 'অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক' এই কামনা তিনি করেছিলেন। "বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে", এই প্রার্থনা তিনি জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের ঘনীভূত ছায়া কবির মনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল তার ইঙ্গিত ছিল ওই ভাষণে।

১৯৩৯ সালেব ৩ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানের মাঝখানেই সুভাষচন্দ্র ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এই সংবাদটি পান। তখনই তাঁর মনে হল যে, "সেই বহু প্রতীক্ষিত সঙ্কট সমাগত— ভারতের এই সুবর্ণ সুযোগ।" কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটেনের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের এই বিপদের সময় ভারতের উচিত তার সঙ্গে সহায়তা করা। তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজি লিখলেন, "সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাঁর সহানুভূতি ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দিকে।" জওহরলালও যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে ছিলেন না, কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম। যুদ্ধ সম্পর্কে মনোভাব কী হওয়া উচিত তা স্থির করার জন্যে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভা বসে। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেও বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ওই সভায় যোগ দেন। এর কারণ, গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতারা সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও জনগণের ওপর তাঁর বিপুল প্রভাবের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যাশিতভাবে সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম পুনরায় পূর্ণোদ্যমে শুরু করার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব পুরোপুরি গৃহীত না হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে যে (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ব্রিটিশ সরকারকে ভারতকে এক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করতে হবে এবং এখনই, যতদূর সম্ভব, ওই মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্রিটেনকে গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধোত্তর নীতি সম্পর্কে তার লক্ষ্য ঘোষণা করতে হবে। তবেই কংগ্রেস সহযোগিতা করবে। সুভাষচন্দ্র এই নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় ঘটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পরই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া সম্ভব। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রস্তাবে কার্যত কর্ণপাত করেনি। ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) স্থগিত রেখে সমস্ত ক্ষমতা বড়লাটের হাতে কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে জনসভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিনা বিচারে আটক ও বাক্-স্বাধীনতা হ্রাস ইত্যাদি দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ভারতীয়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য না দিয়েই, কোনও বক্তব্য না শুনেই ভারতকে যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করা হয়। এর প্রতিবাদে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। কিন্তু তা ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি পরিবর্তন করতে কার্যকর হয়নি। কংগ্রেসের নীতি সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ হতাশ করে।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে প্রচার ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা শুরু করে। অক্টোবর মাসে নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র 'জনগণের হাতে ক্ষমতা চাই' (All powers to the Indian people) ডাক দেন। ওই সময় তিনি চীন পরিদর্শনের জন্যে অনুমতির আবেদন করলে ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ অসম্মতি জানায়। জাপানের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে চীনের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে ১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেস সভাপতিরূপে একটি 'মেডিকেল মিশন' পাঠাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ অটল (নেতা), ডাঃ এন. কোটনিশ, ডাঃ এম বি. চোলকার, ডাঃ দেবেশ মুখার্জী ও ডাঃ বি. কে. বসু। এঁদের মধ্যে ডাঃ কোটনিশের নাম চীনে তাঁর অক্লান্ত সেবা ও শেষপর্যন্ত সেবাকার্যেই মৃত্যুর জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আজাদ। প্রায় একই সময় রামগড়ে, কংগ্রেস অধিবেশনের কাছেই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার যৌথ উদ্যোগে 'নিখিল ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলন' (Anti-Compromise Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনওরকম সহযোগিতা ও সাহায্য না করার জন্যে জনগণকে বোঝাতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করা হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে কোনওমতেই ভারতবর্ষের সম্পদকে ব্যবহার করার বিরোধিতা করতে হবে। এই সিদ্ধান্তমত এপ্রিল মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশব্যাপী যুদ্ধ-বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু করে। পক্ষান্তরে রামগড় কংগ্রেসে স্বাধীনতার দাবি পুনরায় করা হলেও কোনও গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের তুলনায় 'আপস-বিরোধী সম্মেলন' অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। বহু কংগ্রেসকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সেখানে যে শোভাযাত্রা হয়েছিল সেটা কংগ্রেসের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। যার ফলে চিরাচরিত প্রথা পরিহার করে আদি কংগ্রেসের সভাপতির শোভাযাত্রা বাহির করাই হল না।

সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের জনপ্রিয়তা ও কংগ্রেস নীতিবিরোধী কার্যকলাপে জওহরলাল খুবই ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। তিনি ভি. কে. কৃষ্ণ মেননকে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়ে লেখেন (২ মার্চ, ১৯৪০), "সুভাষ বোস এখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছেন এবং সুনিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন...সুভাষ বোসের মাথায় কোনও ধারণা আছে বলে মনে হয় না। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে বক্তৃতার বাইরে তিনি যা কিছু বলছেন তা বোধগম্য নয়।" আসলে, জওহরলালের বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তাঁর কাছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়েও নাৎসী ও ফ্যাসিদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির জয় সুনিশ্চিত করা অনেক জরুরি মনে হয়েছিল। ব্রিটেনকে তিনি গণতান্ত্রিক শক্তি এবং শাসনের প্রতীক মনে করতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন ও তার জন্যে

সংগ্রাম তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসমূলক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর সুভাষ-বিরোধিতা, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কঠোর সমালোচনার মূলে ছিল ওই একদেশদর্শী মনোভাব। এর ফলে তিনি সুভাষচন্দ্রের গভীর উৎসমূলে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে জওহরলাল পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেন এবং প্রকাশ্যে তাঁব নতুন উপলব্ধি ব্যক্ত করেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অতুলনীয় সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস জানার পর। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে তিনি নতুন আলোকে দেখেন। কিছুটা কৈফিয়ৎ দেবার সুরে তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসবে বলেছিলেন (২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৬), কেউ কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন, সুভাষচন্দ্র যখন দেশে ছিলেন তখন তিনি তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, এখন তাঁর প্রশংসা করছেন কেন ? নেহরু বলেন তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিরোধ হলেও তাঁর কখনও সন্দেহ হয়নি যে, সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামেব এক বীর সৈনিক। এক সুস্থ জাতির মধ্যে মতপার্থক্য থাকবেই এবং সেটাই কাম্য। "যে জাতি মেষের মতো আচবণ কবে তারা কোনও উন্নতি করতে পারে না (A people who behave like sheep cannot make any progress)।" তিনি বলেন যে বর্তমানে I.N.A.-র সমর্থনে যে জন-আবেগ দেখা দিয়েছে তার দ্বাবা তিনি তাড়িত নন। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস জানার পর তিনি তাঁর অভিমত স্থির করেছেন। আজও তিনি বলতে পারেন না ওই পরিস্থিতিতে তিনি নিজে কী করতেন। তবে এটা নিশ্চিত, যেভাবে নেতাজি ওই সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। নেতাজির অবস্থায় পড়লে তিনিও (জওহরলাল) হয়তো একই অবস্থান নিতেন। তবে তিনি পূর্বেও বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন যে, অন্য দেশের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা বিপজ্জনক। কিন্তু তারই সঙ্গে জওহরলাল স্বীকার করেন যে, I.N.A-র কাহিনী যা I N.A.-র তিন অফিসারের বিচারের সময় উদ্ঘাটিত হয়েছে, প্রমাণ করেছে যে, সুভাষচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে জাপানীদের কর্তৃত্ব স্থাপনের সব চেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীন সত্তা রক্ষা করেছিলেন। জাপানীরা কখনও তাঁকে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত কাজ করাতে পারেনি। তাঁর আর এক বড় কৃতিত্ব ছিল যে, পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য তাঁর বাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রামগড় অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করলেও ইউরোপের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্য ও মিত্রবাহিনীর বিপর্যয় যুদ্ধ সম্বন্ধে গান্ধীজি ও নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে ভারতবাসী নাৎসি বাহিনীর বিজয় কামনা করে না। গান্ধীজি বলেন, "ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে আমরা স্বাধীনতা চাই না (We do not seek independence out of Britain's ruin.)।" জওহরলাল ঘোষণা করেন যে, "ভারতবর্ষ নাৎসীবাদের জয়ের চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী (India is completely opposed to the idea of the triumph of

Nazism.)।" কংগ্রেস পূর্ব-ঘোষিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সংশোধন করে প্রস্তাব করে যে, যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার (Provisional National Government) গঠন করতে সম্মত হয় তাহলে কংগ্রেস ব্রিটেনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো একটি বিবৃতিতে (৮ আগস্ট, ১৯৪০) ওই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি খোলাখুলি জানান যে, এখন ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। তিনি এইটুকু শুধু আশ্বাস দেন যে, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতবর্ষের এক নতুন সংবিধান রচনার জন্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব (August Offer রূপে পরিচিত) ছিল অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন। গান্ধীজি ও জওহরলাল ভাইসরয়ের প্রস্তাবে হতাশ হন। নেহরু মন্তব্য করেন ওই প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদের পুরানো ভাষায় (Old language of imperialism) লেখা মাত্র। বক্তব্যও একই। তবুও কোনও সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা গান্ধীজি চিন্তা করতে পারেননি। সাংগঠনিক ও মানসিক প্রস্তুতি জনগণের আছে বলে তিনি মনে করেননি। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অক্টোবর মাসে কংগ্রেস 'ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন' (Individual Civil Disobedience) শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সত্যাগ্রহের জন্যে গান্ধীজি যাঁদের নির্বাচিত করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন জওহরলাল ও আচার্য বিনোবা ভাবে। আদর্শগতভাবে এই প্রকার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রশংসনীয় হলেও এর কোনও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল বা। তবুও ওই প্রতীকী সত্যাগ্রহ অন্তত আংশিকভাবে সুভাষচন্দ্রের নৈতিক জয় ছিল। কেননা, আন্দোলন করা ছাড়া ভারতবর্ষের মুক্তি লাভের অন্য কোনও পথ নেই তা স্বীকৃত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে কংগ্রেসের মতো এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্যাদাটুকু দিতেও আগ্রহী ছিল না তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর ভারত আগমন ও তাঁর প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার ব্যার্থতার (মার্চ, ১৯৪২) ফলে এই উপলব্ধি হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে শেষপর্যন্ত গান্ধীজিকে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য করেছিল।

রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলনের পর এপ্রিল মাসে (৬-১৩ এপ্রিল) সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। জুন মাসে নাগপুরে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে অবিলম্বে এক অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি করা হয়। জুলাই মাসের সূচনায় কলকাতায় অন্য একটি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্র নিয়েছিলেন। সেটি হল ডালহৌসি স্কোয়ারে (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ) তথাকথিত "অন্ধকূপ হত্যা"র হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভটির অপসারণ। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলা। আন্দোলন শুরু করার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে সুভাষচন্দ্রকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে (২ জুলাই, ১৯৪০) অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্দী করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পরেও, সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে দেখা ও আলাপ আলোচনা করে, চিঠিপত্র ও বার্তা পাঠিয়ে বারবার গান্ধীজিকে সনির্বন্ধ

অনুরোধ করেছিলেন, আবেদন জানিয়েছিলেন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। গান্ধীজি সম্মত হননি। তাঁর সম্মতি-অসম্মতির ওপর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল পুরোপুরি নির্ভরশীল। ১৯৪০-এর শেষ দিকে গান্ধীজি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে আবাব অনুরোধ জানান কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক একযোগে আইন অমান্য আন্দোলন করুক। উত্তরে গান্ধীজি লেখেন (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০), "অসুস্থই থাকো আর সুস্থই থাকো তুমি অপ্রতিরোধ্য। তীব্র সংগ্রাম আরম্ভ করবার পূর্বে সুস্থ হয়ে ওঠো।" আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সহযোগিতার প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, "তোমার ব্লকের আইন অমান্যে যোগদান প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে তোমার আমার মধ্যে মৌলিক মতভেদ থাকায় তা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের মত গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমাদের ভিন্ন ভিন্ন নৌকাতেই চলতে হবে। যদিও নৌকা দু'টির লক্ষ্য এক বলে মনে হয়, কিন্তু শুধু মনেই হয়। ইত্যবসরে এসো আমরা একই পরিবারের সদস্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ থাকি।" গান্ধীজির চিঠির আন্তরিকতার সুরে সুভাষচন্দ্র আনন্দিত হয়েছিলেন। এ চিঠি পরিবারের 'আদুরে ছেলে'কে গৃহকর্তার চিঠি ছিল না। অবাধ্য পুত্রকে শাস্তি দিয়ে সুশৃঙ্খল করার মনোভাবও ছিল না। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধীজির মনে যে নতুন ভাবনা-চিন্তার সূচনা হচ্ছিল এই চিঠিতে তারই ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু নিজের মত ও বিশ্বাসে গান্ধীজি অনড় ছিলেন। সুভাষচন্দ্র প্রত্যুত্তরে (১০ জানুয়ারি, ১৯৪১) গান্ধীজিকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করার জন্যে অনুরোধ জানান। তিনি গান্ধীজিকে বলেন যে দু'জনের লক্ষ্য ভিন্ন, এই কথাটির বক্তব্য তাঁর বোধগম্য হয়নি। তা কী করে হয়? সুভাষচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল, দু'টি নৌকা ভিন্ন হতে পারে (অর্থাৎ মত ও পথ) কিন্তু গন্তব্য স্থল তো অভিন্ন— ব্রিটিশ শাসনের অবলুপ্তি ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। এই চিঠির উত্তর আর আসেনি। ছ' দিন পরেই (১৬ জানুয়ারি) সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ ঘটে।

একটি প্রশ্ন মনে জাগে যার উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া অসম্ভব। ১৯৪০ সালেও যদি গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতেন এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে কি সুভাষচন্দ্র তাঁর দেশত্যাগের পরিকল্পনা পুনর্বিচার করে ওই আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন? যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ১৯৪২-এ শুরু হয়েছিল তা যদি দু' বছর পূর্বে শুরু হত তাহলে কি সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সংগ্রাম অন্য রূপ নিত? গান্ধীজি ওই আন্দোলন শুরু করলে তার পূর্বে বা পরে, সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হতেনই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ও বিপজ্জনক শত্রুকে কোনওমতেই কারাগারের বাইরে রাখতে সাহস করতো না। কারাগারের অন্তরাল থেকে সুভাষচন্দ্র কি স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ বৃথা যাওয়া লক্ষ্য করা মেনে নিতেন? তিনি নিজেই লিখেছেন যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "যখন অন্যত্র ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে তখন জেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল হবে।"

অনির্দিষ্টকালের জন্যে সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। বন্দী হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি জার্মানী, জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে পথ রুদ্ধ হল। বহু চিন্তা-ভাবনার

পর তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল : যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে ; বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও ব্রিটেন ভারতবাসীদের ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ভারতকে সংগ্রাম করতে হবে ; ভারত যদি যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকা নেয় এবং ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের (Axis Powers) সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে ভারত স্বাধীন হবে। সুভাষচন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল বহুল প্রচলিত একটি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্বাস। প্রত্যেক দেশের বৈদেশিক নীতি জাতীয় স্বার্থের (national self-interest) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও বিরোধের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের মূল সূত্র হল 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' (Enemy's enemy is my friend) এবং 'রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা স্থায়ী মিত্র বলে কেউ নেই' (In politics there is no permanent friend or permanent enemy.)। সুভাষচন্দ্রের কাছে ভারতবর্ষের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল একমাত্র বিবেচ্য। অন্য কোনও ফেনময়, শূন্যগর্ভ, দার্শনিকসুলভ মনোভাব ও বাগাড়ম্বর ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশের পক্ষে অর্থহীন। জওহরলালের আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সম্পর্ক সম্বন্ধে মনোভাবের এটিই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রধান সমালোচনা।

জেল থেকে মুক্ত হতে বদ্ধপরিকর সুভাষচন্দ্র তাঁকে বিনাবিচারে অন্যায়ভাবে জেলে রাখার প্রতিবাদে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে তিনি লেখেন (৩০ অক্টোবর, ১৯৪০) যে, দীর্ঘ চিন্তার পর তাঁর প্রত্যয় হয়েছে "...বর্তমান অবস্থায় (তাঁর) বেঁচে থাকা অর্থহীন। এই মরজগতে নীতি ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই নীতিগুলি একমাত্র তখনি বাঁচতে পারে যখন ব্যক্তিমানুষ সেগুলির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না।" নভেম্বর মাসে কালী পুজোর দিন তিনি আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। সরকারকে সতর্ক করে দেন তাঁকে যেন বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার চেষ্টা না করা হয়। যদি তা করা হয় তাহলে তিনি জীবন বর্জন করতে পারেন। তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। সুভাষচন্দ্রের চিঠিতে বাংলার সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং স্থির করে যে এখন তাঁকে মুক্তি দেওয়াই সমীচীন হবে। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে কিছুদিন পরে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে। ৫ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র মুক্ত হন। ভারত সরকার বাংলা সরকারের এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

মুক্তির পর প্রায় চল্লিশ দিন বাড়িতে নিজের ঘরেই সুভাষচন্দ্র নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। গভীর ভাবে গোপনে দেশের বাইরে থাকার সব রকম সম্ভাব্য উপায় তিনি বিচার-বিবেচনা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত মনস্থির করেন যে নিঃসঙ্গভাবে বিদেশের পথে পাড়ি দেওয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি রাত দেড়টায় সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ি ছেড়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। তাঁকে গাড়ি করে, সদাসতর্ক পুলিশ বাহিনী ও গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমে শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের আসানসোলের কাছে বারারির বাংলোতে ও কিছু পরে সস্ত্রীক অশোককে গাড়িতে তুলে নিয়ে গোমো রেল স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের আর এক পুত্র শিশিরকুমার বসু। গোমো থেকে তিনি পেশোয়ারের পথে যাত্রা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার ও পেশোয়ারের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী মিঞা আকবর শাহ সুভাষচন্দ্রের নিষ্ক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা অন্য যে দু'জন

জানতেন তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন বক্সী।

সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ ও তার রোমাঞ্চকর ইতিহাস সুপরিচিত। শিশিরকুমার বসু, অনেক সহযোগী, সহকর্মী ও আংশিক প্রত্যক্ষদর্শী এই কাহিনী লিখেছেন। কী রকম বাধা-বিপত্তি ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র পেশোয়ার, কাবুল হয়ে মস্কোতে পৌঁছন এবং তারপর বিমানে করে ৩ এপ্রিল বার্লিনে পৌঁছন তার কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হবে। পরে জার্মানী থেকে যেভাবে তিনি সাবমেরিনে করে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ পেরিয়ে জাপানে পৌঁছেছিলেন তা রূপকথার কাহিনীকেও হার মানায়। যাত্রাপথে সুভাষচন্দ্র প্রথমে 'মহম্মদ জিয়াউদ্দীন' ছদ্মনাম নেন। পেশোয়ার পৌঁছে এক "বোবা ও কালা পাঠান' সাজেন। কাবুলে ইতালীয় দূতাবাসের মন্ত্রী আলবের্তো কোয়ারোনির (Alberto Quaroni) সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় ইতালীয় দূতাবাসের এক কর্মচারীর বে-নামে ওরল্যান্ডো মাৎসোটা (Orlando Mazzotta) নামে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট পান। এই পাসপোর্ট নিয়েই তিনি ২৮ মার্চ মস্কো থেকে রওনা হয়ে বার্লিন পৌঁছন। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতে তাঁকে একমাস অপেক্ষা কতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত রুশ, ইতালীয় ও জার্মান— তিন সরকারই তাঁকে বার্লিনে পৌঁছতে সহায়তা করেছিল। এই সহায়তা পাওয়া খুব সহজ হয়নি।

জার্মানীতে পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও যুদ্ধের সময় ভারত-জার্মানীর মধ্যে সহযোগিতার এক পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি জার্মান সরকারকে দেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল : ইউরোপে এক স্বাধীন ভারত সরকার গঠন ; যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি সহ জার্মানী, ইতালী ও স্বাধীন ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি , বিদেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ে ভারত যুদ্ধের পর তা শোধ করবে এই মর্মে বোঝাপড়া। সুভাষচন্দ্র একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেন। এই বাহিনী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে বিদ্রোহ ও দেশের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানে সাহায্য করবে। দেশের মধ্যে বেতার-প্রচারের সুযোগ-সুবিধাও তিনি চেয়েছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে জার্মান সরকারের সুস্পষ্ট নীতি জানাবার জন্যে পুনরায় অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি জার্মান বিদেশ দপ্তরের কাছে কোনও সাড়া পাননি। সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী নির্বাসিত ভারতীয়দের এবং ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্স, ইতালী ও অস্ট্রিয়া সফর করেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪১ সালের শেষ দিকে (২ নভেম্বর) Free India Centre স্থাপিত হয়। এই উদ্যোগে তিনি সহযোগী রূপে যাঁদের পান তাঁদের মধ্যে ছিলেন এ. সি. এন নাম্বিয়ার, আবিদ হাসান, এন. জি. স্বামী, এম. আর. ব্যাস, গিরিজা মুখার্জী, এন. জি. গণপুলে প্রমুখ। গণপুলের Netaji in Germany (A Little-known Chapter) বইটি একটি তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থ।

'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টাব' কার্যত ছিল সুভাষচন্দ্রের মুখ্য প্রশাসনযন্ত্র। ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার স্বাধীন ভাবতেব পুনর্গঠনেব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করে। ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র যখন জাপানে যান তখন তিনি তাঁর সঙ্গে অস্থায়ী ভারত সরকারের একটি বিশদ খসড়া পবিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সেন্টারের অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভাবন ছিল স্বাধীন ভাবতেব প্রতীক ত্রিবর্ণ পতাকায় লম্ফোদ্যত ব্যাঘ্র-চিহ্ন (The Springing Tiger), জাতীয় সঙ্গীত রূপে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির ব্যবহার ; পরস্পরের সম্ভাষণ বাক্যরূপে 'জয় হিন্দ' ব্যবহাব এবং সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজি' রূপে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ। ভাবতে বেতাব-প্রচাব সেন্টারের আব এক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল। তিনটি গোপন প্রচাবেব স্টেশন ছিল—'আজাদ হিন্দ' বেডিও, 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' বেডিও এবং 'আজাদ মুসলিম' বেডিও। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিশীল কবা ও সংগ্রামীদের উৎসাহ দান ছিল ওই প্রচারের লক্ষ্য। আজাদ হিন্দ বেডিও থেকে নিযমিত ইংবাজি, হিন্দি, ফাবসি, পুস্তু, তেলুগু, গুজরাতি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হত।

অন্তর্ধানেব পব সুভাষচন্দ্র তাঁব স্বদেশবাসীর উদ্দেশে প্রথম বেতারভাষণ দেন ১৯৪২ সালেব ১৯ ফেব্রুযাবি (১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুবের পতনের পর)। ইতিপূর্বেই ৭ ৮ ডিসেম্বব মধ্যবাত্রে জাপান পার্ল হাবাবাব আক্রমণ করাব ফলে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১১ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র বসু ভারত বক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। কলকাতায় জাপানী কনসাল-জেনাবেলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে গোপন বার্তায় সুভাষচন্দ্রেব যোগাযোগ ছিল। জার্মানী থেকে তাঁর বেতারভাষণে নেতাজি ভাবতবাসীকে জানান যে তাঁর অন্তর্ধান কোনও হঠাৎ চমক নয়। ভারতের স্বাধীনতাই তাঁব ধ্যান-জ্ঞান। তিনি দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। প্রথমটি হল, বিশ্বে কী ঘটছে তা স্বচক্ষে দেখা। দ্বিতীয়টি হল, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কোনও মিত্র আছে কি না তা বিচার করে দেখা। তিনি নিজে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর আনুগত্য একমাত্র ভাবতবর্ষেব প্রতিই থাকবে। যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে ভারতেব আত্মহত্যাব সামিল হবে। স্বাধীনতার নাগপাশ মুক্ত আর হবে না। এই যুদ্ধে বৈদেশিক সাহায্য নিতেই হবে। তিনি একটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর নীতি ও সঙ্কল্প সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেটি হল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ও সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা। অক্ষশক্তির (জার্মানী, জাপান ও ইতালী) সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ কোনওমতেই এই নয় যে, ভারত তাদের প্রাধান্য মেনে নেবে বা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করবে।

জার্মানীতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন সুভাষচন্দ্র। ওই রকম একটি বাহিনী গঠনের চিন্তা তাঁর মনে প্রথম আসে কয়েকজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের কথা শুনে। এই বন্দীদের বার্লিনে প্রতিদিন নিয়ে আসা হত বি বি সি-র হিন্দুস্তানী অনুষ্ঠান শুনে অনুবাদ করার জন্যে। এদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয় যে, এদের মতো আরও অনেক ভারতীয় যুদ্ধবন্দী জার্মানীতে আছে যারা অসহায়, নিষ্ক্রিয়, হতাশাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এইসব

স্বাস্থ্যবান ভারতীয় যুবকদের নিয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে বিদেশের মাটিতে এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার উদ্যোগ নিতে তিনি মনস্থ করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে নাৎসী সরকারের অনুমোদন লাভ করা সহজ হয়নি। শেষপর্যন্ত অনুমোদন দিলেও জার্মান সরকার এই বাহিনীর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তথা জাতীয় সেনাবাহিনী নামকরণে আপত্তি করে। বাহিনীর নামকরণ হয় 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন' (Indian Legion)। শুধুমাত্র জার্মান সরকারের আপত্তিই নয়, ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের অনেকের এতে আপত্তি ছিল। ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভক্তি এবং সুভাষচন্দ্র ও তাঁর প্রস্তাবের প্রতি তাদের সন্দিগ্ধ মনোভাব দূর করা সহজ হয়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র শেষপর্যন্ত সফল হয়েছিলেন এই বাহিনী গডতে। যুদ্ধের পর আই. এন. এ. বন্দীদের বিচারের সময় এই বাহিনীকে হিটলার অনুপ্রাণিত পঞ্চম বাহিনী (Hitler inspired Fifth-Columnist) বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। লাডলি মোহন রায়চৌধুরী তাঁর 'আজাদহিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও গণ-বিক্ষোভ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে দিল্লির 'নেহরু লাইব্রেরি ও মিউজিয়ম'-এ রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যের উল্লেখ করেছেন। ইন্ডিয়ান লিজিয়নে সৈন্য সংগ্রহের সময় সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে এই বাহিনীকে কোনওমতেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। এই বিষয়ে প্যারিসবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রমোদ সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি কথা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ওই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে নিজে কমিউনিস্ট হয়েও প্রমোদ সেনগুপ্ত ওই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

গণপুলের গ্রন্থে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন (যা আজাদ হিন্দ ফৌজ নামেই পরিচিত পেয়েছিল) কীভাবে মাত্র পনেরোজনকে নিয়ে গঠিত হয়ে এক বছরের মধ্যে চার ব্যাটেলিয়নের এক সুশৃঙ্খল, শিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আছ। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের একজন বড় কংগ্রেসী নেতা থেকে তাঁর বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক, সহকর্মী এবং সহযোদ্ধার কাছে 'নেতাজি' রূপে স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করে কীভাবে তাদের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছিলেন তা পড়লে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। এই কাজটি সহজ ছিল না। যেসব ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ইন্ডিয়ান লিজিয়নে যোগ দিয়েছিল এবং যারা দূর প্রাচ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে (INA) যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই প্রথম থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাদের অনেকের মনেই সংশয় ও সন্দেহ ছিল। রাজভক্তি ও রাজভীতিও কম ছিল না। অনেকে বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছিল কারণ, যুদ্ধবন্দীর জীবন সুখকর ছিল না। অনেকে এমন আশাও করেছিল যে, এর ফলে তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের পক্ষে সুবিধা হতে পারে। সুভাষচন্দ্রের নাম ও জাতীয় কংগ্রেস তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা তাদের জানা থাকলেও খুব স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতির মানুষ ছিল ; শিক্ষা, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর পার্থক্য ছিল। এদের অনেকেই ছিল অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত। এই বিবিধ জাতি, ধর্ম ও চরিত্রের যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে নেতাজি সুভাষ যেভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে, প্রথমে জার্মানীতে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন ও পরে দূরপ্রাচ্যে INA গড়ে তুলেছিলেন তার তুলনা নেই। সুভাষচন্দ্রের জীবনের এটি ছিল এক অসাধারণ কৃতিত্ব।

সুভাষচন্দ্র তাঁর সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতেন সহজ হিন্দুস্তানি ভাষায়। তাঁর ভাষণে ফুটে উঠত পরাধীনতার দুঃখ-বেদনা, মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসা। তিনি আবেদন করতেন তাদের হৃদয়ের কাছে। সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবতেন যে, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা ও ভারতবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি। কোনও বকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তিনি দিতেন না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি এও জানতেন যে. যে সত্যের কথা তিনি বলছেন (ভাবতেব সুনিশ্চিত স্বাধীনতা অর্জন) সেখানে পৌঁছনর পথ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক। পদে পদে রয়েছে মৃত্যুর আশঙ্কা। তাই তিনি দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গের আবেদন করতেন তাদের হৃদয়, বিবেক ও শুভবুদ্ধির কাছে। সুভাষচন্দ্রকে তারা অবিশ্বাস করেনি। তবে প্রথমেই তাদের পূর্ণ আস্থা অর্জন করা সহজসাধ্য ছিল না। নেতাজি জানতেন যে, তিনি যাই বলুন না কেন, যুদ্ধবন্দী জওয়ানদের আস্থা অর্জন করা ও তাদের মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বাহিনীতে পরিণত করা খুবই দুরূহ। কিন্তু তিনি সফল হয়েছিলেন। মনে প্রাণে তাঁর বাহিনী তাদের নেতাকে সর্বাধিনায়ক 'নেতাজি' রূপে গ্রহণ করেছিল। গনপুলে লিখেছেন যে, যদি সুভাষচন্দ্র মিথ্যা আশ্বাস ও তাঁর বাহিনীতে যোগ দিলে এক রঙীন ভবিষ্যতের চিত্র দিতেন তাহলে আরও বহু জওয়ান তাঁর বাহিনীতে যোগ দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অক্ষশক্তির বিপর্যয়ের সময়ে নেতাজির বাহিনীর কিছু সৈনিক দুর্বলতা, স্বার্থপরতা ও বিশৃঙ্খলতার পরিচয় যে দেয়নি তা নয়। চরম সামরিক বিপর্যয়ের মধ্যে এবকম ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নেতাজির মুক্তিফৌজ সাহস ও আত্মোৎসর্গেব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তাদের প্রতি নেতাজির বিশ্বাস ও দেশের মুক্তির জন্যে চরম ত্যাগস্বীকারের আহ্বানের মর্যাদা তারা রক্ষা করেছিল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুব পরিকল্পনা ও তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভাবতীয যুদ্ধবন্দীরা মেজর ফুজিয়ারাকে যে চিঠি দিয়েছিল (১ জানুযারি, ১৯৪২) তা নেতাজি ও তাঁর মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত কী ছিল তা বুঝতে সহায়তা করে। ওই চিঠিতে যুদ্ধবন্দীরা জানান যে, তারা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব স্বীকার করা বিশেষ সম্মানজনক ও মূল্যবান বলে মনে করে। তিনি এমন একজন চরমপন্থী নেতা যিনি বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন। ভারতের জনগণ তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হওয়ার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সারা দেশব্যাপী। তিনি এমন একজন নেতা যাঁর নামেই ভারতের জনগণের মধ্যে এক আলোড়ন ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে এক প্রবল প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি করবে। "আমরা INA-র সদস্যরা তাঁর জন্য আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত আছি। তাঁর নাম আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করে।" স্বাক্ষরকারীরা জাপান সরকার যে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হয়েছে তার জন্যে তারা ধন্যবাদ জানায়। তারা ঘোষণা করে যে, সুভাষচন্দ্র যেদিন তাদের সামনে উপস্থিত হবেন সেইদিনই, যদি প্রয়োজন হয়, তারা প্রকাশ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিন্দা করবে। জাপান সরকার ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে কোনও বোঝাপড়া হোক না কেন তা মেনে নিতে তারা সম্মত আছে। ওই চিঠিতে তারা আরও জানায় যে, যুদ্ধে তারা সক্রিয় অংশ নিতে চায়। কিন্তু মালয়ে বহু ভারতীয়

সৈন্য আছে যারা তাদের নিকট সম্পর্কীয়। স্বভাবতই তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না। INA-র জওয়ানরা বর্মা বণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আরও ভাল হবে যদি ভারতীয় সীমান্তের যুদ্ধে তাদের নিয়োগ করা হয়। ভাবতের মাটিতে যুদ্ধ হলে আরও বহু সংখ্যক ভারতীয় INA-তে যোগ দেবে।

এই চিঠি থেকে বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র টোকিও পৌঁছবার (১৬ মে, ১৯৪৩) বহু পূর্বেই কীভাবে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে INA-র নেতৃত্বপদে বরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। জার্মানীতে ইন্ডিয়ান লিজিয়নের 'নেতাজি'কে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাকামী ভারতীয়রা ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীব যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকবা ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিনায়করূপে স্বাগত জানাতে কতখানি উদগ্রীব হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের পক্ষে জার্মানীতে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পিত কর্মসূচী কার্যকর কবা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। হিটলার নিজেই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আন্দোলন সম্বন্ধে সভানুভূতিশীল ছিলেন না, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জার্মান সবকার ও নাৎসী দলেও স্বভাবতই একই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে একটি বিশেষ ভারতীয় শাখা (Special India Division) ছিল। এই দপ্তরের ভাবত 'বিশেষজ্ঞ' বলে পরিচিত বেশির ভাগ অফিসাররা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন। এঁদের নীতি নির্ধারণেব কোনও ক্ষমতাও ছিল না। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ছিল জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের (Ribbentrop)। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছলে রিবেনট্রপ তাঁর উপস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। এর ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মান সহযোগিতার প্রস্তাব, ওই সহযোগিতা জার্মানীর পক্ষে কতকটা সহায়ক হতে পারে সেই সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য জার্মান পবরাষ্ট্র দপ্তরে ও নাৎসী দলের উচ্চ মহলে তেমন কোনও উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু প্রাথমিক ব্যর্থতায় সুভাষচন্দ্র হতাশ হননি। কিছুকালের মধ্যেই জার্মান সরকারেব মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্রের গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে থাকেন। এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী ছিলেন Special India Division-এব অ্যাডাম ফন ট্রট (Adam Von Trott) ও তাঁর সহকারী অ্যালেকজান্ডার ভের্থ (Alexander Werth)। ট্রট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ভারতেব সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ভের্থ ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলেন। তাঁরও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল। এঁদের দু'জনের চেষ্টায় নাৎসী দলের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল যে, জার্মান-রুশ অনাক্রমণ চুক্তির ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষের ওপর সশস্ত্র অভিযান করার সুযোগ-সুবিধা আছে। ওই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করতে পারলে জার্মানীর যেমন যুদ্ধে বিরাট সাফল্য হবে, তেমনি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এই মর্মে ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি তিনি নাৎসী সরকারের কাছে চেয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিটলার ওইরকম ঘোষণায় সম্মত

হননি। কিন্তু এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জার্মানীর মনোভাবেরও কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবগুলি জার্মানি সরকার অনুমোদন করে। এর ফলেই 'ফ্রি ইন্ডিয়ান সেন্টার' স্থাপন ও 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন' গড়া সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কর্মতৎপরতা ও নাৎসী সরকার এবং দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তথ্যবহুল বিবরণ ও বিশ্লেষণ রয়েছে নন্দ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে। জার্মান সরকারের কাছে যে স্মারকলিপি তিনি দিয়েছিলেন (৯ এপ্রিল, ১৯৪১) তা ব্যাখ্যা করার জন্যে সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়েছিলেন। এই অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হলেও ১৯৪১ সালের ২৯ এপ্রিল ভিয়েনার হোটেল ইম্পিরিয়ালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ সুভাষচন্দ্রকে প্রথম অভ্যর্থনা জানান। সুভাষচন্দ্র রিবেনট্রপকে স্পষ্টভাবেই জানান যে, ভারতীয়রা অন্যান্য জাতিসমূহের প্রতি জাতীয় সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্টদের মনোভাবের বিরোধী। ভারতীয় জনগণের আস্থা ও সমর্থন অর্জনের জন্যে জার্মানীর প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া উচিত যে, 'জার্মানীর বিজয় ভারতের মুক্তি আনবে।' বসুর সঙ্গে তাঁর সব কথাবার্তার বিবরণ রিবেনট্রপ হিটলারকে জানান। হিটলারের তা মোটেই পছন্দ হয়নি।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বার্থেই রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বোঝাপড়া চেয়েছিলেন। জার্মানীর নিজের স্বার্থেও যে রুশ জার্মান বোঝাপড়া অত্যন্ত প্রয়োজন তাও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন। তাঁর ওই বক্তব্য নাৎসী সরকারের কাছে কোনও গুরুত্ব পায়নি কেননা ইতিমধ্যেই হিটলারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছিল। তিনি রাশিয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ শুরু করলে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে জার্মানী এক বিরাট ভুল করেছে। এরপর আর জার্মানীতে থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে কোনও কার্যকরী পরিকল্পনা অসম্ভব। তিনি রোমে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের ডঃ ভোরম্যান-কে সোজাসুজি জানিয়ে দেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের মানুষের কাছে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের কাছে জনপ্রিয়। রুশ-জার্মান যুদ্ধে স্বভাবতই তাঁদের সহানুভূতি রাশিয়ার দিকে। তিনি পুনরায় ভোরম্যানের কাছ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জার্মানী যদি এখনও দ্রুত ঘোষণা করে যে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তার অন্যতম লক্ষ্য তাহলে ভারতীয়দের ওপর তার প্রভাব পড়বে।

তাঁর এই অভিমতে নাৎসী জার্মানী কোনও গুরুত্ব দেবে এ আশা ছিল অবাস্তব। যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয়দের মতামত জার্মানীর পক্ষে না বিপক্ষে এই নিয়ে জার্মান সরকারের আদৌ কোনও উদ্বেগ যুদ্ধের তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিটলারের ছিল না। সুভাষচন্দ্র নিজেরও তা অজানা ছিল না। কিন্তু যা তিনি ন্যায় বা সত্য বলে মনে করতেন, যা ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্যে তিনি বলা বা করা প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করতেন তা নির্ভীকভাবে করতে বা বলতে সুভাষচন্দ্রের এতটুকু ভয় ছিল না। রাশিয়া আক্রমণের পরেও ইতালীতে থেকে ও পরে জার্মানীতে অবস্থানকালে রাশিয়া আক্রমণের প্রকাশ্য নিন্দা করার সাহস (বা দুঃসাহস) একমাত্র সুভাষচন্দ্রের মতো মানুষেরই পক্ষে সম্ভব ছিল। মানুষটি যে সত্যিই অসাধারণ এবং তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না এটি কিন্তু নাৎসীরা বুঝতে পারে। তার প্রমাণ হল

রিবেনট্রপ পুনরায় বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সম্মত হয়েছিলেন (২৯ নভেম্বর, ১৯৪১)। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত 'ভারত ঘোষণা' সম্পর্কে রিবেনট্রপেব মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল।

১৯৪১ সালের শেষে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার ফলে পবিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বার্লিনে জাপানের রাষ্ট্রদূত ওসিমা-র (Oshima) সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁকেও যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণায ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতাব প্রশ্নটি যুক্ত কবাব কথা বলেছিলেন। ওসিমা সুভাষচন্দ্রেব ওই প্রস্তাবেব গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তিনি সে কথা হিটলারকেও বলেছিলেন। কিন্তু হিটলারেব মতের পবিবর্তন হয়নি। মুসোলিনী ভারত ও আরবের ব্যাপাবে অক্ষশক্তিব ঘোষণাব অনুকূলে ছিলেন। এর পিছনে ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা ও প্রভাব।

প্রধানত ইতালী ও জাপানের চাপে হিটলার শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকাবে সম্মত হন। দিনটি ছিল ২৭ মে, ১৯৪২ (আর একটি মতে ২৯ মে)। এই একবাবমাত্র উভযেব সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। দু'জনেব মধ্যে কী কথাবার্তা হযেছিল এই বিষযে বেশ কিছু পরস্পর-বিরোধী বিবরণ আছে। রিবেনট্রপ ও বৈদেশিক দপ্তরেব Special Bureau for India-র ভারপ্রাপ্ত কেপলার (Keppler) আলোচনাব সময উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিববণ পাওয়া যায না। হিটলারই বেশি কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্ব পবিস্থিতি সম্বন্ধে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা সুভাষচন্দ্রকে শুনিয়ে ছিলেন। জার্মানী থেকে ভারতের দূরত্ব, বাশিযাব মধ্যে দিয়ে ভারতে অভিযান করা কতটা কঠিন ও প্রায় অসম্ভব তা বোঝাতে চেষ্টা কবেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তখনি কোনও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা কবা অনুচিত ও অসম্ভব বলে তিনি জানান। যুদ্ধের পব ভাবতবর্ষকে জার্মান অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হতে পারে সাধারণভাবে এইটুকু তিনি বলেন। 'মাইন ক্যাম্ফ'-এ হিটলাব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেসব অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তা সংশোধন করার কথা সুভাষচন্দ্র তুললে হিটলার ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। সুভাষচন্দ্রকে তিনি বলেন যে, জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে দূব প্রাচ্যে যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক পবিস্থিতিব বিরাট পবিবর্তন ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে তাঁর কর্মক্ষেত্র করলে সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করতে অনেক বেশি সফল হবেন। সুভাষচন্দ্র যাতে জাপানে যেতে পারেন তার জন্যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ তিনি দেবেন বলে জানান।

হিটলারের সঙ্গে কথা বলে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছিলেন। তিনি তাঁব ভারতীয় সহকর্মীদের বলেছিলেন যে হিটলারের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্যেও যুক্তিগ্রাহ্য কোনও আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র পূর্বেই বুঝেছিলেন জার্মানীতে তাঁর পক্ষে আর তেমন কিছু করা সম্ভব হবে না। তাঁর পক্ষে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের পরিকল্পনা সফল করে লক্ষ্যে পৌঁছনোর সম্ভাবনা অনেক বেশি। ১৯৪২-এর ২২ মে তিনি জার্মান পবরাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছিলেন, "ভারতে বিপ্লব ঘটবার সময় এসে গেছে। ব্রিটিশ জোয়াল ছুড়ে ফেলে স্বাধীনতা অর্জনের সময় এসেছে এবং সেজন্য আমার পূর্বে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে।" হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তার পর ওই বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত হন। হিটলার তাঁর

জাপান যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে যে সম্মত হয়েছিলেন এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বড় লাভ। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে হিটলারের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলার সুযোগ পেলে তিনি হিটলারের ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে মনোভাব ও ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। তা হয়নি। হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। হিটলারকে তিনি চিনতে ও বুঝতে ভুল করেছিলেন। এই ভুল তিনি একলা করেননি। স্ট্যালিনও করেছিলেন। হিটলার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধী ছিলেন না, বরং গুণগ্রাহী ছিলেন। ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসান তিনি চাননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধেছিল। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির জন্যে হিটলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকখানি দায়ী ছিলেন।

বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচারিত নেতাজি সুভাষের ভাষণগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছিল ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তার দুটি দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়েব্‌লস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "বার্লিন থেকে পরিচালিত বসুর প্রচারকার্য ইংরেজদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর হচ্ছে।" সুভাষচন্দ্রের ভাষণ শোনার জন্যে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ অধীর আগ্রহ ও উত্তেজনা সহকারে অপেক্ষা করত। এই ব্যাকুলতা শুধুমাত্র যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার বাল্যস্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমরা সব ভায়েরা বাবা ও মা'র সঙ্গে বাড়ির একটি নির্দিষ্ট ঘরে বসে নেতাজির কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে রেডিও খুলে বসতাম। প্রচারে বিঘ্ন ঘটলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতাম, কেউ কোনও কথা বললে বাবা ধমক দিয়ে একেবারে চুপ করে শুনতে বলতেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। ভারতীয়দের মনে সুভাষচন্দ্রের জার্মানী থেকে প্রচারকার্য সম্বন্ধে ইংরাজরা এত বিচলিত হয়েছিল যে, ১৯৪২ সালের ২৫ মার্চ বি বি সি থেকে প্রচার করা হয় যে সুভাষচন্দ্র পূর্ব এশিয়ায় এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সুভাষচন্দ্র নিজে এই মিথ্যা প্রচারের কথা জেনে, তাঁর বৃদ্ধা মা ও পরিবারের অন্যান্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে খুবই বিচলিত হন। তিনি আরও উদ্বিগ্ন হন যখন তিনি শোনেন যে গান্ধীজি ওই "দুঃসংবাদ" শুনে তাঁর মা'কে একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। পরের দিনই অবশ্য জার্মান ও জাপানী সংবাদে এই মিথ্যা ফাঁস হয়ে যায়।

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর সুভাষচন্দ্র আর কোনও সময় নষ্ট না করে পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে পড়েন। কিন্তু হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেও সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ন' মাস লেগেছিল। সুভাষচন্দ্রের নিজের ইচ্ছা ছিল বিমানে যাত্রা করা। বিমানে ওই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে মনে হওয়ায় স্থির হয় যে, সাবমেরিনে দূর প্রাচ্যে জলযাত্রা করাই সমীচীন হবে। অবশ্য সাবমেরিনে দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করাও কম বিপদসঙ্কুল ছিল না। যথাসম্ভব এক নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা স্থির করা নিয়ে জার্মান ও জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে গোপনে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৯৪২-এর ৮ ফেব্রুয়ারি আবিদ হাসানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে জার্মানী ত্যাগ করে তাঁর ঐতিহাসিক জলযাত্রা শুরু করেন। কিয়েল বন্দরে কেপলার, নামবিয়ার ও ভের্থ তাঁকে

বিদায় জানান। তিনি যে জার্মানী ত্যাগ করে জাপানে পাড়ি দিয়েছেন তা গোপন রাখার জন্যে তাঁর যাত্রা শুরু হওয়ার পরও বেতারে তাঁর রেকর্ড করা বাণী প্রচার করা হতে থাকে। যাত্রাব দু' সপ্তাহ পূর্বে, ২৬ জানুয়ারি, বার্লিনে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালনের এক অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র ভাষণ দিয়েছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় ও গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে নতুন মোড় নিয়েছিল সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী বাহিনীর সাফল্য, বিশেষ করে রেঙ্গুনের পতনে (৮ মার্চ, ১৯৪২) উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রিটিশ সরকার আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সূত্র বার করার জন্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে একগুচ্ছ প্রস্তাব করে ক্রিপস এক বিবৃতি দেন (৩০ মার্চ, ১৯৪২)। কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই প্রত্যাখ্যান কবে। লীগ ঘোষণা করে যে, ভারত-বিভাগ করে দু'টি পৃথক স্বাধীন বাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোনও সমাধান নেই। ক্রিপসকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের পিছনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেব রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের কিছুটা হাত ছিল। তিনি ভাবতবর্ষের সমস্যার সমাধানে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাবে ভাবতবর্ষের স্বাধীনতার স্বীকৃতির উল্লেখ ছিল না। জওহরলাল রুজভেল্টকে জানান যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু অবিলম্বে ভারতে একটি জাতীয় সরকারের যুক্তিসঙ্গত দাবি ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ্য করায় কোনও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছন সম্ভব হয়নি। ক্রিপস-মিশনের ব্যর্থতাব পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৭ আগস্ট দেশব্যাপী অহিংস গণ-আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজি ঘোষণা করেন, "আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না। আমরা দেশকে স্বাধীন করব নয়তো ওই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।" ৯ আগস্ট গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেস বেআইনী সংগঠন রূপে ঘোষিত হয়। এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে 'ভারত ছাড়' বা '৪২-এর আন্দোলন' শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকেনি। কোনও কোনও অঞ্চলে তা গণ-অভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন দমন করার জন্যে ব্রিটিশ প্রশাসন সর্বপ্রকার নির্যাতন ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ না করলেও 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসন্ন। ভারতবর্ষের মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুই মেনে নেবে না।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ও দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভ প্রমাণ করেছিল যে, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও অবিলম্বে সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রামের দাবি অযৌক্তিক ছিল না। বার্লিনে তাঁর ২৬ জানুয়ারির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, "একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ টিকে থাকতে পারে না। একটিকে বাঁচতে হলে অন্যটিকে সরতে হবে এবং যেহেতু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বেঁচে থাকবে, সেইজন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সরতে হবে। বর্তমানে ভারতে যে সংগ্রাম চলছে তা

বস্তুত ১৮৫৭ সালের মহান বিপ্লবের সম্প্রসারণ মাত্র।" অহিংস সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, গান্ধীজি প্রমাণ করেছেন, "পরোক্ষ প্রতিরোধের অস্ত্র দ্বারা প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া সম্ভব। ভারতের তরুণতর প্রজন্ম অবশ্য গত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় শিখেছেন যে পরোক্ষ প্রতিরোধের দ্বারা বিদেশী প্রশাসন প্রতিহত কিংবা অচল করা সম্ভব হলেও দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া একে বিনষ্ট করা কিংবা বিতাড়িত করা সম্ভব নয়।"

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথমে জার্মানী ও পরে দূর প্রাচ্যে যাত্রা করেছিলেন নেতাজি সুভাষ।

৪৮

সাবমেরিনে এক বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার পর সুভাষচন্দ্র কীভাবে শেষপর্যন্ত টোকিওতে পৌঁছেছিলেন সে এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। সাবমেরিনটি ছিল ছোট মাপের। ভেতরে ডিজেল তেলের গন্ধ, এমনকি খাবারেও। চলা-ফেরার জায়গা প্রায় ছিল না। ওই দমবন্ধ করা পরিবেশে নেতাজিকে তিন মাস কাটাতে হয়েছিল। যে কোনও মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিমান বা যুদ্ধ জাহাজ থেকে আক্রমণের ভয় ছিল। যাত্রা শুরুর পূর্বেই তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল চরম বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোনও দিনই মৃত্যুভয় ছিল না। সাবমেরিনেও তিনি কোনও বিশ্রাম নেননি। সব সময়ই মগ্ন থাকতেন তাঁর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিচার করে যাতে তা কার্যকর হয় তা সুনিশ্চিত করতে। ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করার পর মাদাগাস্কারের কয়েক শো নৌ-মাইল দূরে উত্তাল মাঝ সমুদ্রে জার্মান সাবমেরিন থেকে নেতাজি ও তাঁর সঙ্গী হাসান রবারের ভেলায় চড়ে একটি জাপানী সাবমেরিনে ওঠেন (২৮ এপ্রিল, ১৯৪৩)। ওই রকমভাবে শত্রুপক্ষের বিমান ও নৌ-শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্রপথে একটি সাবমেরিন থেকে অন্য একটি সাবমেরিনে স্থানান্তরের মতো অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। ৬ এপ্রিল জাপানী সাবমেরিনটি সুমাত্রার উত্তরে সমুদ্রতীরে সাবাঙ নামে একটি ছোট দ্বীপে পৌঁছয়। এখানে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে ক'দিন তাঁদের আলাদা করে রাখার পর (Quarantine) ১৩ মে একটি বিমানে করে সুভাষচন্দ্র টোকিও পৌঁছন। তাঁকে বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেলে রাখা হয়।

টোকিও পৌঁছবার একমাস পরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় (১০ জুন, ১৯৪৩)। ওই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পূর্বে সুভাষচন্দ্র জাপানের রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। জাপানী সেনাধ্যক্ষ সুগিয়ামা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগোমিৎসু-র উদ্যোগেই প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ওই দু'জনেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তোজোরও একই অনুভূতি হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তোজোকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থনের কথা বললে তোজো তাঁর সম্মতি

জানান। ১৬ জুন জাপানী পার্লামেন্টের (Diet) এক অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে তোজো ঘোষণা করেন যে, জাপান সর্বতোভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কয়েকদিন পরে এক বড় সাংবাদিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, যুদ্ধে অক্ষশক্তির জয় হলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। অস্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অস্ত্রধারণ করতে হবে। একমাত্র রক্তের বিনিময়ে ভারতীয়রা তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। এরপর থেকে সুভাষচন্দ্র নিয়মিত টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে ভাষণ দিতে শুরু করেন। জার্মানী থেকে প্রচারিত ভাষণের মতো তাঁর জাপানী বেতারভাষণেরও মূল বক্তব্য ছিল যে, জাপানের সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবে। সুভাষচন্দ্রেব বেতারভাষণ ব্রিটিশ সবকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ও সামরিক উদ্যোগের কোনও সংবাদ যাতে না ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পারে তার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারই সঙ্গে মিথ্যা প্রচার শুরু হয় যে, প্রতিটি ভারতীয় হল শত্রুপক্ষের সহযোগী এক সম্ভাব্য (potential) স্বদেশদ্রোহী (fifth- columnist)।

সুভাষচন্দ্রের জাপানে আগমনের সংবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য ও সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলে সাগ্রহে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। ৩ জুলাই নেতাজি সুভাষ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর রাসবিহারী বসু জাপানে পলায়ন করেছিলেন ও সেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে টোকিওতে ও অল্পকাল পরে জুন মাসে ব্যাঙ্ককে বিপ্লবী ভারতীয়দের দু'টি সম্মেলন হয়। ওই দু'টি সম্মেলনের ফলশ্রুতিরূপে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন দলগুলিকে সুসংহত করে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ' (Indian Independence League) নামে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির জন্যে একটি বাহিনী গঠিত হবে। বাহিনীর নামকরণ হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং জাপানীদের হাতে বন্দী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। ওই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি হন রাসবিহারী বসু। সৈন্যদল গঠনের ভার পান ক্যাপ্টেন মোহন সিং। জাপান সরকার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, বিশেষ করে ব্যাঙ্ককের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ ও অন্যান্য ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন জাপানী সামরিক বাহিনীর মেজর ফুজিয়ারা (Major Fujiwara Iwaichi) এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের প্রীতম সিং ও অমর সিং। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের নেতৃত্বে ছিলেন রাসবিহারী বসু ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন মোহন সিং। মোহন সিং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা INA গঠনের ব্যাপারে পূর্বেই তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু রাসবিহারী বসু ও মোহন সিং-এর মধ্যে

মতবিরোধ, মোহন সিং-এর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, নেতাদের রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার অনভিজ্ঞতার ফলে সমগ্র আন্দোলনটি অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিছুকালের মধ্যেই রাসবিহারী বসু স্বয়ং সমগ্র আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এবং অন্য সকলেই উপলব্ধি কবছিলেন যে, জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফৌজের পূর্ণ নেতৃত্বভাব তুলে দিতে পারলেই তবে ওই আন্দোলন পুনর্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাসবিহারী-মোহন সিং-এর বিরোধের পবিণতিতে মোহন সিং গ্রেপ্তার হন (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪২)। এর ফলে কার্যত আই. এন এ-ব বিলোপ হয়।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনের জন্যে জার্মানী থেকে নেতাজি সুভাষ এক অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ওই বার্তায় তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন মূলত ভারতীযদেরই দাযিত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন একটি সময় আসবেই যখন অস্ত্রধারণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। ভাবতেব স্বাধীনতার অর্থই হল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তি। ওই সাম্রাজ্যবাদের পতনই হল জাপানী সেনাবাহিনীর লক্ষ্য। বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যখন পৃথিবীর সব জাতীয়তাবাদীদের একটি সুসংহত সংগঠনের মাধ্যমে সংযুক্ত কবা প্রয়োজন। বার্লিন থেকে টোকিওতে টেলিফোনে সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুকে জানান (৪ জুলাই, ১৯৪২) যে, গান্ধীজি ও জওহরলাল কখনই অক্ষশক্তিকে সমর্থন করবেন না। সুতরাং জাপানে যুদ্ধ-সম্পর্কিত নীতি নির্ধাণেব জন্যে কংগ্রেস নেতাদের মুখাপেক্ষী হলে চলবে না।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নাম তিনি জাপানে এসে পৌঁছবার বহু পূর্ব থেকেই জড়িত হয়ে পড়েছিল। ১৯৪১ সালে মোহন সিং ফুজিয়ারাব কাছে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে আহ্বান করার কথা বলেছিলেন। সিঙ্গাপুর ও টোকিও সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রয়োজনের প্রসঙ্গ উঠেছিল। জুন মাসে ব্যাঙ্কক সম্মেলনে তাঁর অভিনন্দন বার্তা প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল এবং সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ ও INA-র মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে INA-এর কার্যত বিলোপ ঘটলে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি ও সর্বাধিনায়কের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাঁর আসা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে সানন্দে ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র শীঘ্রই পূর্বাঞ্চলে আসছেন এবং তিনিই হবেন তাঁর (রাসবিহারীর) উত্তরাধিকারী।

১৯৪৩-এর ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরের জনাকীর্ণ ক্যাথে থিয়েটার হলে রাসবিহারী বসু তুমুল হর্ষধ্বনি ও উদ্দীপনার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে উপস্থাপিত করেন। ইতিপূর্বেই দু'দিন আগে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরেই উপস্থিত INA-এর সামরিক অফিসাররা সুভাষচন্দ্রকে বিমান থেকে অবতরণ করতে দেখা মাত্রই 'সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী মেজর পি. কে. সেগল (পরে নেতাজির সামরিক সচিব হয়েছিলেন) বলেছেন যে ওই মুহূর্তেই অনেকের মনে হয়েছিল যেন এক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে সেই মানুষটি এসেছেন যিনি সঠিক পথে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে পরিচালিত করবেন। ক্যাথে থিয়েটার হলে তাঁর

ভাষণে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয় যুবশক্তির সাহস, গতিশীলতা ও মহত্তম গুণের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে বর্ণনা করেন। রাসবিহারী বসু নিজে পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতিরূপে ঘোষণা করেন। রাসবিহারী বসু সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সর্বোচ্চ উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। রাসবিহারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁকে 'পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক' বলে অভিহিত করেন।

INA-এর দায়িত্বভার গ্রহণের পরেব ক'দিন সুভাষচন্দ্র তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে একাধিক উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। তাঁর উদাত্ত স্লোগান 'চলো দিল্লি' অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। আজাদ হিন্দ ফৌজেব আসন্ন সংগ্রামের জন্যে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব অসামরিক ভারতীয়দের সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও সহযোগিতার আহ্বান জানান। ৬ জুলাই সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসেব সামনে প্রধানমন্ত্রী তোজো ও নেতাজি সুভাষ একত্রে INA-এর কুচকাওয়াজ পবিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। কীভাবে নানান অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূল পরিবেশেব মধ্যে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে পুনর্গঠন ও পুনর্জীবিত কবেছিলেন, প্রায় অবলুপ্ত ও আশাভগ্ন একটি বাহিনীকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কব। এই কাহিনী গর্ডন তাঁর Brothers Against the Raj গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র নেতাজি রূপেই INA-এব সর্বাধিনায়কেব দাযিত্ব নিয়েছিলেন। কোনও সামরিক রীতিবদ্ধ পদ (rank) গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি সামরিক পোশাক ব্যবহার কবতেন। সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর বাহিনীকে আবও শক্তিশালী এবং সুসংহত করার জন্যে তিনি এবং তাঁর উচ্চপদস্থ সহকর্মীরা মালয়, শ্যামদেশ ও বর্মায যান। রেঙ্গুনে বর্মাব স্বাধীনতা ঘোষণাব দিনটিতে (১ আগস্ট, ১৯৪৩) নেতাজি উপস্থিত ছিলেন। বর্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বা ম'র (Ba Maw) সঙ্গে তাঁব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বা ম'ব সঙ্গে নেতাজিব প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সিঙ্গাপুর বিমানবন্দবে (৫ জুলাই)। উভয়েব লক্ষ্য ছিল একই—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের জন্যে জাপানের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু দু'জনেই চেয়েছিলেন তাঁদের স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। এক বিদেশী শাসনের পরিবর্তে অন্য এক বিদেশী শাসন নয়। সুভাষচন্দ্রের আর এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াব জন্যে বর্মা দেশ ও বর্মী সরকারের সাহায্য ব্যবহার করতে। বা ম ও আউঙ্গ সান (Aung San)-এর মতো বর্মাব স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা বর্মায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাপানের সাহায্য প্রত্যাশা কবেছিলেন। কিন্তু বা ম পরে জাপানীদের নীতি ও আচরণে হতাশ হয়েছিলেন। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, জাপানের সামরিক বাহিনী ও কর্তৃপক্ষ নিজেদের 'জাতি প্রাধান্য' সম্বন্ধে এতই গর্বিত যে তাদের পক্ষে অন্য দেশ ও জাতিকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। সুভাষচন্দ্রেরও তা অজানা ছিল না। তবু ব্রিটিশ শক্তি অপরাজেয় এই বিশ্বাস চূর্ণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। বা ম ও সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ও জীবনের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন—মাতৃভূমির স্বাধীনতা। বর্মার স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটিতে তাঁর সম্মানিত অতিথি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ করে বা ম লিখেছেন যে, সেদিন তিনি সুভাষচন্দ্রের চোখে সেই একই স্বপ্ন

দেখেছিলেন—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। শুধু ওই দিন মনে হয়েছিল তাঁর চোখের স্বপ্ন যেন একটু বিষণ্ণ, শোকার্ত, প্রত্যাশাপূর্ণ। তাঁর হাসিটিও যেন একইরকম। বা ম'র মনে হয়েছিল যে, বর্মাকে স্বাধীন হতে দেখে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় ভাবছিলেন তাঁর নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তাঁর বাহিনী ও তাঁর সামনে কত বক্তক্ষয় ও দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ বাকি রয়েছে।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় নারীর যে এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই কথা সুভাষচন্দ্র বহু পূর্বেই বলেছিনে। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনে তিনি নারীদেব যে মর্যাদা দিয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। INA-তেও নারীরা যেন এগিয়ে এসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বড় ভূমিকা নেয় তা নেতাজি চেয়েছিলেন। কঠিন হলেও তাঁর এই প্রত্যাশা সফল হয়েছিল। INA-তে লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে 'ঝান্সীর রানী' বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধে নারীদেব ভূমিকা দেখে পুরুষ সৈন্যরা আরও উৎসাহ বোধ করবে। সুভাষচন্দ্র যখন জাপানীদের বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্যে একটি পৃথক জাযগার প্রয়োজন তখন তারা প্রথমে মনে করেছিল তিনি পরিহাস করছেন। লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে সুভাষচন্দ্র প্রথম সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি একশো নারী মালয় থেকে ওই বাহিনীতে যোগদানের জন্যে পাবেন কি না। উত্তরে লক্ষ্মী স্বামীনাথন বলেছিলেন ঠিকমত চেষ্টা করলে আরও বহু সংখ্যক নারী ওই বাহিনীতে যোগ দেবে। তিনি ভুল বলেননি। ঝান্সীর বানী বাহিনীর প্রতিটি নারী সৈনিকের কাছে নেতাজি পিতৃতুল্য ছিলেন। তাদের তিনি বলেছিলেন, 'আমি একাধারে তোমাদের পিতা ও মাতা।' তারাও মনেপ্রাণে তা অনুভব করেছিল।

কোনও কোনও উচ্চপদস্থ জাপানী সামরিক অফিসারের ধারণা ছিল যে, নিছক প্রচারকার্যের জন্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী বাহিনীর সঙ্গে রণক্ষেত্রে যুক্ত থাকবে। এই মনোভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে নেতাজি তাদের সোজাসুজি জানিয়ে দেন যে, আজাদ হিন্দ বাহিনী সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একবার জাতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে পারলে সারা দেশে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেবে। আজাদ হিন্দ বাহিনী ও তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। সুভাষচন্দ্র জাপান সরকারর কাছে এর জন্যে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্বাধীন ভারত সরকার এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করে দেবে। জাপানের সহযোগিতা বাস্তব প্রয়োজনে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনবোধ ছিল প্রখর। স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও স্পর্শকাতর ছিলেন।

১৯৪৩ সালের শেষের দিক থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অক্ষশক্তির অপ্রতিহত জয়যাত্রা ব্যাহত হয়ে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু নেতাজির অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমে কোনও ভাটা পড়েনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যে আসন্ন তাঁর এই অটল বিশ্বাসে সামান্যতম চিড় ধরেনি। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে পূর্ব-এশিয়ার সকল স্থানের

প্রতিনিধিদের সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী সরকার (Provisional Government of Azad Hind/ Free India Provisional Government) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নারী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত হন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন এস. এ. আয়ার (প্রচার) ও লেঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী (অর্থ)। সর্বোচ্চ উপদেষ্টা হন রাসবিহারী বসু। উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েলাপ্পা, জন থিবি, সর্দার ঈশ্বর সিং ও এ. এন. সবকার (আইন বিষয়ক উপদেষ্টা)। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন লেঃ কর্নেল আজিজ আহমেদ, এন. এস. ভগৎ, জে. কে. ভোঁসলে, শাহ্ নওয়াজ, এ. এম. সহায় (সচিব) প্রমুখ। দু'দিন পব (২৩ অক্টোবর) জাপান এই 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার'কে স্বীকৃতি দেয। এরপর জার্মানী, ইতালী, ক্রোয়েশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, বর্মা, শ্যামদেশ, ফিলিপাইনস প্রমুখ দেশ একের পর এক স্বীকৃতি জানায়।

আজাদ হিন্দ সবকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে পঠিত শপথে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, "ঈশ্বরের নামে আমি আজ এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করি যে ভারতকে ও আমার আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে মুক্ত করার জন্যে আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। আমি সর্বদা ভাবতেব সেবক হইয়া থাকিব এবং আমার আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভ্রাতা-ভগ্নীর কল্যাণ বিধান হইবে আমার সর্বাধিক কর্তব্য। স্বাধীনতা অর্জনে উদ্‌গ্রীব হইয়া ভাবতেব স্বাধীনতা বক্ষাব জন্যে আমি আমার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত মোক্ষণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।" তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় জনগণের সদিচ্ছা সম্পূর্ণরূপে হারিযে ফেলে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে কোনও রকমে টিকে আছে মাত্র। "এই বেদনাদাযক শাসনের শেষ চিহ্ন ধ্বংস করতে মাত্র একটি অগ্নিশিখাব প্রয়োজন। সেই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনই হল ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর কাজ।" অস্থায়ী সবকারের উদ্দেশ্য হল ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের বিতাড়িত করাব জন্যে সংগ্রাম শুরু করা। তারপর ভারতীয় জনগণের ইচ্ছাক্রমে ও তাদেব আস্থাভাজন একটি স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার গঠন করা। ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের পবাজয়ের পর ভারতভূমিতে স্থায়ী স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার 'ভারতীয় জনগণের অছি স্বরূপ দেশের প্রশাসন কার্য চালাবে'।

আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রটি সুভাষচন্দ্র একদিন সারা রাত জেগে লিখেছিলেন। ওই শপথ ও ঘোষণার প্রতিটি অক্ষর ছিল সত্য। আনুষ্ঠানিক কোনও রীতিবদ্ধ রচনা ও ঘোষণা নয়। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবরের ঐতিহাসিক দিনটির বহু পূর্বেই সুভাষচন্দ্র ওই শপথ এবং সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। কখনও কোনও প্রলোভনে, কোনও পরিস্থিতিতে ও চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও মুহূর্তের জন্যে তার থেকে বিচ্যুত হননি।

সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধ্যান করতেন। বার্লিনেও বোমা-বর্ষণের মধ্যেও শেষ রাতে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে প্রথম জীবনে তাঁর যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল

জার্মানী ও পূর্ব রণাঙ্গনের ভয়াবহ যুদ্ধকালীন পরিবেশে সেই যোগসূত্র যেন আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। নেতাজি সুভাষ সম্পর্কে কিছুটা সমালোচনার সুরে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সৈন্যদের যতটা আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার থেকে যদি তাদের সামরিক শিক্ষণের ওপর আরও বেশি জোর দিতেন তাহলে ভাল হত।

টোকিওতে 'গ্রেটার ইস্ট এশিয়ান নেশনস'-এর (Greater East Asian Nations) সমাবেশে বিশিষ্ট দর্শকরূপে তিনি আমন্ত্রিত হন (৫-৬ নভেম্বর, ১৯৪৩)। ওই বৃহত্তর পূর্ব এশীয় সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে চাননি কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। দ্বিতীয়ত, জাপান এবং জাপানের বৃহত্তর পূর্ব-এশীয় সহ-উন্নয়ন মণ্ডলের (Co-prosperity Sphere) মিত্রদেশগুলির যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বা ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ব হতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু স্বীকৃত প্রতিনিধি না হয়েও তাঁর ভাষণ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক সমতা, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্রের ভাষণ দেওয়া পূর্ব-নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু ওই 'অপ্রত্যাশিত ভাষণে' (৬ নভেম্বর) তিনি বলেন, "বিজয়ীদের মধ্যে লুণ্ঠিত সম্পদ বণ্টনের জন্যে এই সম্মেলন হচ্ছে না।...এটি মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিগুলির একটি সমাবেশ, যে সমাবেশ ন্যায়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদানপ্রদান ও পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার পবিত্র নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর এই অঞ্চলে নতুন বিধান গড়ে তুলবে।" ভারতের জনগণ প্যান-এশিয়াটিক ফেডারেশনের চিন্তা করছে ও স্বপ্ন দেখেছে। সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমরা জানি যে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা তাই যা জাতীয়তাবাদ অবজ্ঞা করে না, বরং যা জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রোথিত।...বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া-সহ সমৃদ্ধ অঞ্চল গঠন শুধু পূর্ব এশিয়ার জনগণের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, সমগ্র এশিয়ার জনগণ ও সাধারণভাবে মানবসমাজের পক্ষে গভীর গুরুত্বপূর্ণ।" এই সম্মেলনে জাপানী প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন তোজো ও বর্মার প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন বা ম। এই সম্মেলনে বা ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের শেষে এক ঘোষণায় সবগুলি দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সঙ্কল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্মেলনের পর সুভাষচন্দ্র অল্প দিনের জন্যে জাপান-অধিকৃত চীনের অংশ, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। চীনে তিনি নানকিং-এর কাছে চীন-বিপ্লবের জনক সান-ইয়াৎ-সেনের সমাধি দর্শন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবীর মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্র বসু তখন কারাগারে। মৃত্যুপথযাত্রী মা'র সঙ্গে শেষ দেখার সুযোগ পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হয়নি। সুভাষচন্দ্র ঠিক কখন মা'র মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন জানা যায় না। জাপানী সামরিক অফিসার লেঃ জেনারেল ইসোদা এই সংবাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত। তিনি লিখেছেন যে, এই একবারই মাত্র তিনি সুভাষচন্দ্রকে শোকে অভিভূত হয়ে ভেঙ্গে পড়তে দেখেছিলেন।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতীয় ভূখণ্ডের কোনও একটি অংশে প্রতিষ্ঠিত হোক এটি নেতাজির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও শেষপর্যন্ত জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীন করতে সম্মত হয়। নেতাজি সুভাষ এই দ্বীপ দু'টির শাসনভার গ্রহণের জন্যে পোর্ট ব্লেয়ারে যান (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৩) ও এক বিরাট জনসমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ওই দ্বীপ দু'টির প্রশাসনের জন্যে তিনি একজন চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেন। আন্দামান-নিকোববের মুক্তিকে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় ব্যাস্টিল দুর্গের পতনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেন যে, আন্দামানের মুক্তির এক "প্রতীকী তাৎপর্য আছে, কারণ ব্রিটিশরা আন্দামানকে সর্বদা রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করেছে...ধীরে ধীরে আরো ভারতীয় ভূখণ্ড মুক্ত করা হবে, কিন্তু সর্বদাই প্রথম মুক্ত ভূখণ্ডের তাৎপর্য হয় সর্বাধিক।" শহীদদের স্মরণে তিনি আন্দামানের নতুন নামকরণ করেন 'শহীদ'। নিকোবরের নামকরণ হয় 'স্বরাজ'।

আন্দামান সফরেব পব নেতাজি বর্মায় পৌঁছন (৭ জানুয়ারি, ১৯৪৪)। কয়েকদিন পরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দপ্তর বর্মায় স্থানান্তরিত করা হয় (২১ জানুয়ারি)। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সীমান্তের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযানের প্রস্তুতি এবং পদক্ষেপ। নেতাজির 'চলো দিল্লী' বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপস্থিত হল। জাপানী সাদার্ন কম্যান্ডের 'ফিফটিনথ্ আর্মি'র অভিযানের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের ছক প্রস্তুত করা হয়। ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযান আরাকান ফ্রন্টে শুরু হল। আরাকান-ইম্ফল ফ্রন্টে INA-র তিনটি ডিভিশন অংশ নেয়। একটি ডিভিশন আরাকান ফ্রন্টে, একটি রেঙ্গুনে এবং আর একটি সিঙ্গাপুরে। আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারত-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে (১৮ মার্চ)। নেহরু রেজিমেন্ট ভারতের মাটিতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে। চার দিন পরে ওই বাহিনী মণিপুর ঘিরে ফেলতে অগ্রসর হয়। ইম্ফল-কোহিমা রোড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ৫ এপ্রিল কোহিমার পতন হয়ে ইম্ফলের চারিদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ইম্ফল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম ও চার মাস দীর্ঘ অবরোধের পর আজাদ হিন্দ ফৌজ অবরোধ তুলে নিয়ে (৫ জুলাই) পিছু হটতে বাধ্য হয়। আরাকানে চট্টগ্রাম অভিযানের পথে নেতাজির বাহিনী অপূর্ব সাহস ও শৌর্য দেখিয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্টেও তা স্বীকৃত হয়েছিল। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের INA-র সৈন্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়েছিল। বহু জাপানী সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তারা এতই মোহান্ধ ছিল যে, INA-র সৈন্যদের সঙ্গে সমান মর্যাদার কথা তারা চিন্তাও করতে পারত না। কিন্তু নেতাজি সুভাষ ও তাঁর বাহিনীর বীরত্ব ওই সঙ্কীর্ণমনা জাপানীদের বিস্মিত করে তাদের আস্থা অর্জন করেছিল।

আজাদ হিন্দ বাহিনী যে শেষপর্যন্ত সফল হতে পারেনি তার মুখ্য কারণগুলি ছিল জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ করার ব্যর্থতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং বর্ষার প্রকোপ। জাপানী বিমান বাহিনী আজাদ হিন্দ-এর স্থল বাহিনী ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যান্য রণক্ষেত্রেও জাপান এবং অক্ষশক্তির পশ্চাদপসরণ শুরু হয়েছিল। অন্য একটি কারণও ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অভিযান করার মতো পরিস্থিতি আর ছিল না। নেতাজির প্রত্যাশা ছিল যে, একবাব সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে পৌঁছতে পারলে সাবা দেশে এক গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের দুর্জয়শক্তি এক হলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনেব উচ্ছেদ সুনিশ্চিত হবে। আজাদ হিন্দ বাহিনী মায়ু নদী অতিক্রম কবে ইম্ফলেব বিষেণপুরে প্রবেশ করেছিল। নেতাজির আহ্বান 'চলো দিল্লী' তাঁর বাহিনীকে উদ্দীপ্ত করেছিল। কিন্তু তাঁর মূল প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। ১৯৪২-এব 'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রকৃষ্ট সময়ের পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়ে কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। আর একটি গণ-অভ্যুত্থান তখনি সম্ভব ছিল না। উত্তর-পূর্ব ভাবতের দূর প্রত্যন্ত সীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীব প্রবেশের সংবাদ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়নি।

ইম্ফল অভিযানের ব্যর্থতা আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তিকে দুর্বল ও চূড়ান্ত সাফল্যের সম্ভাবনাকে সুদূরপবাহত করেছিল। এই অভিযানের সামরিক যৌক্তিকতা ও পরিকল্পনা নিয়ে সমর-বিশারদরা অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁর মুক্তি বাহিনী যে স্বদেশপ্রেম, মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা অতুলনীয়। প্রত্যক্ষ ফলাফলের বিচারে ওই ঐতিহাসিক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু নেতাজির অবিস্মরণীয় সংগ্রামের আদর্শ ও আবেদনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল অপরিসীম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আসন্ন, কোনও শক্তিই যে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দুর্বার গতি রোধ করতে পারবে না, তা প্রমাণিত হয়েছিল অনতিকাল পরেই। সুভাষচন্দ্র নিজে যে এতটুকু মনোবল হারাননি, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি যে সুনিশ্চিত, তাঁর এই বিশ্বাস যে অবিচল ছিল তা তাঁর প্রতিটি ভাষণে ব্যক্ত হয়েছিল। একটি স্বরাজ যুব শিক্ষা-শিবিরে তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন (২৫ এপ্রিল, ১৯৪৪), "কীভাবে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এ কথা বুঝতে শিখলে পথের বাধা দেখে কোনোদিন হতাশ হয়ে পড়বে না। মানুষ তখনই হতাশ হয়ে পড়ে যখন সে এমন কিছুর সম্মুখীন হয় তা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। যদি বিপ্লব এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকা থাকে তবে বিপ্লবের পথে চলতে গিয়ে কোনো দিনও হতোদ্যম হয়ে পড়বে না।"

একটি প্রচলিত বিশ্বাস হল যে, ইম্ফল রণাঙ্গণে বিপর্যয়ের পর বর্মায় নিযুক্ত একজন জাপানী নৌ-অফিসার নেতাজিকে জাপানীদের বর্জন করে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে সোভিয়েতের সহযোগে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু টোকিওর সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা নাকচ করে দেয়। জাপান যদি সম্মত হত তাহলেও ওই প্রস্তাব অবাস্তব ছিল। বিশ্বযুদ্ধের

পরিস্থিতি যা ছিল এবং রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সম্পর্ক এবং বোঝাপড়া যে স্তরে পৌঁছেছিল সেই পটভূমিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে স্ট্যালিন ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কে সঙ্কটজনক করে তুলতেন এটা অচিন্তনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হল যে, নেতাজি টোকিওস্থ সোভিয়েত দূতকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ওই চিঠিটি না-খোলা অবস্থায় ফেরত এসেছিল।

আর্থিক ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্র জাপানীদের ওপর নির্ভরতা পছন্দ করতেন না। জাপান সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন (৫ এপ্রিল, ১৯৪৪)। জাপানের কাছ থেকে যে ঋণ তিনি নিয়েছিলেন তা পুরোপুরি শোধ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তাঁর পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে সুভাষচন্দ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে টাকাকড়ি, গহনা ইত্যাদি দান রূপে সংগ্রহ করেছিলেন। বার্লিনে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের জন্যে যে ঋণ তিনি নিয়েছিলেন তা ওই সংগ্রহ থেকে নেতাজি জার্মান সরকারকে শোধ দিয়েছিলেন। বৈদেশিক ঋণ ও অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এর থেকে ফুটে উঠেছিল।

পরবর্তী কয়েক মাসের দুঃখ-বেদনাদায়ক বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর অসীম সাহস, বীরত্ব, হিমালয়-সদৃশ দৃঢ়তা ও ব্রিটিশ-শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বিশ্বাস নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের এক মহানায়কের মর্যাদা দিয়েছে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে জাপানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর পরামর্শের জন্যে নেতাজি টোকিওতে আমন্ত্রিত হন। কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি, কর্নেল এম. কিয়ানী, লেঃ কর্নেল হবিবুর রহমান প্রমুখকে নিয়ে নেতাজি টোকিও যাত্রা করেন (১ নভেম্বর, ১৯৪৪)। বিদেশের এক অতি বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি রূপে জাপান সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদানের প্রস্তাব করলে নেতাজি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত কোনও সম্মান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা অনুচিত হবে। INA-র সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রসঙ্গে এক জাপানী রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ইম্ফল অভিযানে বসুর পরিচালনায় যেভাবে ওই বাহিনী চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও লড়াই করেছিল তারপরে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে হৃদয় থেকে না ভালবেসে পারা যায় না। সুভাষচন্দ্র তখনও নতুন জাপান সরকারের কাছে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য এবং সহযোগিতার অনুরোধ জানান। কিন্তু জাপানের পক্ষে তা আর সম্ভব ছিল না। জাপানের সামরিক ও মানসিক শক্তি উভয়েই তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

টোকিওতে সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ রাসবিহারী বসু, বরখাস্ত জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কৈজোর (General Koiso) সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৪৪ সালের শেষে তিনি রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি উত্তর মালয় পরিদর্শন করেন। কুয়ালালামপুরে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন (২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি রাসবিহারী বসুর মৃত্যু হয়। ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে রেঙ্গুনে বসবাসকারী ভারতীয়দের এক বিরাট সমাবেশ হয়। ওই সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের জন্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ, গয়না ও সোনাদানা সংগৃহীত হয়। তাঁর প্রতি উপস্থিত জনসাধারণের কত গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা

ছিল তা আর একবার প্রমাণিত হয়। অল্প ক'দিন পরেই নেতাজি ইরাবতীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিপন্ন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্কটকালে কিছু কিছু INA অফিসার ও সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যেতে থাকলে তিনি আদেশ জাবি করেন যে, ওই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করলে চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

জাপান ও অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছিল। রেঙ্গুনের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে শহর ছেড়ে চলে যাবাব অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি স্থির করেন, যতক্ষণ না ঝান্সীর রানী বাহিনীর সমস্ত নাবী সৈনিকদেব নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করবেন না। জাপানীরা তাঁর কথামত সব ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। বেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককের দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ ঝড় জল, বন্যা ও অন্যান্য নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিযে ঝান্সী বাহিনী অতিক্রম করে। দুর্গম পথে গাড়িগুলি প্রায়ই খারাপ হযে অচল হয়ে পডায় সকলকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছিল। নেতাজি তাঁব বাহিনীব বীরাঙ্গনা ও অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে সব সময় পাশে থেকে, সাহস ও অনুপ্রেবণা যুগিয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে পৌঁছতে এক মাস লেগেছিল।

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব অবসান আসন্ন এবং মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকাব ভারতের বাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে পৌঁছনোর জন্যে উদ্যোগ নিতে তৎপব হয়। লর্ড লিনলিথগোর পর লর্ড ওয়াভেল ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে অচলাবস্থার অবসান এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে উদ্‌গ্রীব। তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ (Central Executive Council) পুনর্গঠন করে বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণ এবং ভারতীয়দের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন (১৪ জুন, ১৯৪৫)। ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনার জন্যে সিমলাতে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হয় (২৫ জুন)। গান্ধীজি ওয়াভেল প্রস্তাবের বিরোধী হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিমলা বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হয়। কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হন মৌলানা আজাদ। বৈঠকে জিন্না দাবি করেন যে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সকল মুসলমান সদস্যকে অবশ্যই মুসলিম লীগের সভ্য হতে হবে। এই দাবি কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে। ফলে সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হয়।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নীতি ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিপর্যয় ও আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতার সুযোগ গ্রহণ করে যুদ্ধের অবসানের পরেও ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবে। অধিকতর ক্ষমতা দানের নামে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করবে। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে দেশের ভিতরে ও দেশের বাইরে

সংগ্রামের পর স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হবে। ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আশা, আকাঙ্ক্ষা, এত ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ বিফল হয়ে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হবে। সিঙ্গাপুর থেকে ভারত তথা বিশ্ব রাজনীতির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে কংগ্রেস নেতাদের তথা তাঁব দেশবাসীর উদ্দেশে নেতাজি যে বেতার ভাষণগুলি দিতেন তার গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

সুভাষচন্দ্রের গভীর আশঙ্কা ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপস করে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে। ব্রিটিশ কূটনীতি ও ভেদনীতিই জয়ী হয়ে দেশের মানুষের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ভঙ্গ করবে। এবই প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করার ফলে তিনি প্রথমে কংগ্রেস ত্যাগ এবং শেষপর্যন্ত দেশত্যাগ করে বিদেশে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারেব সংবাদে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে উভয় দলই ব্রিটেনের সঙ্গে আপ[illegible] করতে পারে। ভারত বিভাগের যে কোনও প্রচেষ্টাকে রোধ করার জন্যে বর্মাব রণাঙ্গন থেকে তিনি বেতার ভাষণে ভারতীয়দের প্রতি আবেদন কবেছিলেন (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিলেও সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। মুসলিম লীগ কখনও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না। লীগের একমাত্র কাজ হল ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রে ভাগ করা। আর, ব্রিটিশদেব লক্ষ্য হল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। প্রয়োজনে তারা কংগ্রেস-লীগ চুক্তিও অবজ্ঞা করবে।

ওয়াভেল প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে খুবই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, কংগ্রেস ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করতে পারে। ওয়াভেল প্রস্তাব সামান্য পরিবর্তিত আকারে ক্রিপস প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। ওয়াভেল প্রস্তাবে কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের বহু দলের মধ্যে একটি দলের স্বীকৃতি মাত্র দিয়েছে। এই অসম্মান ও উপেক্ষা কোনও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজি যে ওয়াভেলের প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা' শব্দটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই তা লক্ষ্য করেছেন। তার জন্যে তিনি গান্ধীজির প্রশংসা করেন। যে কংগ্রেস মাত্র তিন বছর পূর্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শপথ নিয়েছিল এবং যে নীতি এখনও কংগ্রেস ত্যাগ করেনি, সেই কংগ্রেস কী করে স্বাধীনতার বিকল্প কিছু গ্রহণ করতে পারে? ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহযোদ্ধারা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনও পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিপ্লবীদের তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, "বড়লাটরা আসতে পারেন ও বড়লাটরা যেতেও পারেন, কিন্তু ভারত বেঁচে থাকবে এবং স্বাধীনতার জন্যে ভারতের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত সফল হবে।" সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানাতে ৪ থেকে ১১ জুলাই 'নেতাজি সপ্তাহ' পালিত হয়েছিল।

ইউরোপে জার্মানীর পরাজয়ের পর পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের পরাজয় দ্রুত আসন্ন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তবুও হতোদ্যম না হয়ে নেতাজি সুভাষ সিঙ্গাপুরে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করেন। ২৭ জুন এক

বেতারভাষণে তিনি বলেন যে 'বিপ্লবী' হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজের দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে দাঁড়ান। যিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনও আপস মানেন না। "একজন বিপ্লবী বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করছেন তা ন্যায়সঙ্গত এবং সেই জন্যে সে আদর্শ শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হতে বাধ্য। বিপ্লবী কখনও কোনও ব্যর্থতা বা বিপর্যয়ে হতাশ বা বিষণ্ণ হতে পারেন না, কারণ তাঁর মন্ত্র হল 'সর্বোত্তমের জন্যে আশা করা কিন্তু সর্বনাশের জন্যে প্রস্তুত থাকা'।" নেতাজি যে আদর্শ বিপ্লবীর কথা বলেছিলেন সেই বিপ্লবীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি স্বয়ং।

নেতাজির অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও প্রচার সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজকে পুনর্গঠিত ও সুসংহত করে তুলে সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করা আর সম্ভব ছিল না। ৬ আগস্ট হিরোসিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পরমাণবিক বোমা বর্ষণের পর জাপান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। একমাত্র শর্ত ছিল জাপানের সম্রাটের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ১০ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তির পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে যোগ দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর জাপানের দ্বীপগুলি রাশিয়া আক্রমণ করে। এরপর আর কোনও পথ খোলা ছিল না। ১৪ আগস্ট জাপান মিত্রপক্ষের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

জাপান আত্মসমর্পণ করলেও নেতাজি সুভাষ তখনও পরাজয় মেনে না নিয়ে অন্য পথের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি এক স্বাধীন স্বতন্ত্র সরকারের প্রধান। জাপানের আত্মসমর্পণ তাঁর সরকারের আত্মসমর্পণের সমার্থ নয়। ১৬ আগস্ট তিনি জাপান সরকারকে একটি বার্তায় জানান যে, তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন বিশ্বস্ত সদস্য সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। প্রয়োজনে তিনি একাই রাশিয়ায় প্রবেশ করবেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর অনুরোধ তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য কোনও সদস্য যেন অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাপান সরকার সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাবে খুশি হয়নি কেননা সোভিয়েত রাশিয়া ইতিমধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। তবুও জাপানীরা সুভাষচন্দ্রকে মাঞ্চুরিয়াতে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে সম্মত হয়। সেখান থেকে তিনি ইচ্ছামত সোভিয়েত অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে পারেন। ওই যাত্রা শুরুর পূর্বে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাতে ঝান্সির রানী বাহিনীর প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। প্রায় এক মাস পূর্বে (৮ জুলাই) সিঙ্গাপুরে মুক্তিযুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শহীদদের স্মৃতিফলক স্থাপন করে নেতাজি পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে এক মহান জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ ছিল যে, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্ম গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে যে বর্মা আসাম ও মণিপুরের রণাঙ্গনে এই শহীদরা বীরের মতো যুদ্ধ করে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও, চূড়ান্ত সাফল্য ও গৌরব সুনিশ্চিত করে গেছেন।

১৬ আগস্ট নেতাজি বিমানে ব্যাঙ্কক যাত্রা করেন ও পরের দিন সাইগন পৌঁছন। এখানে হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস, এস. এ. আয়ার প্রমুখ তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। নেতাজির দীর্ঘ সময়ের জাপানী অনুবাদক নেগিশি-ও (Negishi) উপস্থিত ছিলেন। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি ও অন্য কয়েকজনেরও আসার কথা ছিল। কিন্তু

সায়গনে পৌঁছবার পর পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হয়। সুভাষচন্দ্র জানতে পারেন যে, তাঁর ও তাঁর সহযাত্রীদের জন্যে আলাদা বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। রুশ বিশেষজ্ঞ লেঃ জেনারেল সিদেই (Shidei) মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন-এ একটি বিমানে করে যাচ্ছেন। বিমানটি ওই দিনই (১৭ আগস্ট) তাইপে (Taipei) হয়ে দাইরেন যাবে। বিমানটিতে শেষপর্যন্ত নেতাজি ও তাঁর একজন সঙ্গীর আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। অগত্যা নেতাজি স্থির করেন যে সঙ্গী হিসেবে তিনি কর্নেল হবিবুর রহমানকে নেবেন। অন্যরা যত শীঘ্র সম্ভব পরে যাবেন। নেতাজি নেগিশিকে নাকি বলেছিলেন যে, তিনি রুশদের হাতে বন্দী হতে চান, কেননা রুশরাই একমাত্র ব্রিটিশদের বাধা দেবে। নেতাজির সহকর্মীরা সবাই এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হলেও তা মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না।

১৭ আগস্ট ভোরবেলা বিমানটি যাত্রা করে উত্তর ভিয়েতনামের টুরেন-এ অবতরণ করে। টুরেন-এ রাত কাটিয়ে ভোরবেলা বিমানটি আবার যাত্রা শুরু করে। এর পরের ঘটনা রহস্যাবৃত। ১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্ট টোকিও রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে ওঠবার সময় ওই বিমানটি ভেঙ্গে পড়েছিল। বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল সিদেই, বিমানের পাইলট ও আরও কয়েকজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। নেতাজির সঙ্গী হবিবুর রহমান সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ নেতাজিকে তাইহোকুর একটি সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ নাকি টোকিও বা সিঙ্গাপুরে নিযে যাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত তাঁর নশ্বর দেহ তাইহোকুতেই দাহ করা হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তাঁর ভস্মাবশেষ টোকিওর শহরতলির রেণকোজি মন্দিরে রাখা হয়।

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির এই মৃত্যুর কাহিনী বহু মানুষ বিশ্বাস করেননি। প্রচারিত কাহিনীর মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যকে ঘনীভূত করে। দু'টি তদন্ত কমিশন ভারত সরকার পরবর্তীকালে গঠন করলেও উভয় কমিশনের রিপোর্টই মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বহু লেখক ও গবেষক নেতাজির অন্তর্ধান সম্বন্ধে লিখেছেন, নানান প্রশ্ন তুলেছেন ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে কেন নেতাজির বিমানদুর্ঘটনায় মৃত্যুর কাহিনী গ্রহণযোগ্য নয় তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিতর্ক ও সন্দেহের আজও অবসান হয়নি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেহ অবিনশ্বর নয়, প্রাণী জগতে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু মানুষের কীর্তি তাকে অমর করে রাখে ইতিহাসের পাতায়, মানুষের মনে। প্রকৃত অর্থে সুভাষচন্দ্র বসু অমর ও মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর ক্ষেত্রে এটি এক বহুল ব্যবহৃত বিশেষণ মাত্র নয়, আক্ষরিক অর্থে সত্য।

১৭ আগস্ট নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশে দু'টি পৃথক বার্তা প্রচার করেন। সৈন্যবাহিনীর প্রতি তাঁর আবেদন ছিল, 'ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন'। তিনি বলেন যে, বর্তমান অভাবনীয় সঙ্কট সাময়িক। পরাজয়ের মুখে "অপরাজেয় আশাবাদ ও অনড় সঙ্কল্পের পরিচয় ও প্রয়োগ প্রয়োজন। আজাদ হিন্দের

অমর গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ কখনও বৃথা যেতে পারে না। দিল্লী যাওয়ার পথ অনেক এবং আমাদের গন্তব্য দিল্লীই রয়েছে...ভারত স্বাধীন হবেই এবং অনতিবিলম্বে।" পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অকাতরে লোকবল, অর্থ, রসদ ঢেলে দিয়ে আপনারা দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আমার 'সর্বাত্মক সমাবেশ'-এর আহ্বানে যেভাবে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সস্নেহে সাড়া দিয়েছেন তা আমি কখনও ভুলব না।" ভারতবর্ষের মুক্তি সুনিশ্চিত। সারা বিশ্বের ভারতীযদের মনে এই সংগ্রাম মৃত্যুহীন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। সাময়িক পরাজয়ের মধ্যে নৈরাশ্যের কারণ নেই। "চিত্ত প্রফুল্ল ও মন সজীব রাখবেন...বিশ্বে এমন কোনো শক্তি নেই যা ভারতকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারে।"

চরম বিপর্যয় ও অন্তহীন শূন্য গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়েও নেতাজির ওই মাভৈঃ বাণী এবং ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন-মুক্ত স্বাধীন ভারত বাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তার পিছনে ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনন্য অবদান।

৫০

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশী শক্তির সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। কংগ্রেসের একাধিক বিশিষ্ট নেতা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা শুধু তাঁর নীতি ও সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনাই নয়, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করতে দ্বিধা করেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। গান্ধীজি ও জওহরলাল দু'জনেই মিত্রশক্তির জয় কামনা করেছিলেন কেননা তাঁরা ফ্যাসিস্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানীর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের সহানুভূতি ছিল মিত্রশক্তির দিকে। তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে ব্রিটেনের ওই সঙ্কটকালে কোনও গণ-আন্দোলন করা সমীচীন হবে না। সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ও নীতি এর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে জার্মানী এবং পরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বেতার ভাষণে ও বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র নিরন্তর কংগ্রেসের আপস নীতি গ্রহণের আশঙ্কা ও তার ক্ষতিকর ফলাফলের কথা বলায় কংগ্রেস নেতারা আরও রুষ্ট হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কেন তিনি জার্মানী ও জাপানের সহযোগিতা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তা তিনি বহুবার ব্যাখ্যা করেছিলেন। নাৎসী জার্মানীর কঠোর সমালোচনা এবং চীন ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি জাপানের আগ্রাসী নীতির নিন্দা তিনি খোলাখুলিভাবে করেছিলেন।

যখন জাপানের পরাজয় সুনিশ্চিত এবং ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের পথ সম্পূর্ণ বর্জন করে ইংরাজদের সঙ্গে আপস-মীমাংসার পথ বেছে নিতে প্রায় মনস্থ করেছে তখন সিঙ্গাপুর থেকে প্রচারিত একটি ভাষণে (২৬ জুন, ১৯৪৫) তিনি

জাপানের সহযোগিতা কেন নিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ওই ভাষণে বলেন যে, জাপানের সহযোগিতা নেবার জন্যে তিনি লজ্জিত নন। জাপান ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নেবে এই শর্তেই জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর অস্থায়ী সরকারকে জাপান ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তবু কংগ্রেস নেতারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের সঙ্গে আপস করতে প্রস্তুত। তিনি সগর্বে বলেন, "আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে অভিহিত এই বাহিনী ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। এই বাহিনী ভারতীয় জাতীয় পতাকা বহন করে এবং এর ধ্বনিগুলিও ভারতের জাতীয় ধ্বনি। এই বাহিনীর নিজস্ব ভারতীয় সেনাধিনায়কগণ রয়েছেন এবং সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের পরিচালিত নিজস্ব অফিসার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও আছে।" যদি এই বাহিনীকে কেউ 'পুতুল বাহিনী' বলেন তাহলে তাঁর ওই আখ্যা ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীকেই দেওয়া উচিত। কেননা ওই বাহিনী ব্রিটিশ অফিসারদের অধীনে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করছে। তিনি বলেন যে, ভারতের স্বার্থে যদি বাঞ্ছনীয় হয় তাহলে অন্য যে কোনও শক্তির সাহায্য তিনি নিতে কুণ্ঠিত হবেন না। "আমরা যদি কোনওপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতাম তা হলে আমার অপেক্ষা অধিকতর সুখী কেউ হত না। কিন্তু আমার এখনো আধুনিক ইতিহাসে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া বাকি আছে যেখানে একটি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত জাতি কোনও প্রকার বৈদেশিক সাহায্য না নিয়ে মুক্তি অর্জন করেছে।"

সুভাষচন্দ্র গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে সংবাদ পাচ্ছিলেন ও লক্ষ্য করছিলেন কীভাবে শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা এবং অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক নেতারা তাঁর এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অপপ্রচার ও কুৎসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের নিন্দা করছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতার দাবির প্রশ্নে তাঁরা আপস করতে উদ্যোগী হচ্ছিলেন। তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ক্ষোভ ও তিক্ততার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমি যদি এখানে আরাম কেদারায় বসে রাজনীতি করতাম তাহলে আমি মুখ খুলতাম না এবং আপনাদের একটি কথাও বলতাম না। এখানে আমার কমরেডরা ও আমি কঠিন সংগ্রামে নিযুক্ত। রণাঙ্গনে আমাদের কমরেডদের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়...শত্রুর নিষ্ঠুর বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণের ফলে আমার বহু কমরেডকে আমি নিহত, বিকলাঙ্গ ও আহত হতে দেখেছি। রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ হাসপাতালকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতে দেখেছি...যেহেতু আমরা বেঁচে আছি, কাজ করছি ও মৃত্যুর মুখে সংগ্রাম করছি সেই হেতু আপনাদের কাছে কথা বলবার ও আপনাদের উপদেশ দেবার অধিকার আমার আছে। বোমাবর্ষণ কী বস্তু তা আপনাদের অধিকাংশই জানেন না। নীচে উড়ন্ত বোমারু বিমান ও ফাইটার থেকে মেশিনগানের গুলিবিদ্ধ হওয়া কী বস্তু তা আপনাদের অধিকাংশ জানেন না। আপনাদের দক্ষিণে ও বামে শিস দিয়ে বুলেট চলে যাওয়া কী বস্তু তার অভিজ্ঞতা আপনাদের অধিকাংশের নেই।" পরিশেষে তিনি তাঁর গভীর আশা ও বিশ্বাস পুনরায় ঘোষণা করে বলেন, "ব্যর্থতায় যিনি বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি বিপ্লবী নন। বিপ্লবীর মন্ত্র সর্বোত্তমের আশা করা কিন্তু চরম দুর্যোগের জন্যে প্রস্তুত থাকা...আমরা যদি যুদ্ধ করে চলি ও

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চাল ভাল করে প্রয়োগ করতে পারি, আমরা এই যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতা অর্জন করব।"

সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ও তিক্ততার সঙ্গে অভিমান মিশ্রিত ছিল। গান্ধীজি, জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বহিষ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মতবিরোধ তীব্রতর ও তিক্ত হলেও সুভাষচন্দ্র তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিরিশের দশকে এবং পরবর্তীকালে গান্ধীজি ও অন্য কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক কোনও মন্তব্য ইউরোপে শুনলে বা পড়লে তিনি তাঁর প্রতিবাদ করতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের চারটি ব্রিগেডের তিনটির তিনি নামকরণ করেছিলেন গান্ধী, নেহরু ও মৌলানা আজাদের নামে। নিজের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর ইচ্ছানুসারে অপরটির নামকরণ হয়েছিল সুভাষ ব্রিগেড। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ্যে করতে দ্বিধা করেননি। ব্রিটিশ অপপ্রচারে তাঁরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্টদের মতো অতটা কুৎসা না করলেও তাঁদের নেতাজি-বিরোধিতার তীব্রতা কম ছিল না। দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে (১২ এপ্রিল, ১৯৪২) জওহরলাল বলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র যদি কখনও তাঁর মুক্তি বাহিনী নিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হন তাহলে তিনি তাঁর বিরোধিতা করবেন। কেননা তাঁর মতে সুভাষচন্দ্রের বাহিনী বস্তুত জাপানের হাতের 'পুতুল' ছাড়া কিছু নয় ('a dummy force under Japanese control')। গান্ধীজিও বলেছিলেন, "ঘটনা হল,আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সুভাষ বসু'কে ঠেকাতেই হবে (In fact, I believe that Subhas Bose will have to be resisted by us)।"

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় ও তার অব্যবহিত পরে গান্ধীজি, জওহরলাল ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতিতে কোনও ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী আন্দোলন (অহিংস সত্যাগ্রহ পর্যন্ত) করতে অসম্মত হলেও সুভাষচন্দ্রের দেশ ছাড়ার (জানুয়ারি ১৯৪১) মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গান্ধীজিই বলেছিলেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে গেলেই জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে তা বলা যায় না। কেননা জাপানের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। উল্লেখ্য যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তৎকালীন বাংলার গভর্নর জন হার্বার্টকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন (১৬ নভেম্বর, ১৯৪২) যে, অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কেননা, "স্বাধীনতার জন্যে মানুষের মৃত্যু বরণের আগেই স্বাধীনতা পেয়ে যাওয়া উচিত মানুষের। স্বাধীনতাকামী এবং বিদেশী শাসনের অবসানকামী মানুষকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করাটাই অপরাধ।" এরপর শ্যামাপ্রসাদ যা বলেন তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ও দাবির খুব বেশি মৌলিক পার্থক্য ছিল না। "কেন ভারতবাসীরা জাপানকে নিজের দেশে আমন্ত্রণ জানাতে উদগ্রীব হবে? আমরা চাইছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে আপনারা দেশে ফিরে যান। সেক্ষেত্রে আবার নতুন একটা শক্তিকে স্বাগত জানাবার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমরা বিদেশী শাসন থেকে পুরোপুরি মুক্তি চাই। আমরা চাই এদেশ আমাদের হোক, এদেশ আমাদের দ্বারা শাসিত হোক।... যদি আপনারা

সত্যিই চান যে বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসুক, মানুষের স্বাধীনতা পদদলিত না হোক তাহলে আপনারা কেন ভারত পরিত্যাগে দ্বিধা বোধ করে শয়তান হিসাবে অভিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাচ্ছেন না নিজেদের ? যা উচিত এবং স্বাভাবিক তা না করে গত তিন মাস ধরে আপনারা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের এই অত্যাচাব স্বৈরাচারী শাসনের নিদর্শন...একটা ভয়ানক ইঙ্গিত হচ্ছে। আজ মানুষ এতটা হতাশ যে তাবা এই অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে যে কোনও রকম পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।"

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতারা যা বুঝেছিলেন ও দাবি করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু মহাসভা যা বুঝেছিলেন এবং চেয়েছিলেন তা সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি ও দাবি করেছিলেন তিন বছর পূর্বে। তিনি নাৎসীদের 'দানব' বলেছিলেন। জাপানের আগ্রাসী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বহু পূর্বেই। কিন্তু গান্ধীজি ও কংগ্রেস যখন কোনওমতেই দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন কবতেও অসম্মত হন তখন গত্যন্তর না দেখে তিনি দেশের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। জার্মানী ও জাপানেব "ক্রীড়নক" তিনি ছিলেন না। বার্লিন ও টোকিওতে বসে হিটলার ও তোজোকে তিনি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁদের সহযোগিতা এবং সাহায্য চান সম-মর্যাদার ভিত্তিতে। ব্রিটিশ শাসনেব পরিবর্তে অন্য কোনও বিদেশী শাসন বা নিয়ন্ত্রণ তিনি চান না। সে রকম কোনও পরোক্ষ প্রচেষ্টারও তিনি বিরোধিতা করবেন। আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয় হল যে, গান্ধীজি ও জওহরলাল, যাঁরা সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, ভারতের স্বাধীনতাব জন্যে তাঁর সর্বপ্রকার নিপীড়ন সহ্য কবা এবং আত্মত্যাগের কথা খুব ভালভাবে জেনেও তাঁরা ব্রিটিশ প্রচাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

গান্ধীজি, নেহরু ও অন্যান্য কংগ্রেসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁদের বিরাট ভুল উপলব্ধি করেছিলেন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিভিন্ন সূত্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রকৃত কার্যকলাপ, গৌরবোজ্জ্বল বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতবর্ষের মানুষ জানতে শুরু করে। কমিউনিস্টদের ভুল ভাঙতে ও তা স্বীকার করতে আরও দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নেতাজী ও INA-র কাহিনী সমগ্র দেশকে বিস্মিত, চমৎকৃত ও শ্রদ্ধায় এবং গর্বে অভিভূত করে। INA-র তিনজন অফিসার— শাহ নওয়াজ, প্রেম সেগল ও গুরুবক্স সিং ধীলন-এর দিল্লির লাল কেল্লায় রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার (Trial) বা কোর্ট মার্শাল (Court Martial) শুরু হওয়ার পর (নভেম্বর, ১৯৪৫)। এই তিন INA সেনাপ্রধানের প্রকাশ্য-বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এক বিরাট রাজনৈতিক ভুল করেছিল। বিদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকাহিনী এতদিন পর্যন্ত ক্ষীণ স্রোতের মতো মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। শাহ নওয়াজ, সেগল ও ধীলনের বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর এবং বিচার শুরু হলে তা প্লাবনের রূপ ধারণ করে, জনগণের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয় এক বিরাট বিস্ফোরণের মতো। ওই তিনজনের বিচারের এক অন্য দিক ছিল। ব্রিটিশ সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষ সেটা চিন্তা করেনি। এঁদের একজন ছিলেন মুসলমান, একজন হিন্দু ও অন্যজন শিখ। এর ফলে ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী মানুষই এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কিছুটা ধর্মীয় আবেগের দ্বারা

তাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই দেশব্যাপী যে ক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল তার চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে যে বীর সেনানীরা নিজেদের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছেন তাঁদের বিচার করছে বিদেশী ইংরেজ শাসকরা। এই চিন্তা ও দৃশ্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নেতাজি সুভাষের নাম আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দেশপ্রেম, শৌর্য ও আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ প্রতীকে পরিণত হয়। 'নেতাজি জিন্দাবাদ', 'চলো দিল্লী', 'জয় হিন্দ' প্রভৃতি ধ্বনিতে সারা দেশ মুখরিত হয়। তৎকালীন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সম্পর্কে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক আয়ান স্টিফেন্স (Ian Stephens) মন্তব্য করেছিলেন, "আজ যদি কলকাতার ময়দানে সুভাষ অবতরণ করেন তা হলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখনি ভেঙে পড়বে (If Subhas is dropped on the Calcutta Maidan today, whole British Empire will collapse immediately)।" অনুমানটি যে ভুল ছিল না তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারের ভারত-নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। ১৯৪৫-এর ব্রিটিশ সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের (Labour Party) জয় হয়। উইন্সটন চার্চিলের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার পরিবর্তে ক্লেমেন্ট এ্যাটলি-র (Clement Attlee) শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শ্রমিক দল সাধারণভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবির প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। এর পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল যা পরে আরও পরিস্ফুট হয়েছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শের পর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) যে শীঘ্রই কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি নতুন ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্যে ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্যে ওয়াভেল সব ভারতীয় রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য হল, যখন 'ওয়াভেল প্রস্তাব' প্রথম করা হয়েছিল (১৫ জুন, ১৯৪৫) সুভাষচন্দ্র তার তীব্র সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন কেন ওই প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ কতখানি সঠিক ছিল তার এক নিদর্শন হল তাঁর ১৯ জুনের সিঙ্গাপুর থেকে প্রচারিত ভাষণ। 'ওয়াভেল প্রস্তাব' বর্জন করার পক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে তিনি বলেছিলেন যে, জুলাই মাসের আসন্ন ব্রিটিশ নির্বাচনের পূর্বে কোনওমতেই রক্ষণশীল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আপস করা ঠিক হবে না। সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল যদি ক্ষমতায় নাও আসে, পার্লামেন্টে তাদের শক্তি বৃদ্ধি নিশ্চিত। যে নতুন মন্ত্রিসভা ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হবে তারা ভারতের সমস্যা সমাধানে অধিকতর উদ্যোগ নেবে। ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করা এক কর্তব্য ও প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হবে। তিনি কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "শ্রমিক মন্ত্রীসভার সঙ্গে আপনারা এমন আপস করতে পারবেন যা রক্ষণশীলদের দ্বারা নির্দেশিত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব অপেক্ষা ভারতের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে।" সুভাষচন্দ্রের ওই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল ছিল।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তি কাহিনী দেশজুড়ে যে আবেগ-উত্তেজনা

সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব কংগ্রেস সহ সব কটি রাজনৈতিক দলের ওপর পড়ে। কংগ্রেসের নেতাজী-INA বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন হয়। শাহ নওয়াজ-সেগল-ধীলনকে আদালতে সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেস একটি আইনজ্ঞেব বিশেষ দল গঠন করে। এঁদেব মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, তেজ বাহাদুব সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ। জওহরলালকে ব্যবহারজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করার চমকপ্রদ দৃশ্যের একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার (INA Trial)' নামে অভিহিত এই ঐতিহাসিক ঘটনাব প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসাবী। বিচারে তিন অভিযুক্তের শাস্তি হলেও প্রবল গণ-বিক্ষোভের ফলে প্রথমে তা মকুব কবতে ও অনতিকাল পরে তাঁদের মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হয়। অন্যান্য অভিযুক্ত আই. এন এ অফিসারদের যেন দেশদ্রোহের অভিযোগ আর বিচার না কবে মুক্তিদান কবতে সরকাব বাধ্য হয় তাব জন্যে তীব্রতর আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতা ও দেশের অন্যত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পুলিশেব গুলিচালনার ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। কলকাতাব রাজপথে তরুণ ছাত্র বামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ হন। জনবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলায় ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের এক বড় ভূমিকা ছিল। ট্রামওয়ে কর্মচারী ও শিল্প শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে। শরৎচন্দ্র বসুও উদ্যোগ নিয়েছিলেন জনমত সংগঠিত করতে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের দিনটি (২১ অক্টোবর) পালিত হয়।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুযাবি মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্দুল বশীদকে বিচারের নামে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর ফলে ১১-১৩ ফেব্রুয়াবি কলকাতায় আবার প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয। নভেম্বর মাসের মতো এবারও ছাত্র-মিছিলের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কর্মচারি এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে ওঠে। ১২ ফেব্রুয়ারি এক ধর্মঘটে কলকাতা মহানগরী অচল হয়ে যায়। বিকেলে এক বিরাট মিছিল বের হয় ও ওয়েলিংটনে স্কোয়ারে এক বিশাল জনসভা হয়। সমস্ত শহর ক্যাপ্টেন রশীদ তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীব বিচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ও ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই গণ-বিক্ষোভ দমন করতে সরকার পুলিশ ও সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে। বহু বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষ হতাহত হয়। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দু'দিন সময় লাগে।

গণ-বিক্ষোভ ক্রমেই বিভিন্নস্থানে নানান রূপ নিতে থাকে। শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত তীব্র ক্ষোভ ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে। সারা দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা এক নতুন মাত্রা পায়।

জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব ও নীতি পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও সংশয় রয়ে গেছে। লাডলি মোহন রায়চৌধুরী তাঁর 'আজাদহিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও গণ বিক্ষোভ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তার প্রস্তুতি হিসেবে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই ঘোষণার (২১ আগস্ট, ১৯৪৫) কথা মাথায় রেখেই কংগ্রেস INA-র প্রতি তাদের পূর্বনীতির পরিবর্তন করেছিল। নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তাকে তারা নির্বাচনে জয়ী হবার কাজে লাগাতে চেয়েছিল। নেহরু, প্যাটেল,

পন্থ প্রমুখ নেতারা INA-র পক্ষে ব্যাপক প্রচারে নেমেছিল। তৎকালীন ভারত-সচিব মন্তব্য করেছিলেন (১৪ নভেম্বর, ১৯৪৫) যে, ওইসব কংগ্রেস নেতারা যা কিছু বলেছেন তার বেশির ভাগই নির্বাচনী প্রচারের চমক বা উচ্ছ্বাস বলা যেতে পারে ('Much of what these leaders had said could be regarded as electioneernng exubercnce'.)। আর একটি গোপনীয় সূত্রে জানা যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের গোড়ার দিকে কোনও সহানুভূতিই ছিল না। INA বন্দীদের মুক্তি দাবি করলেও নেহরু তাঁদের সম্পর্কে বিপথচালিত মানুষ ('misguided men') বলে মন্তব্য করতেন। প্রায়ই তিনি INA-র সম্বন্ধে কিছু বলার সময় 'তাঁদের ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও (Whatever errors and mistakes they had committed) মন্তব্যটি জুড়ে দিতেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতেন যে, আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং ওই আন্দোলনে বহু ভুল-ভ্রান্তি ছিল যা তিনি সমর্থন করেন না'। কিন্তু কংগ্রেস আজাদ হিন্দ আন্দোলনের জনপ্রিয়তাকে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করছিল।

এই বিশ্লেষণের যুক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে ও রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেই কংগ্রেস আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করেছিল এটা মনে করা ঠিক হবে না। জওহরলাল যে, প্রথমে নেতাজি সুভাষের মত ও পথের বিরোধিতা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ্য জনসভায় স্বীকার করেছিলেন। নতুন তথ্য জানার পর তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম, বীরত্ব ও অসাধারণ আত্মত্যাগ সম্পর্কে জওহরলালের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তা সন্দেহ করা সমীচীন হবে না। তবে এও অনস্বীকার্য যে, জওহরলালের মনে সুভাষচন্দ্র ও INA আন্দোলন সম্বন্ধে এক ধরণের মানসিক বাধা (inhibition) ও দ্বৈতভাব (ambivalence) ছিল। জওহরলাল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন ভারতের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশদের গুণগ্রাহী ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মিত্রশক্তির (Allies) জয় ও অক্ষশক্তির (Axis) পরাজয় চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির লড়াই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়ন এবং স্বৈরাচার সম্বন্ধে সচেতন হলেও বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ওই প্রশ্নটিকে সাময়িকভাবে গৌণ করে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা, অন্তত ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রিত একটি অস্থায়ী সরকার-এর (Provisional Government) দাবির জন্যেও কোনও অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। এই বিষয়ে তিনি গান্ধীজির নীতি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্রের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন। ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে উচ্ছেদ ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ও লক্ষ্য। সুতরাং নেতাজি সুভাষ সম্পর্কে সর্বান্তকরণে উৎসাহিত বোধ করা নেহরুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অনিবার্য। শুধুমাত্র সময়ের প্রশ্ন।

জওহরলালই যে গান্ধীজির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ও তিনিই যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের (Interim Government) প্রধানমন্ত্রী হন (২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)। স্বাধীনতা সংগ্রামী জওহরলাল ইতিমধ্যেই 'প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল' রূপে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। আজাদ হিন্দ আন্দোলনকে তিনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ও সৈন্যদের সামরিক ছাউনি ত্যাগের (desertion) দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে এক ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত হতে পারে বলে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের এক গোপন আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং INA-র অফিসারদের বীরের সম্মানদান ও কোনও শাস্তি ছাড়া মুক্তিদানের পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের মানসিক দ্বন্দ্ব যে ছিল না তা নয়। জওহরলালের অবচেতন বা সচেতন মনে আর একটি অস্বস্তিবোধ থাকাও সম্ভব ছিল। তিনি ছিলেন (গান্ধীজি ছাড়া) ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা। তাঁর জনপ্রিয়তা, সাধারণ মানুষের কাছে এক সম্মোহনী আবেদন ও দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা ছিল তর্কাতীত। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ অপপ্রচার, সংবাদপ্রচার ও সংবাদ মাধ্যমের ওপর কঠোর নজর এবং নিষেধাজ্ঞার ফলে নেতাজি সুভাষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জনগণ কার্যত প্রায় কিছুই জানতে পারেনি। দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ ও জনমানস থেকে তিনি অনেকখানি সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে সশরীরে না হলেও সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল এক অপূর্ব গরিমা ও মহিমা নিয়ে। কংগ্রেস নেতাদের ওপর এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। স্বাধীনতা লাভের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র যে তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা সরকারি উচ্চমহলে পাননি তার উপরোক্ত ব্যাখ্যা অযৌক্তিক বলে উপেক্ষা করা যায় না।

ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কার্যত সুভাষচন্দ্রের প্রশস্তি এবং ভারতবর্ষের সামরিক শৌর্য-বীর্য, পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদাবোধও গর্বের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিল। আদালতে ন্যায় বিচারের বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়েছিল। ভারতীয় স্থল, বায়ু ও নৌ তিনটি অংশেরই সেনানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। তাদের স্বাধীনতার জন্যে দৃঢ় সঙ্কল্প ও মৃত্যুভয়হীন সংগ্রাম সকল সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতীয় বাহিনীর সকল শাখায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এই মনোভাবের প্রথম লক্ষণ দেখা যায় যখন কলকাতার দমদমের ভারতীয় ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর (Royal Indian Air-Force) কয়েকজন অফিসার তাঁদের উচ্চপদস্থ নেতাদের নির্দেশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এর পরেই দেখা দেয় প্রখ্যাত নৌ-বিদ্রোহ।

১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়। সেখানকার নৌ-সেনারা স্বল্প-বেতন, নিম্নমানের আহার্য ও নৌ-বাহিনীতে প্রকট বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশন শুরু করে। ওই বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জাহাজে জাহাজে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা

জাহাজ দখল করে। ব্রিটিশ পতাকা অপসারিত করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোম্বাই ও করাচি বন্দরে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী ভারতীয় নৌ-সেনাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়। নৌ-বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জনসাধারণের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। সারা দেশে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট শুরু হয়। সরকারি হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শনে কোনও ফল হয়নি। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হস্তক্ষেপ করেন। প্রধানত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। আত্মসমর্পণ করার পর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নৌ-বিদ্রোহ যে আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ওই রকম প্রকাশ্য বিদ্রোহ কখনও হয়নি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে এর পর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন টিকে থাকা আব সম্ভব হবে না। নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে লর্ড ওযাভেল ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে লেখেন (২২ মার্চ, ১৯৪৬) যে, আজাদ হিন্দ ফৌজেব নেতাদেব কোর্ট মার্শালকে উপলক্ষ করে যে সর্বনাশ শুরু হয়েছিল পরবর্তী কালে উদাব মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করেও তা নিবারণ করা আর সম্ভব হয়নি। নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ, রয়েল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের এবং ইন্ডিয়ান আর্মির ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ব্রিটিশ শাসকদের অস্থির করে তুলেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দিন যে শেষ হয়ে এসেছে তা বুঝতে অসুবিধে ছিল না।

মৌলানা আজাদ তৎকালীন ঘটনাবলী প্রসঙ্গে তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে লেখেন যে, INA আন্দোলন ও নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে অতঃপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ছাড়া কোনও উপায় নেই। সৈন্যবাহিনীর ওপর আর নির্ভর করা যাবে না। আজাদ যে সন্তোষজনক মীমাংসাব কথা লিখেছিলেন তা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই উপলব্ধিই ইংরাজদের ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ব্রিটিশ সামরিক শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেন দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল। রণক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ব্রিটেন নিজের পুনর্গঠন সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সুদূর ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যে মানসিক ও শারীরিক শক্তি থাকা প্রয়োজন ছিল তা আর তার অবশিষ্ট ছিল না। ওই পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার অগ্নিশিখাটি যিনি আরও প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোজন করেছিলেন তিনি হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই সত্যটি স্বীকার করেছিলেন এ্যাটলি স্বয়ং। এক একান্ত কথাবার্তায় তিনি বলেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পিছনে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবি, চাপ ও আন্দোলন এবং অন্য কোনও ঘটনা বা বিক্ষোভের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নেতাজি সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ আন্দোলন ও তার গভীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতির প্রধান ভরসাস্থল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্রের

INA-র কীর্তি কাহিনীর জনমানসে প্রতিক্রিয়া। এ্যাটলির এই একান্ত স্বীকারোক্তির যে ঘটনা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলার তৎকালীন এক উচ্চপদাভিষিক্ত প্রশাসকের কাছে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন তা যে কাল্পনিক নয় তা ওয়াভেলের পূর্ব-উল্লিখিত চিঠিটি প্রমাণ করে।

আজীবন অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র সর্বাত্মক সংগ্রামের মত এবং পথকে অনুমোদন করতে পারবেন না তা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের যতই সমালোচনা ও বিরোধিতা তিনি ১৯৪১ সালের পূর্বে এবং পরে করে থাকুন না কেন, সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও অসাধারণ দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। INA সম্পর্কে তাঁর অভিমত তিনি ভাইসরয়ের একান্ত সচিব স্যার ইভসন জেংকিন্সকে একটি চিঠিতে জানান (২৯ অক্টোবর, ১৯৪৫)। ওই চিঠিতে তিনি জনগণের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি জানাতে INA বন্দীদের মুক্তি দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি লেখেন যে, সশস্ত্র আন্দোলনের মতাদর্শে বিশ্বাসী না হলেও তিনি তাঁদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কথা কখনও ভুলতে পারেন না। সামরিক আদালতে যাঁদের বিচার হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভারতবর্ষের অটুট শ্রদ্ধা আছে ; সেই জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা কী অনুচিত হবে না ?

গান্ধীজির ওই চিঠিতে তাঁর যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা তার থেকে অনেক বেশি ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশত্যাগ করার পর গান্ধীজি তাঁর ভূমিকা ও আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শপথ গ্রহণে সুভাষচন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় তীব্র মতপার্থক্য ও তিক্ততার মধ্যেও তিনি সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "অসুস্থ থাকো আর সুস্থই থাকো তুমি অপ্রতিরোধ্য।" এটি তাঁর মামুলি সৌজন্য প্রকাশ ছিল না। মনের কথাই ছিল। সুভাষচন্দ্র যে সত্যই কতটা অপ্রতিরোধ্য তা গান্ধীজি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন তাঁর মহানিষ্ক্রমণের পর। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংগ্রামের চরম মুহূর্তে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন গান্ধীজির মহত্ত্ব ও তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতভেদ দূর হয়নি। তখনও তিনি গান্ধীজির মতাদর্শ ও রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের সমালোচনা করা বন্ধ করেননি। কিন্তু গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুসংবাদে গভীর দুঃখ পেয়ে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪) তাতে তিনি তাঁকে 'ভারতীয় জনগণের জননী' বলে অভিহিত করেছিলেন। 'মহান স্বামী'র সঙ্গে মহীয়সী স্ত্রী সব দুঃখ-লাঞ্ছনা ভাগ করে নিয়েছিলেন বলে প্রণাম জানিয়েছিলেন। কারারুদ্ধ গান্ধীজির এই নিদারুণ শোকের কথা চিন্তা করে তিনি বেদনা বোধ করেছিলেন।

রেঙ্গুন বেতার থেকে (৬ জুলাই, ১৯৪৪) নেতাজি গান্ধীজির কাছে আবেদন করেছিলেন, "আমি যা কিছু করেছি সবই আমার জাতির মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের কাছে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য

করেছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে... হে জাতির জনক! ভারতের মুক্তির এই ধর্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।" পরের দিন আর এক বার্তায় নেতাজি গান্ধীজিকে বলেন, "১৯৪১ সালে দেশ ছাড়বার পর আমি ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত যেসব দেশে ভ্রমণ করেছি, সেই সমস্ত দেশে আমি দেখেছি যে আপনাকে যেরূপ সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় সেরূপ মর্যাদা গত এক শতাব্দীতে অন্য কোনও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাকে দেওয়া হয়নি।" পরিশেষে তিনি জানান, "মহাত্মাজি, আমি আপনাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি যে এই বিপজ্জনক কাজে বার হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আমি সযত্নে এই প্রশ্নটির (বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নেওয়া) সকল দিক বিবেচনা করে দেখার কাজে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস ব্যয় করেছিলাম। এতদিন ধরে সর্বোত্তম সামর্থ্যে আমার দেশের জনগণের সেবা করে আমার বিশ্বাসঘাতক হবার কিংবা কেউ আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলুক তাকে এই সুযোগ দেবার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই। এই বিপজ্জনক সন্ধানে বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করে আমি শুধু আমার জীবন ও গোটা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের ঝুঁকি নিইনি। অধিকন্তু আমার দলের ভবিষ্যতেরও ঝুঁকি নিয়েছি। বিদেশ থেকে কর্মপরিচালনা ছাড়া আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব এরূপ সামান্যতম আশা থাকলেও আমি সঙ্কটকালে কখনও ভারত ত্যাগ করতাম না।"

গান্ধীজিকে এই আশ্বাস দেবার সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল না। গান্ধীজি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র কী ধাতুতে গড়া। তাঁর আদর্শ, স্বদেশপ্রেম ও জীবনব্যাপী স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ-যাতনা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মানুষরূপে কোন স্তরে উন্নত করেছিল। গান্ধীজির উপলব্ধি ও অনুভূতির গভীরতা, সুভাষচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা ক্রমেই গভীরতর হয়েছিল। নির্মল কুমার বসু গান্ধীজির একান্ত-সচিব রূপে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরের দিনগুলিতেও তিনি কলকাতায় মহাত্মার নিত্য সঙ্গী-সহচর ছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির দিনলিপি তিনি লিখেছিলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মহাফেজখানায় এই দিনলিপি সংরক্ষিত আছে।

১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বলেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে তিনি 'Indian First and Indian last' বলে বর্ণনা করে বলেন, যে সাহস ও সঙ্কল্প নিয়ে এবং যেরকম প্রতিকূল পরিবেশে ও সঙ্কটের মধ্যে সুভাষচন্দ্র মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব হত না। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সংগ্রাম তুলসীদাসের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে— 'বীরের পক্ষে সবই মানায়।' ১৯৪৭ সালের ২৫ আগস্ট কলকাতার বেলেঘাটা ও হাওড়ার ময়দানে গান্ধীজি ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি জানান যে আজাদহিন্দ ফৌজের কিছু অফিসার তাঁকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও হয়েছে। ওই অফিসাররা তাঁকে জানিয়েছেন যে, নেতাজি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন স্বদেশে ফিরে গান্ধীজির নির্দেশমত দেশের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করেন। দেশের বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা যেমন তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) তেমনি দেশের ভিতরে সংগ্রামের পরিকল্পনা গান্ধীজির। গান্ধীজির ওই

অফিসারদের পরামর্শ দেন, তাঁরা যেন তাঁদের তরবারিকে লাঙ্গলে রূপান্তরিত করেন। দেশের খাদ্য সমস্যা মেটাবার জন্যে তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষিকার্যে মন দিতে হবে। এই উপদেশ যদি তাঁদেব মনঃপূত না হয় তাহলে তাঁরা এক পৃথক গোষ্ঠীরূপে দেশসেবায় নিজেদের নিয়োগ করতে পারেন। সারা জীবনই সৈনিকের কাজ করতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভবও নয়। নেতাজির নিজের জীবনই তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি পেশাগত সৈনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি এক মহান বীর সৈনিক রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। সারা দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতায় জর্জরিত, ভ্রাতৃহত্যায় মত্ত তখন কীভাবে সবশ্রেণী ও ধর্মের মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গড়ে তোলা যায় তার এক মহান দৃষ্টান্ত নেতাজি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অফিসাবরা তাঁদের নেতাজিকে এত ভালবাসেন যে তাঁব নামেই তাঁদের চোখে জল আসে। সেই ভালবাসা এখন তাঁদের দেশের কাজে দেখাতে হবে। গান্ধীজি বলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু সেটা কথা নয়। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদেব মধ্যেও তা থাকতে পাবে। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল, নিরস্ত্র বা সশস্ত্র যে কোনও সংগ্রামের পথেই বিশ্বাসী হোক না কেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল কঠোর শৃঙ্খলা। আমরা দু'জনেই এই আদর্শে বিশ্বাস করতাম। গান্ধীজি অসীম স্নেহ ও গভীর শ্রদ্ধাব সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে বলেন যে, শারীরিকভাবে আজ অনুপস্থিত থাকলেও সুভাষচন্দ্রের নীতি ও আদর্শ সর্বত্র বিরাজমান।

গান্ধীজি যে কথা বলেছিলেন ওই একই কথার স্বীকৃতি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারেব এক গোপন রিপোর্টে। "সুভাষচন্দ্র বসু হয়তো মারা গেছেন কিন্তু তিনি যা কিছু কবেছিলেন, তার অধিকাংশই আজও বেঁচে আছে ('S.C Bose may be dead but much that he did still lives')।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনা, তাঁর কীর্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর সব পবাধীন দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকালীন হয়ে থাকবে। এই নিয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই।